আমাদের অনাড়ম্বর

প্রচেষ্টা

পঞ্চম সংখ্যা
জানুয়ারি ২০২৪

প্রচেষ্টা

পঞ্চম বর্ষ,
প্রকাশকাল : জানুয়ারী - ২০২৪

সম্পাদক

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

সহ সম্পাদক

শেখর মাহাত

যোগাযোগের ঠিকানা

প্রচেষ্টা গ্রুপ,
রাজপাড়া, এড়গোদা, ঝাড়গ্রাম- ৭২১৫০৫, পশ্চিমবঙ্গ

সামাজিক মাধ্যম

Facebook page : Prochesta Edu Tech
Youtube : Prochesta Group
Whatsapp : 9007422922
Website : www.prochestagroup.com

কথোপকথন

৯৯৩২৬২৯৯৮১, ৯০০৭৪২২৯২২

চিঠি পাঠাবেন

প্রচেষ্টা গ্রুপ
রাজপাড়া, এড়গোদা, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৫০৫

অক্ষরসজ্জা

বিশ্বজিৎ মেট্যা- ৯৪৩৪৬৮৪৩২২, ৮১১৬৭৬৮৩৮৮

ভ্রম সংশোধন

শুভঙ্কর মহাপাত্র

প্রচ্ছদ

চয়ন রায়, কলকাতা

অলংকরণ

সঞ্জয় মজুমদার, ঝাড়গ্রাম

বইটি পাবেন

নন্দন ডিজিট্যাল জোন, এড়গোদা, ৯৫৪৭০২২০৩৫
রয়্যাল কম্পিউটার, মেদিনীপুর, ৮১১৬৭৬৮৩৮৮
সৌমেন মণ্ডল, ঝাড়গ্রাম, ৮৯৭২৯০৫৮৫৫

বিনিময় - **১০০.০০** টাকা মাত্র

উৎসর্গ

যাঁদের ত্যাগ ও আদর্শ এই পত্রিকা প্রকাশের
একমাত্র ভিত্তি, যাঁদের দ্বারা আমরা
প্রতি মুহূর্তে প্রাণিত হই —
এই পত্রিকা তাঁদের —
উদ্দেশ্যে উৎসর্গ
করলাম।

সম্পাদকীয়

সমস্ত শুভানুধ্যায়ী, সদস্য-সদস্যা, পরামর্শদাতা, লেখক-লেখিকা, শিল্পী-সর্বোপরি যাঁদের সার্থক প্রচেষ্টায় এই পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করছে তাঁদের প্রত্যেককেই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমরা আন্তরিকভাবেই চেয়েছি পত্রিকাটি সার্বিকভাবে সুন্দর হয়ে উঠুক। তবু এ পত্রিকায় কোনোরকম অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি বা মুদ্রণপ্রমাদ থেকে থাকলে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

কথা প্রসঙ্গে

জানেন তো এখন আমার খুব করে মনে পড়ছে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সেই প্রতিজ্ঞাকে-

"এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি -
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"

সদ্য পার করলাম করোনা অতিমারী। দেখা গেল প্রকৃতির অসীম ক্ষমতা। সমাজকর্মী থেকে ডাক্তার, দিনমজুর থেকে কোটিপতি কেউই এর থেকে নিস্তার পায়নি। ক্ষমতাহীন রাজা সেজে গৃহবন্দী হয়ে পড়ে থাকার পরেও আমাদের চৈতন্যোদয় হয়নি। তাই ভয় হয়। আর এই ভয়ের কারণেই অস্ফুট স্বরে বলতে বাধ্য হচ্ছি যেভাবে প্রকৃতিকে আমরা বার বার বিভিন্ন দিকে আঘাত করছি সেভাবে প্রকৃতিও হয়তো রণসাজে নিজেকে প্রস্তুত করার সময় নিচ্ছে। ঝাড়গ্রাম তথা জঙ্গলমহলকে সবুজ শাড়ি পরা ছায়া শীতল শান্তির নীড় হিসেবেই গণ্য করা হতো। বিশেষত ঝাড়গ্রামকে বলা হয় "অরণ্যসুন্দরী"। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর অরণ্যসুন্দরীর কাঁসাই, ডুলুং, সুবর্ণরেখাতে চোখের জলের স্পষ্ট ছাপ। এখানেই তৈরি করে চলেছি প্লাস্টিকের পাহাড়, জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে তৈরি করছি রাস্তা, আবাসন, হোটেল, রেস্তোরাঁ আরও কত কী! মাইকের আওয়াজের প্রতিযোগিতায় শুধু পশু-পাখি বিপর্যস্ত নয়, কিছুদিন আগে মানুষেরও প্রাণহানি হয়েছে। একান্ত বাধ্য হয়েই বন্যপ্রাণী জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে প্রবেশ করছে। নির্বিকার প্রশাসন। ভয়, ডর, ভ্রূক্ষেপহীন জনগণ। তাই তো ভয় হয় আর কতদিন থাকবে এই "অরণ্যসুন্দরী" তক্‌মা! পর্যটকের আগমন একদিকে যেমন আনন্দের, অন্যদিকে উদ্বেগেরও বটে। যে কারণে পর্যটকদের আনাগোনা সেগুলোকেই নষ্ট করতে উদ্যত কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ। সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত ব্যবস্থা না থাকায় পর্যটকেরাও প্লাস্টিক, পলিথিন আরও অনেক বর্জ্য অবলীলায় ও বিনাবাধায় যেখানে সেখানে ফেলে যান। এর ফলে পর্যটন স্থল চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্যও নষ্ট হচ্ছে। তাই এক্ষেত্রে পর্যটকদের যাত্রাপথ নির্দিষ্ট করে সর্বক্ষণ নজরদারি চালানো এবং নিয়ম না মানাদের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। গ্রামবাসী-শহরবাসী, ধনী-দরিদ্র, জাতি-ধর্ম-বর্ণ, সরকারী-বেসরকারী কর্মী সকলকে এগিয়ে এসে আমাদের প্রকৃতিকে, আমাদের পরিবেশকে রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। আর ২০১৬ সাল থেকে আজও নিরবচ্ছিন্নভাবে এই কাজও করে চলেছে "প্রচেষ্টা"। স্থির লক্ষ্য নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলা থেকে শুরু করে বৃক্ষরোপণ নিরলস ভাবে করে চলেছে "প্রচেষ্টা"। এবছরও ২৫০টি চারাগাছ লাগিয়ে সন্তান সম স্নেহে ও যত্নে লালন পালন করছে। "প্রচেষ্টা" শুধু এটুকুতেই ক্ষান্ত থাকেনি। "শিক্ষা আমাদের উদ্দেশ্য, সাফল্য আমাদের লক্ষ্য"— এই পথ ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ - "গ্রন্থযাত্রা" এর ব্যবস্থাও করেছে। গরীব-দুঃখীদের জন্য "বস্ত্রদান" একটি বিশেষ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন হয়েছে "প্রচেষ্টা" থেকে। জঙ্গলমহল তথা ঝাড়গ্রামের কথা অর্থাৎ এই বিস্তীর্ন এলাকার ভালো-মন্দ সব তুলে ধরার ইচ্ছের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে "প্রচেষ্টা" পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে।

তাইতো প্রচেষ্টা বলে-

"যদিও জানি -
আমি একটা ছোট্ট দেশলাইয়ের কাঠি
এত নগন্য হয়তো চোখেও পড়িনা;
তবু জেনো
মুখে আমার উসখুস করছে বারুদ-
বুকে আমার জ্বলে উঠবার দুরন্ত উচ্ছ্বাস;"

দেখতে দেখতে আজকে প্রচেষ্টা পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করল। এই পঞ্চম সংখ্যার অভিভাবক আপনারাই। আমরা আমাদের লক্ষ্যে অবিচল, স্থির থেকে ধীরে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলার চেষ্টা করছি মাত্র। কন্টকাকীর্ণ রাস্তায় চলতে গিয়ে বাধা পাই, পথ ভুল করি তার পরেও একইভাবে পেয়ে চলেছি আপনাদের সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা। পেয়েছি আমরা আপনাদের মতো অভিভাবকদের।

"কথা ছিল
সব ভুলে সবটাই মনে রাখা
কাছাকাছি নয় খুব কাছে থাকার"

তার পরেও কি এমন হল - কিসের এমন অভিমান বুঝতে পারিনি, যার জন্য সমরেশ মজুমদার, দিলীপ দাস, উপেন পাত্র- ইনারা আমাদের ছেড়ে দূরে বহুদূরে চলে গেলেন। আমরা ভীষণ অনুতপ্ত। অভিভাবকহীনতা প্রতিমুহূর্তে উপলব্ধি করছি। উনারা বাংলা ও বাঙালির স্মরণের মণিকোঠায় চির ভাস্বর হয়ে আছেন ও থাকবেন।

আমরা নিশ্চিৎ যে অন্ধকার কেটে পূব আকাশে লাল হয়ে উদিত হবে সূর্য। সেই সূর্যের কিরণছটায় সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর হতে বাধ্য। তারপরেও, এর মাঝে আমাদের যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে তার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

আর কথা না বাড়িয়ে আমার প্রাণপ্রিয় লেখককুলের শ্রদ্ধেয় কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, মুদ্রন সংস্থার সকলকে ও পাঠকগণকে যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা জানালাম। সকলে ভালো থাকবেন। নিশ্চয়ই আবার কথা হবে।

ধন্যবাদ।

নমস্কারান্তে—
প্রচেষ্টার পক্ষে
মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাড়গ্রাম	ড. মধুপ দে	১১
বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী	ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে	১৮
স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর জেলা	সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়	২২
ইতিহাস যাকে মনে রাখেনি	অমল নাহারায়	৩০
জঙ্গলমহলের এক বিপ্লবী ডাক্তার	তমাল চক্রবর্ত্তী	৩২
জঙ্গলমহল ও গণবিক্ষোভ : সার্ধশত বর্ষের ইতিহাস	অমর সাহা	৩৩
স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাড়গ্রামের আদিবাসীদের ভূমিকা	নির্জন পল	৩৭

নতুন মুখ

ঝাড়গ্রাম স্থাপনা	অমৃত ঘোষ	৪৫
তুমি আলো নিয়ে এসো	মুকুন্দ কর	৪৫
বিজ্ঞাপন	সমীর শীট	৪৬
কেন	বিশ্বজিৎ দাস	৪৬
এই বর্ষায়	অর্পিতা দাস	৪৭
আত্ম প্রেম	হিমাংশু শেখর মাহাত	৪৭
এর চেয়ে বড় লক্ষ্মী কে আছে ?	নিসর্গ নির্যাস মাহাত	৪৮
প্রাক্তন	অভিজিৎ দত্ত	৪৮
পিঁড়ি এনে বসেনি আগুন নচিকেতা	মঙ্গল হাজরা	৪৯
দিবা রাত্রি নাচে মুক্তি	দেবব্রত দত্ত	৪৯
ক্যানভাস	প্রিয়াঙ্কা দত্ত বনিক	৪৯
শহীদ প্রণাম	সাগর মাহাত	৫০
ক্লান্ত পৃথিবী	অনুরাধা কর্মকার (রানা)	৫০
নাগরিক	প্রসাদ সিং	৫১
কাকতাড়ুয়ার দল	নীলাঞ্জন চক্রবর্তী	৫১
ঈশ্বর রাষ্ট্র	প্রসাদ মল্লিক	৫১
প্রেম তখন	অন্তরা দাঁ	৫২
সকইল ভালবাসাই বাঁচ	অসীম মাহাত	৫২
ধ্বংসের উৎস মুখ	হরি শংকর দে	৫৩
সাঁতার	রাজু রানা দাস	৫৩
প্রাণ	মনতোষ মন্ডল	৫৩
দিন বদলের ডাক	চিত্ত মাহাতো	৫৪
ছাই-ভস্ম-উত্থান	সজল মহাপাত্র	৫৪
নেতৃত্ব	চিন্ময়ী মারাণ্ডী	৫৪
আলোর খোঁজে	সুদীপ্তা মাহাত	৫৫

হয়	তপন চক্রবর্তী	৫৬
মায়ার বাঁধনে	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য	৫৬
অপেক্ষা	উদয় শঙ্কর রক্ষিত	৫৭
স্বপ্ন	মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী	৫৭
নীড়-হারা পাখী	সৌমেন মণ্ডল	৫৭

অরণ্যসুন্দরী

একটি ভয়াবহ সমস্যা ও তার সমাধান	আনন্দ রঞ্জন দাশগুপ্ত	৫৯
পাহাড় পুজো কানাইসর	বিচিত্র গুপ্ত	৬৩
সাইবানি: ঝাড়গ্রামের একটি বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ	রাজেন্দ্র প্রসাদ দে	৭৩
কুড়মালি টোটেমবাদের আলোকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	রাকেশ সিংহ দেব	৭৬
আমাদের বেলপাহাড়ি	তাপস কুমার পাল	৮৪
রাঢ়বঙ্গের লোক উৎসব	মনীষা পলমল	৮৬
'বাবরশা'একটি ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি	ডঃ শান্তনু পান্ডা	৮৯
পুরাভূমি ঝাড়গ্রামের লোক উৎসব : "টুসু উৎসব"	হরিপদ ঘোষ	৯৬

কবিতার দেশে

লজ্জা	মেঘদূত অঙ্কন	১০২
দিনান্তের প্রার্থনা	ছন্দা ঘোষাল	১০২
মুক্তির জন্য	অনিমেষ সিংহ	১০৩
গোধূলি	শোভা চন্দ	১০৩
অন্যকথা	চয়ন রায়	১০৪
দাগ ১০০	দুঃখানন্দ মণ্ডল	১০৪
উপল আশা	জয়দেব সিংহ রায়	১০৫
পালক	খুকু ভূঞ্যা	১০৬
বোবা দেওয়াল	বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়	১০৬
সময়ের মগ্নতা	কৌশিক বর্মন	১০৭
ভালবাসা	মানসরঞ্জন বিশ্বাস	১০৭
জলোচ্ছ্বাস	স্বপন কুমার দে	১০৭
প্রথম পদ্য	শ্রীতনু চৌধুরী	১০৮
সোনার রেখা	কৃষ্ণা চক্রবর্তী	১০৮
আশ্বিন	শঙ্খশুভ্র পাত্র	১০৯
চিত্রনাট্য	বিরূপাক্ষ পণ্ডা	১০৯
কি জানি কি ভেবে	ঐন্দ্রিলা মুখোপাধ্যায়	১০৯
সব প্রেমেই বসন্ত	বনশ্রী রায় দাস	১১০
শেষের খেয়া	জয়ন্ত কুমার মল্লিক	১১১
মায়ের বিছানার নদী	শিখা মল্লিক	১১১
বাল্মীকি	অরুণ ভট্টাচার্য	১১২
দিনমানে দিনমণি	সৌমেন্দ্র নাথ মাহাত	১১২

সু আর কু	সনৎ কুমার দাস	১১৩
একটি অন্ধকার দৃশ্য	অরুণাভ বীর	১১৩
ভালোবাসি	সুমিত্রা সাউ গিরি	১১৪
সতর্ক সিন্দুক	কমলেশ নন্দ	১১৪

ছোটগল্প

কুসুম	জয়ন্ত দাস	১১৬
রাজ বৃক্ষ	বলরাম নন্দী	১২১
হরিমতী	দিব্যায়ন দাশ	১২৩
অদিনের সিন্দুক	ভগীরথ মিশ্র	১২৬
ভাসমান	ঋতশ্রী মান্না	১৩০
লম্বা হাত খাটো হাত	অমর মিত্র	১৩২
ওসিডি ঠাকুর	চণ্ডীচরণ দাস	১৩৮
বৃষ্টিলেখা	সুকমল বসু	১৪২
কবিসম্মান	দেবাশিস দণ্ড	১৪৩

অনুগল্প ও অন্যান্য

পুরনো জিনিস বিক্রি	দেবাশিস দে	১৪৯
মিতাক্ষর নাবাল	লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল	১৪৯
রাতের আতঙ্ক	দীপ্তরূপা মল্লিক দাশগুপ্ত	১৫০
বাবা	বেবী সাউ	১৫০
মৃত মানুষদের মাধ্যাকর্ষণ ও সুরিয়েলিস্টিক ঘোড়া	নিমাই জানা	১৫১
পিয়ামুখচন্দা	সুদেষ্ণা দত্ত সাহা	১৫২
আমার ঈশ্বর	প্রিয়ব্রত গোস্বামী	১৫২

আলাপ-আলোচনা

অশ্বত্থ	মানবেন্দ্র পাত্র	১৫৫
সাঁকো সন্ধানী কবি তুলসীদাস মাইতি	গুরুপদ মুখোপাধ্যায়	১৫৬
উত্তর-আধুনিক যুগের ধ্রুপদী কবি-চিত্রশিল্পী ও সঙ্গীত সাধক ড .বাসুদেব মণ্ডল	চন্দ্রাবলী সোম	১৬২
জঙ্গলের বাউল মধুমিতা বেতাল	মৌপর্ণা মুখোপাধ্যায়	১৭১
খাবারে সুস্থ থাকা	নারায়ণ মাহাত	১৭২

প্রবন্ধ

স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাড়গ্রাম

ড. মধুপ দে

স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুরের ভূমিকা সকলেই নতমস্তকে স্বীকার করে। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে স্বাধীনতা অর্জনের সময় পর্যন্ত মেদিনীপুর, খড়্গপুর, কাঁথি, তমলুক এবং ঘাটাল মহকুমার সংগ্রামী মানুষ সহিংস এবং অহিংস উভয় পথেই এই স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু, সেই সময়ে নবগঠিত ঝাড়গ্রাম মহকুমার গৌরবময় ভূমিকার কথা খুব একটা প্রচারের আলো পায়নি। ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বৎসর পূর্তি উৎসবের এই প্রেক্ষাপটে সকলের জানা প্রয়োজন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ে ঝাড়গ্রামের মানুষও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

ব্রিটিশ ভারতে কংগ্রেস দলের সৃষ্টি যে কারণেই হোক না কেন বিংশ শতাব্দীতে জাতীয় কংগ্রেস এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল সমার্থক। কংগ্রেস কর্মী হওয়া মানেই স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে পুলিশের খাতায় নাম উঠে যেত। সেই সময়ে যারা কংগ্রেস দলে নেতৃত্ব দিতেন বা সদস্য হতেন তাঁরা জেনেশুনেই ব্রিটিশ বিরোধিতায় নিজেদের যুক্ত করতেন। ঝাড়গ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রামের তথ্য খুব বেশি সংগৃহীত হয়নি। কারণ, গভীর জঙ্গলে ঢাকা ঝাড়গ্রামের ইতিহাস লিখে রাখার কথা স্বাধীনতার পরেও তেমন করে কেউ ভাবেননি।

কিন্তু, ঝাড়গ্রাম যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে নীরব দর্শক ছিল না, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন মেদিনীপুর জেলার কালো ষাঁড় নামে খ্যাত উন্নতশির বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী অন্যতম প্রধান মুখ এবং জেলার অসহযোগ আন্দোলনের নেতা। ১৯২২ সালে নূতন ঝাড়গ্রাম মহকুমার জন্ম হয়। সেই ১৯২২ সালেই গিধনীতে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে বিরাট সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। এই সভায় প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ জমায়েত হয়েছিল। অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল। প্রজাদের উপরে মেদিনীপুর জমিদার কোম্পানির নিপীড়নের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তাতে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য চন্দ্রমোহন রাণা, গোবিন্দপ্রসাদ অধিকারী প্রমুখ স্থানীয় নেতাদেরও এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এই কাজের প্রধান হোতা ছিলেন মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার সুপরিচিত কংগ্রেস নেতা শৈলজানন্দ সেন। তিনি ছিলেন গিধনীর অধিবাসী। গিধনীতে কংগ্রেসের সেই সাংগঠনিক শক্তি ছিল বলেই তাঁর নেতৃত্বে স্থানীয় জনসাধারণ ব্রিটিশ বিরোধী নেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে সম্বর্ধনা দিতে পেরেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামী লেখক বসন্তকুমার দাস তাঁর 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর' গ্রন্থে বলেছেন,

"অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২১) প্রবল তরঙ্গে মেদিনীপুর জেলাতে যে বিপুল জাগৃতির সৃষ্টি করেছিল, ১৯২২ সালে সৃষ্ট ঝাড়গ্রাম মহকুমাতে তার সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ১৯২২ সালে যে মহকুমা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়, তার সভাপতি নির্বাচিত হন দীনেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়। রগড়া নিবাসী গদাধর মণ্ডল

মহাশয় এর অন্যতম সদস্য ছিলেন। ইনি মহকুমা আদালতের একজন আইন ব্যবসায়ী (মোক্তার) ছিলেন। সমাজসেবী হিসাবে এর যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রভাব ছিল। অবিনাশচন্দ্র সেনগুপ্ত, তারাপদ দে প্রমুখ প্রধান ব্যক্তিগণ সকলেই কংগ্রেসসেবী হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন।"

১৯২২ সালে জমিদাররা সকলে একজোট হয়ে সেট্‌লমেন্টের স্বত্বলিপিতে সেচকর, পথকর খাদকর, কাঁটাকর ও পাতাকর, এই পাঁচ প্রকার কর বাবদ টাকা প্রতি এক পয়সা অতিরিক্ত কর আদায়ের কথা ঘোষণা করেন। কংগ্রেস নেতা শৈলজানন্দের নেতৃত্বে ঝাড়গ্রাম মহকুমার জনসাধারণ এই অতিরিক্ত করের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এই কাজে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছিলেন ঝাড়গ্রাম মহকুমার সুন্দর নারায়ণ মাহাতো, হরমোহন মাহাতো, রমানাথ মাহাতো, উপেন্দ্রনাথ মাহাতো, কুলু মাহাতো, রাজীব মাহাতো, শিমুল সাঁওতাল, টুনিয়া মাণ্ডি, তারাপদ দে, জাহ্নবী চ্যাটার্জী, রমানাথ দত্ত, দর্পনারায়ণ বেরা, রাধানাথ বেরা, উপেন্দ্রনাথ বেরা, চন্দ্রমোহন রাণা, যুগলকিশোর রাণা, যতীন্দ্রনাথ দণ্ডপাট প্রমুখ কংগ্রেস কর্মীরা। বসন্তকুমার দাস মহাশয় বলেছেন প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা মহেন্দ্রনাথ মাহাতো এবং সাতকড়িপতি রায় এই আন্দোলনকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। এর জন্য শিলদা পরগনার মাহাতো এবং সাঁওতাল অধিবাসীবৃন্দ কংগ্রেসনেতা এবং হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট সাতকড়িপতি রায়কে মানপত্র দিয়ে অভিনন্দিত করেছিল।

তাছাড়া, লালগড়ের জমিদার যোগেন্দ্রনারায়ণ সাহসরায় এবং বেলিয়াবেড়ার প্রহরাজ কৃষ্ণচন্দ্র দাস মহাপাত্র নানাভাবে অর্থ সাহায্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্য করতেন। ১৯২৪ সালে তৎকালীন গোপীবল্লভপুর থানার বেলিয়াবেড়া গ্রামের গোপীনাথ পতি মেদিনীপুর শহরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল হিসেবে এসেছিলেন ব্যবসা করতে, কিন্তু, এখানে এসে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের অনুপ্রেরণায় তিনি কংগ্রেস দলের সদস্য হন। তিনি লোকাল বোর্ডের নির্বাচনে গোপীবল্লভপুর থানার কংগ্রেস প্রার্থীরূপে ইংরেজদের সমর্থিত ময়ূরভঞ্জ রাজার ক্ষমতাশালী ম্যানেজার দ্বিজদাস ভাদুড়ীকে পরাজিত করেন এবং পরে ঝাড়গ্রাম লোকাল বোর্ড থেকে মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। ময়ূরভঞ্জ রাজা প্রথমে ছিলেন ইংরেজ বিরোধী ও মারাঠাদের সমর্থক। ১৮০৩ সালের পর মারাঠারা বিদায় নিলে ময়ূরভঞ্জ রাজা ইংরেজদের পক্ষ গ্রহণ করেন। কিন্তু, গোপীবল্লভপুরের অধিবাসীরা ইংরেজবিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিয়ে কংগ্রেসপ্রার্থীকেই জয়যুক্ত করেন।

বেলিয়াবেড়ার সুসন্তান গোপীনাথ পতি বহুবৎসর ধরে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৩৪ সালে ঝাড়গ্রাম মহকুমা আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং নানাভাবে ঝাড়গ্রাম মহকুমা কংগ্রেস কমিটিকে সাহায্য করেছেন।

১৯২৭-২৮ সালে বিনপুর থানা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয় জনৈক বিহারীলাল পড়িয়ার উদ্যোগে। বিহারীলালের বাড়ি কাঁথি মহকুমায়। তিনি জেলাবোর্ডের স্বাস্থ্যবিভাগের একজন হেলথ এ্যাসিসট্যান্ট রূপে বিনপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি জেলাবোর্ডের কর্মীরূপে বিনপুর, শিলদা, লালগড়, দহিজুড়ি,

কুই কাঁকো, হাড়দা, সাহাড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে স্বাস্থ্য বিষয়ক কাজে গিয়ে কংগ্রেসের বার্তা ছড়িয়ে দিতে থাকেন।

অন্যদিকে ঝাড়গ্রামের দক্ষিণে পাথরা অঞ্চলের বৈকুণ্ঠনাথ মাহাতো, পদিমা অঞ্চলের পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও কুমুদচন্দ্র দাস, পেটবিন্ধি অঞ্চলের উমেশচন্দ্র বাগ, কুশমাড়ের ডা: সাধু মজুমদার, বেলিয়াবেড়ার রাধানাথ পতি, গোপীবল্লভপুর অঞ্চলের ধরণীধর দাস, কৃত্তিবাস দাস, রজনীকান্ত দাস, প্রফুল্ল কুমার দুবে ও সচ্চিদানন্দ অধিকারী এবং মহাপাল অঞ্চলের শ্রীনিবাস দাস প্রমুখ মিলিত হয়ে মহাপাল অঞ্চলে একটি শক্তিশালী কংগ্রেস কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন পদিমার পূর্ণচন্দ্র ঘোষ এবং সম্পাদক নির্বাচিত হন শ্রীনিবাস দাস। গোপীবল্লভপুর থানার স্যানিটরি ইনসপেক্টর শশীভূষণ দে ও হেলথ এ্যাসিসট্যান্ট বরেন্দ্রনাথ মাইতি এই কংগ্রেস কমিটির কাজে খুবই সহযোগিতা করতেন।

১৯২৯ সালে আসন্ন লাহোর কংগ্রেস উপলক্ষে কংগ্রেসের প্রচারের কাজ ব্যাপক আকার ধারণ করে। তখন গোপীবল্লভপুর, মহাপাল, পদিমা, বেলিয়াবেড়া, চোরচিতা, চন্দরী প্রভৃতি স্থানে জনসভার অধিবেশনে কংগ্রেসের লক্ষ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জেলাবোর্ডের ম্যাজিক ল্যানটার্ন ডেমনস্ট্রেটর অনন্তকুমার মুখার্জী, বিনপুরের হেলথ এ্যাসিসট্যান্ট বিহারীলাল পড়িয়া, কুমার চন্দ্র জানা প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই ভারতের লক্ষ্য বলে ঘোষিত হয় এবং সেই লক্ষ্য পূরণের পথ হিসেবে অহিংস আইন অমান্যের পথকেই বেছে নেওয়া হয়।

১৯৩০ সালের ১২ মার্চ সবরমতী আশ্রম থেকে মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষের যে ৭৮ জন আশ্রমবাসী ইংরাজ- রাজের বিরুদ্ধে আইন অমান্য করার জন্য ডাণ্ডি অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন তৎকালীন ঝাড়গ্রাম মহকুমার গোপীবল্লভপুরের অধিবাসী মতিলাল দাস। মতিলাল ছিলেন মহাত্মা গান্ধির অনুগামী এবং ডাণ্ডি অভিযানে তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ গোপীবল্লভপুরের যুবশক্তিকে চঞ্চল করে তুলেছিল, তার আর এক ঐতিহাসিক সাক্ষী 'বন্দীবাবু' ধনঞ্জয় কর। এই ধনঞ্জয় কর ছিলেন ঝাড়গ্রাম মহকুমার একজন সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি বেশির ভাগ সময় জেলে কাটানোর জন্য স্থানীয় মানুষজনের কাছে 'বন্দীবাবু'

নামে পরিচিত।

বর্তমান গোপীবল্লভপুরের নয়াবসান গ্রামে এক ওড়িয়া ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি বারিপদা জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি মেদিনীপুরে এসে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। তিনি মেদিনীপুরে অনুশীলন সমিতির সদস্য হয়েছিলেন। মেদিনীপুরে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে জেলা শাসক জেমস পেডিকে হত্যা করেন বিমল দাশগুপ্ত এবং যতিজীবন ঘোষ, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে জেলা শাসক রবার্ট ডগলাসকে হত্যা করেন প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য এবং প্রভাংশু পাল এবং ১৯৩৩ খ্রিস্টাদে জেলা শাসক বার্জকে হত্যা করেন অনাথবন্ধু পাঁজা এবং মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত। ভয়ে আর কোনো ব্রিটিশ জেলা শাসক মেদিনীপুর আসতে চাননি। কিন্তু, এর জন্য মেদিনীপুর জেলাব্যাপী শুরু হয় ব্যাপক ধরপাকড়। এই তিনটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেই ধনঞ্জয় করের নাম জড়িয়ে যায়। ইংরাজ পুলিশ তাঁকে ধরার জন্য গোপীবল্লভপুর থানার নয়াবসানে তাঁর বাড়িতে আসে। সেখানে তাঁকে না পেয়ে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ধরার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। তবুও পুলিশ তাঁকে ধরতে পারেনি। কিন্তু, ধরা না দিলে পুলিশের গুলিতে মারা যাবেন, এই ভয়ে তাঁর বড় শ্যালক তারাপদ ত্রিপাঠী তাঁকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেন। ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত তাঁকে মেদিনীপুর, বক্সার, বহরমপুর জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ আগস্ট তিনি নিঃশর্ত মুক্তি পান। কিন্তু ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ পুলিশ পুনরায় তাঁকে বন্দী করে এবং মেদিনীপুর, হিজলি, দমদম এবং ঢাকা জেলে বন্দী করে রাখার পরে ১৯৪৪ খ্রিসাব্দের শেষের দিকে মুক্তি দেয়। কমবেশি প্রায় দশ বছর জেল বন্দীর জীবন কাটানোর জন্য স্থানীয় মানুষ তাঁকে 'বন্দীবাবু' বলে ডাকত। বন্দীবাবু ধনঞ্জয় কর গোপীবল্লভপুরের এক জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। স্বাধীনতালাভের পরে যখন সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেস দলের জয় জয়কার, তখন ১৯৫২ সাল থেকে পরপর তিনবার তিনি অকংগ্রেসী সদস্য হিসেবে বিধানসভার ভোটে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করেছিলেন। গোপীবল্লভপুরের মানুষ সেই সময়ের কংগ্রেসকে ছেড়ে ব্যক্তি ধনঞ্জয় করের উপরেই আস্থা রেখেছিল।

১৯৩৭ সালে ভারত সরকার আইন (Government of India Act, 1937) পাশ হলে ব্রিটিশ সরকার বাংলা বিধানসভার নির্বাচন ঘোষণা করেন। ভারতের ব্রিটিশ সরকার প্রত্যেক কংগ্রেস প্রার্থীর বিপক্ষে এ দেশীয় প্রভাবশালী অনুগত ব্যক্তিদের দাঁড়াবার ব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে করে। কংগ্রেসের জনপ্রিয় নেতা দেবেন্দ্রলাল খানের বিপক্ষে দাড়ান রায়সাহেব শম্ভুচরণ দত্ত এবং কিশোরীপতি রায়ের বিপক্ষে দাঁড়ান ঝাড়গ্রামের রাজা নরসিংহ মল্লদেব। ইংরেজ সরকার কংগ্রেস কমিটিকে অবৈধ ঘোষণা করে এবং নেতাদের হয় বন্দী করে অথবা নির্বাসনে পাঠায়। সরকারি অফিসারদের দ্বারা কংগ্রেস প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রচারও চালানো হয় এবং কংগ্রেস প্রার্থীদের ভোট দিলে তাদের উপরে নির্যাতন আরো বেড়ে যাবে বলে ভয় দেখানো হয়। কিন্তু, নির্বাচনে এই ঝাড়গ্রামের মানুষ বিদেশী শাসকের সমস্ত প্রকার চোখ রাঙানি ও শাসানিকে উপেক্ষা করে ভোটাধিকার প্রয়োগে মহকুমার

সমস্ত কংগ্রেস প্রার্থীকে জয়যুক্ত করেন। এই সমস্ত ঘটনাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সেই সময়ে ঝাড়গ্রামে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিভূ কংগ্রেস দল কতটা শক্তিশালী ছিল।

মনে হয়, এই কারণেই স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ঝাড়গ্রামে ছুটে এসেছিলেন এখানকার মানুষজনকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গতি প্রকৃতি জানাতে। যে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ ভারতে ব্রিটিশের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন, যাঁকে কারাগারে অন্তরীণ করে রাখার জন্য ব্রিটিশ সরকার একের পর এক ফন্দি করেছিল, সেই দূরদর্শী জাতীয় নেতা নেতাজি তাঁর শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর অন্তর্ধানের আগে আগে ঝাড়গ্রামের মত অরণ্যভূমিতে ছুটে এসেছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যখন সমগ্র ভারতবর্ষ উত্তাল, তখন তিনি ঝাড়গ্রামের কংগ্রেসকর্মীদের ত্যাগ ও সংগ্রামের পথে স্বাধীনতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে এসেছিলেন। এই সময়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে গান্ধিজির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতপার্থক্য বাইরে বেরিয়ে আসে। সুভাষ চন্দ্র বসু বিভিন্ন স্থানে কর্মীসভা ও প্রকাশ্য সভায় মানুষকে বোঝান যে, আপোষ নীতিতে থেকে ইংরাজদের কাছ থেকে স্বরাজ পাওয়া যাবে না, এর জন্য প্রয়োজন ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম। তিনি এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকে পুনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে বক্তব্য রাখেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি মেদিনীপুরে এসে ঝাড়গ্রামের কর্মীসভাতে ভাষণ দিয়েছিলেন। ১৯৪০ সালের ১২ মে সুভাষ চন্দ্র বসু ঝাড়গ্রামে সারাদিন থেকে একটি কর্মী সভা, ঝাড়গ্রামের আইনজীবীদের সঙ্গে একটি বৈঠকি সভা ও একটি প্রকাশ্য জনসভা করে গিয়েছিলেন। এই তথ্য থেকে জানা যায় যে, সে সময়ে ঝাড়গ্রামও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পিছিয়ে ছিলনা। সুভাষচন্দ্র জানতেন যে, ঝাড়গ্রামবাসী ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের বিধানসভা নির্বাচনে ব্রিটিশের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ব্রিটিশবন্ধু ঝাড়গ্রাম রাজাকে এবং ময়ূরভঞ্জের রাজার ম্যানেজারকে পরাজিত করে এই মহকুমার সমস্ত কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়যুক্ত করেছিল। তাছাড়া, ব্রিটিশ ভারতে যেখানে কংগ্রেস করা মানে ব্রিটিশ বিরোধী হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করা, সেখানে এই ঝাড়গ্রামবাসীর দহিজুড়িতে বিরাট তোরণ বানিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা প্রদানের সাহস দেখিয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র ১৯৪০ সালের ১১ মে শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে ট্রেনে মেদিনীপুর আসেন এবং নাড়াজোল রাজার অতিথি হিসেবে গোপপ্রাসাদে (বর্তমান গোপ কলেজ) রাত্রিবাস করেন। পরের দিন ১২ মে সকালে তিনি রাজকুমার দেবেন্দ্রলাল খান ও কংগ্রেসকর্মী রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সঙ্গে মোটরগাড়িতে চেপে ধেড়ুয়া হয়ে ঝাড়গ্রাম এসেছিলেন। তখন এটাই ছিল ঝাড়গ্রাম আসার একমাত্র চালু পথ। আসার পথে দেপাড়া গ্রামে একদল কীর্তনীয়া, বন্দেমাতরম ধ্বনির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রকে মাল্যদান করেন। তারপরে চাঁদড়ায় পৌঁছালে মহিলারা শঙ্খ বনির সঙ্গে তাঁকে চন্দন চর্চিত করেন। সেখানে মুচিরাম সিং, শশধর পাল, বরেন্দ্রনাথ মাইতি ও কিশোরীমোহন মাহাত প্রমুখ কংগ্রেস কর্মীবৃন্দ এবং স্থানীয় নরনারী তাঁকে সম্বর্ধিত করেন। সম্বর্ধনার উত্তরে নেতাজি সকলকে সংঘবদ্ধভাবে

স্বরাজলাভের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান করেন। ধেড়ুয়াতে কংসাবতী নদীতে মোটরগাড়ি পারাপারের জন্য একটি লোহার বোট রাখা থাকত। ঐ বোটে মোটরগাড়ি পার করে বৈতা ঘাটে উঠে সুভাষচন্দ্র দহিজুড়ি হয়ে ঝাড়গ্রাম এসেছিলেন।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দহিজুড়িতে সুভাষচন্দ্রকে অভ্যর্থনা জানাতে বিশাল 'শাসমল তোরণ' নির্মাণ করা হয়েছিল এবং সুভাষচন্দ্রকে দর্শন করার জন্য প্রচুর জনসমাগম ঘটেছিল। এখানে তৎকালীন সময়ে মহিলারা এসে চন্দন তিলক এবং ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। ঐখানে নিকুঞ্জ মণ্ডল, আশুতোষ মিশ্র ও সস্ত্রীক দেবাদিদেব রায় সুভাষচন্দ্রকে মাল্য প্রদানে অভিনন্দিত করেছিলেন। জনতার অনুরোধে তিনি এখানেও ভাষণ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, আপোসের দ্বারা নয়, ত্যাগ ও সংগ্রামের পথেই স্বরাজ লাভ করতে হবে। ঝাড়গ্রামে পৌঁছে তিনি নেলিকো সিডস্ স্টোরসের মালিক নলিনবিহারী মল্লিকের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। জানা যায়, সেখানে কুমারী অনিমা মল্লিক ও সাহানা দাস তাঁকে মাল্যদান ও চন্দন-চর্চিত করেন এবং নীলিমা কুণ্ডু, স্নেহলতা দাস প্রমুখের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ বন্দে মাতরম সংগীত করেন। দুপুরে সুভাষচন্দ্র একটি কর্মীসভায় সভাপতিত্ব করেন। এই কর্মীসভায় ডা: সতীশচন্দ্র ঘোষ, মোহিনীমোহন মণ্ডল, জওহরলাল বক্সী, নন্দদুলাল সিং, দেবেন পাস, প্রমথনাথ ব্যানার্জী, দেবেন্দ্রলাল খান সহ অখণ্ড মেদিনীপুর জেলার বহু কংগ্রেসকর্মী যোগদান করেন। এখানে সুভাষচন্দ্র সেই সময়ে ভারত এবং ইউরোপের পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তব্য রেখে তার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য একটি কর্মপরিষদ গঠনের প্রস্তাব দেন।

সেদিন বিকেলে বার লাইব্রেরিতে আইনজীবীদের সঙ্গে মিলিত হন। সেখান থেকে শোভাযাত্রা করে বর্তমান দুর্গা ময়দানে (তৎকালীন লালগড় মাঠে) প্রকাশ্য জনসভায় যোগ দিতে যান। সভায় আসা মাত্র বাজি পুড়িয়ে এবং বিপুল জয়ধ্বনি দিয়ে গান গেয়ে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়েছিল। তারপরে মহিলাদের দুটি দল পরপর 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী' এবং 'ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা' দুটি গান পরিবেশন করার পরে কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং যুবক সমিতির পক্ষ থেকে রামচন্দ্র মাহাত নেতাজির উদ্দেশ্যে দুটি মানপত্র পাঠ করেন। এই সম্মাননার জবাব দিতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র সুদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। সুভাষচন্দ্র কলকাতার কয়েকটা সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে একতরফা জাতীয়তা বিরোধী সংবাদ পরিবেশনের দ্বারা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগ করেন।

এরা বাংলার কংগ্রেসের নীতি ও কর্মপন্থা সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করে তাঁদের হেয় করতে চাচ্ছে। তিনি হিন্দুমহাসভার কর্মকাণ্ডেরও সমালোচনা করেন। তিনি

এখানে মহাত্মা গান্ধির আপোষ নীতিরও প্রবল সমালোচনা করেন। তিনি এখানে বলেন, আপোষের পথে নয়, দরকষাকষি করে নয়, স্বরাজ পেতে হবে ত্যাগ এবং সংগ্রামের পথে।

বিভিন্ন মহলের ইচ্ছাকৃত বাধায় সুভাষচন্দ্রের সভায় লোক সমাগম কিছু কম হয়েছিল। বিশেষ করে ঝাড়গ্রামের রাজা ব্রিটিশদের অনুগত থাকায়, তাঁর ম্যানেজার দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের মাধ্যমে সর্বত্র খবর পাঠিয়েছিলেন, যেন এই সভায় কেউ না যোগ দেয়। রাজার অর্থানুকুল্যে রাজমাতার নামে স্থাপিত কুমুদ কুমারী ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক রাধাশ্যাম বসু দেবেন্দ্রমোহনের নির্দেশে সুভাষচন্দ্রের সভায় না যাবার জন্য সমস্ত শিক্ষকদের কাছে এবং প্রতি ক্লাসে নোটিশ পাঠিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। সুভাষচন্দ্র সভায় দাঁড়িয়ে রাধাশ্যামবাবুর এই কাজের যথোচিত সমালোচনাও করেছিলেন। তবে আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে, তৎকালীন সময়ে ঝাড়গ্রাম রাজার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে প্রচুর মানুষ সভায় উপস্থিত হয়ে বোঝাতে পেরেছিলেন, রাজাকে তারা শ্রদ্ধা করলেও ব্রিটিশের পদসেবা নয়, আপোষের দ্বারা স্বাধীনতা নয়, ঝাড়গ্রাম চায় ত্যাগ ও সংগ্রামের দ্বারা পূর্ণ স্বরাজ।

আমরা জানি, সুভাষ চন্দ্র কেবল বীরশ্রেষ্ঠ ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন ইতিহাস সচেতন রাষ্ট্রনেতা। তিনি জানতেন, ঝাড়গ্রামের সমস্ত জনজাতি সম্প্রদায় সহ নিম্নবর্গের মানুষরাই দেশজ মানুষের অধিকার অর্জনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন করেছিল। তিনি এও জানতেন, কোনোরূপ পরিণতির কথা না ভেবে নিজেদের সামান্য তীর, গুলতি, বর্শা, টাঙ্গি নিয়ে যারা বন্দুকধারী ইংরাজদের বিরুদ্ধে ৩৪ বছর ধরে লড়াই করে, যারা তাদের প্রিয় রাজাকে ভোট না দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের হোতা কংগ্রেস দলের পক্ষে ভোট দেয়, স্বাধীনতা সংগ্রামের মহাযুদ্ধের বাস্তব পরিস্থিতি তাদের বোঝানো প্রয়োজন সকলের আগে। তাই, ভারতবর্ষের স্বাধীনতাযুদ্ধের টালমাটাল সময়েও নেতাজির মত ব্যস্ততম মানুষ এখানে কংগ্রেসকর্মীদের বোঝাতে এসেছিলেন, সেই সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের অভিমুখ কী হওয়া উচিৎ।

স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ দশ বছরের মধ্যে ১৯৪০ সালে দহিজুড়িতে ব্রিটিশ রাজের এক নম্বর শত্রু সুভাষচন্দ্রকে সম্বর্ধনা প্রদানের জন্য সেখানকার কংগ্রেসকর্মীদের জনবল এবং বুকের পাটা থাকা চাই। দহিজুড়িতে কংগ্রেসের সেই শক্তি এবং সাহস ছিল বলেই তারা তোরণ বানিয়ে সুভাষচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করতে পেরেছিল। সংগঠন মজবুত না হলে সেই সময়ে এমন কাজ করার দুঃসাহস কংগ্রেসের হত না।

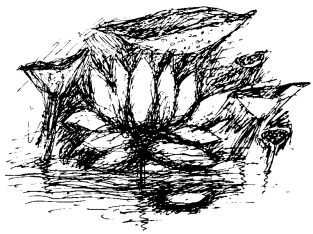

বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে

অঞ্জন শিকদার সম্পাদিত 'আয়ুধ'-এর স্বাধীনতা সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত

পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরাজরাজের কু-শাসন ও শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাঁওতালরা বিদ্রোহ করেছিল ১৮৫৫-৫৬ সালে। শক্তিশালী বৃটিশরাজের সঙ্গে সে এক আপসহীন সংগ্রাম। হাজার হাজার সাঁওতাল বীরের মত লড়াই করে জীবন বিসর্জন দিয়েছিল। কিন্তু এটাই বৃটিশরাজের সঙ্গে তাদের একমাত্র সংগ্রাম নয়। তারপরও সাঁওতাল বিদ্রোহের দামামা বেজে উঠেছে ১৮৭১ ও ১৮৮০-৮১ সালে। ১৮৮০-৮১ সালের বিদ্রোহ ক্রমেই প্রবলাকার ধারণ করছে দেখে সেদিন ইংরাজ সেনাপতি টমাস গর্ডন বহু কামানসহ এ বিদ্রোহ দমন করেন। পরবর্তীকালে সাঁওতালরা জাতীয় কংগ্রেসের ডাকে আইন অমান্য আন্দোলন, সত্যাগ্রহ, অসহযোগ আন্দোলনগুলিতে অংশগ্রহণ করতে থাকে। বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের আগে পর্যন্ত আমরা তাই দেখতে পাই। ফলে, জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব তাদের রাজনৈতিক জীবনের ওপর পড়ে এবং জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে তাঁরা সচেতন হয়ে ওঠেন। স্বদেশী আন্দোলন করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় তাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছেন, কারাবরণ করেছেন এবং বলা যায়, তাঁরা জাতীয় কংগ্রেসের স্বদেশী আন্দোলনের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। বৃটিশ সরকার শত চেষ্টা করেও তাদের নিবৃত্ত করতে পারেনি।

বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনের আগে দুমকা, জামতাড়া কারমাটাঁড়, বারোমাসিয়া, শিকারী পাড়া, দেওঘর, জসিডি, মধুপুর, গোড্ডা, রামগড়, সাহেবগঞ্জ, রাজমহল, পাকুড়, বারহেট, তিনপাহাড়, বোরিও, চাকুলিয়া, ঘাটশিলা, শিলদা, শালবনী, রাইপুর, অম্বিকানগর, সাঁওতালদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের কু-শাসন, জমিদারী ও মহাজনী শোষণ-অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের আগুন সাধারণতঃ এ সমস্ত জায়গাতেই জ্বলে উঠত। থানা-পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে এ সমস্ত অঞ্চলের সাঁওতালই বেশি গ্রেপ্তার হয়েছে। সুপারিনটেনডেন্ট অব্ পুলিশ, দুমকার সিক্রেট মেমো নং ২৬৩৮/৫৮/৩৮(১)৫২ এর অনুসারে সাঁওতাল নেতাদের মধ্যে দুলাড়চাঁদ টুডু, কিষ্ট মুরমু, দক্ষিণ মুরমু, দুখু হেমব্রম, নিলু মুরমু, বিক্রম হাঁসদা, চাঁদ টুডু, ভিকু মুরমু, সুখু মুরমু, দাবু মুরমু, বারসা মারাণ্ডি, চন্দর টুডু, কংকা হাঁসদা, আলাখি মাঝি, পৃথিবী হাঁসদা, গঙ্গা সরেন, রাম সরেন, মঙ্গল মুরমু, দুগ্‌গা সরেন, ভরত মুরমু, পাপন মারাণ্ডি, লুথরু মুরমু, জয়রাম মুরমু, প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জানা যায়, ১৯৪০ সালে সাঁওতালদের মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লকের কাজকর্ম প্রচারের জন্য লম্বোদর মুখার্জী পাকুড়ে যান। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ঊষারাণী মুখার্জী। সেখানে তাঁরা এক জনসভার আয়োজন করেন এবং সেই সভায় লাল হেমব্রম এবং পাগান মারাণ্ডি বক্তব্য রাখেন। বলতে বাধা নেই, সমগ্র সাঁওতাল পরগনায় ফরওয়ার্ড ব্লক পার্টির কাজকর্ম প্রচারে এবং বিয়াল্লিশ আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করায় লম্বোদর মুখার্জী ও ঊষারাণী মুখার্জীর অবদান অনেকখানি। সাঁওতাল পরগনায় তাঁরা

অভিহিত হতেন 'সারং বাবা' ও 'সাঁওতাল মাতা' রূপে। লম্বোদর মুখার্জীকে নানাভাবে সাহায্য করেন কয়েকজন তরুণ। সাঁওতাল বিপ্লবী; তারা হলেনঃ লাল হেমব্রম, পাইকা মুর্মু, ভরত মুরমু, পাগান মারাণ্ডি এবং লণ্ড হেমব্রম। মিটিং-মিছিল, মাদক দ্রব্য বিরোধী আন্দোলন প্রভৃতি নানা ধরণের কর্মসূচিকে তাঁরাই সবসময় রূপায়িত করতেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ও কর্মঠ ছিলেন লাল হেমব্রম। তিনি যাদের নিয়ে কাজ করতেন তাঁরা হলেন ঃ নাগরিটোলার খাদু টুডু, খিজুরডাহার লোগদা মুরমু, পাথরার চাম্পাই মুরমু, খুড়িডির প্রভু হেমব্রম, বেনাচিতির সুফল মুরমু, মহুল পাহাড়ীর মঙ্গল মারাণ্ডি এবং বাসো হেমব্রম,পাথরিয়ার সুরাইয়া মুরমু এবং পাথরদহর ভাদো মুরমু ও মাতলা সরেন।

আগস্ট মাসেই আন্দোলনের ডাক সাঁওতাল পরগনায় এসে আছড়ে পড়ল। ১৯শে আগস্ট সাঁওতাল ও পাহাড়িয়ারা একজোটে রাজমহলের মান্দ্রো ইনস্পেকশন বাংলো, হাটচালা ও মদের দোকানগুলি ভেঙ্গে দিয়ে আন্দোলন শুরু করল। তিনদিন পরেই দুমকার জবরদহত সাঁওতালদের এক বিরাট জনসভা বসল। সরকার এই জনসভা বন্ধ করতে পারল না। সভার সভাপতি পাইকা মুরমু। মাঝি-পারগাণারা সবাই সভায় উপস্থিত। তীর-ধনুক, ধামসা, মাদল, বাঁশীসহ হাজার হাজার সাঁওতালের উপস্থিতিতে সভা সরগরম। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এই জনসভা। সভায় সেদিন দুমকা-রামপুরহাট সড়কের সমস্ত সেতু ভেঙ্গে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জানা যায়, সেদিনই সাঁওতালরা ঝিলি ডাবরার বিদ্যুতের লাইন কেটে দেয় এবং একটি সেতু ভেঙ্গে ফেলে। (মতিলাল কেজরিওয়াল: ৪২ কি ক্রান্তি মেঁ সানতাল পরগনা, পৃ.-৯৯)

এরপর সাঁওতালরা রাস্তাঘাট, সেতু, টেলিগ্রাফের খুঁটি প্রভৃতি ভেঙ্গে ফেলে সরকারের যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর আক্রমণ শুরু করল। আক্রমণের মাত্রা ক্রমেই তীব্র হতে লাগল। ইংরাজরাজের পুলিশ সাঁওতালদের দমন করতে গিয়ে নাজেহাল হতে লাগল। ২৩শে আগস্ট বিক্রম হাঁসদা, বারসা মারাণ্ডি ও বারসা মুরমু পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন ও তাঁদের শিকারীপাড়া থানায় নিয়ে যাওয়া হল।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাকে সাঁওতালদের সাড়া ক্রমশঃ বাড়ছে দেখে শাসকগোষ্ঠী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ৫ই সেপ্টেম্বর বারোমাসিয়াতে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সাঁওতালদের সংঘর্ষ হল এবং সেনাবাহিনীর গুলিতে দু'জন সাঁওতালের মৃত্যু হল। এরপর বিপ্লবীরা কদমা ও পলাশীর দিকে অগ্রসর হল। পলাশীতে আবার এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হল।

পলাশীর এই জনসভায় সভাপতি পাইকা মুরমু। কয়েক হাজার সাঁওতাল এই জনসভায় উপস্থিত। সভার কাজ শান্তিভাবে চলছে। কোন গণ্ডগোল নেই। আচমকা সেনাবাহিনী সেখানে উপস্থিত হয়ে জনসভার উপর গুলিবর্ষণ করল। পলাশীর জনসভায় জালিয়ানাওয়ালাবাগের আর একবার পুনরাবৃত্তি ঘটল। বহু লোক আহত হল, দু'জন মৃত্যুবরণ করল। জানা যায়, নেতৃস্থানীয় আহতদের মধ্যে সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিলেন সাজাইদহর বারিয়ার হেমব্রম, ধরমপুরের, রাগদা মুরমু, পাথরার টুমু টুডু এবং সুন্দরাফলমের নন্দলাল মারাণ্ডি। লাল হেমব্রম, পাইকা মুরমু ও অন্যান্য নেতারা কিছুদিনের জন্য আত্মগোপন করলেন। লাল

হেমব্রমকে ধরতে না পেরে সরকার তাঁর বৃদ্ধ পিতা ভাদো হেমব্রমকে গ্রেপ্তার করল, কিন্তু কোন ফল হল না। আরও নতুন নতুন নেতার আবির্ভাব ঘটতে লাগল। এইসব নেতারা হলেন ঢাকজলের চাঁদরায় টুডু, সরাইদহর ভিকু মুরমু ও পাটসোরের মুন্‌সি হাঁসদা। মুন্‌সি হাঁসদার সহকর্মীরা ছিলেন রামখুড়ি গ্রামের সিধু মুরমু ও লুগু হেমব্রম, লতালায়ের ধনো বাস্‌কে, পলাশীর লপ্‌সা সরেন এবং পাটকাবরা গ্রামের ছোটন সরেন। তারা মুন্‌সি হাঁসদার নেতৃত্বে গোপনে বৈপ্লবিক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল। পরে তারা ধরা পড়ে এবং তাদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। (মতিলাল কেজরিওয়াল ঃ ৪২' কি ক্রান্তি মেঁ সানতাল পরগনা, পৃ-১০৩)

এখানে একটা কথা বলে রাখি। বিহারে গান্ধীজীর 'আইন অমান্য আন্দোলন' শুরু হওয়ার পর থেকেই চলছিল মাদক বিরোধী অভিযান। মদের দোকান যেখানে সেখানে হওয়ার ফলে গরীব মানুষের রোজগারের মোটা টাকা চলে যেত মদের দোকানে আর সরকারী আবগারী বিভাগের লাভ হত প্রচুর। তাই আগস্ট আন্দোলনের সময়ে সাঁওতালদের একটা বড় কর্মসূচি ছিল আবগারী অফিস ও মদের দোকানগুলো ভেঙ্গে ফেলা কিংবা জ্বালিয়ে দেওয়া। সাঁওতাল বিপ্লবীরা দেওঘর, গোড্ডা ও দুমকা মহকুমায় মদের দোকানগুলোর ওপর আক্রমণ শুরু করল; মানিকপুর, মধুরপুর, বেলডাঙ্গা, সারাউনি, কোরিডি, বাঁশবেড়িয়া, মথুরাপুর, শংকরপুর, চন্দনা, তাড়কা প্রভৃতি জায়গার মদের দোকানগুলো ভেঙ্গে ফেলে জ্বালিয়ে দেওয়া হল।

৯ই সেপ্টেম্বর চিরুডি, মুচরিডি, শিলিংগী এবং কুসচিরায় বনরক্ষীদের সরকারী ঘরগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হল। সরকার আন্দোলকারীদের বাধা দিতে পারল না। কিভাবেই বা বাধা দেবে? যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। বাইরে থেকে কোনরকম সাহায্য পাওয়ার উপায় নেই। বাইরের খবরা-খবর পাওয়া যায় না, বাইরে কোন খবরা-খবর পাঠানোও যায় না। আমলারা নিরুপায়। ওদিকে আন্দোলনের আগুন সারা ভারতে জ্বলছে। বৃটিশরাজের অবসান ঘটছে বলে অনেকেই মনে করছে।

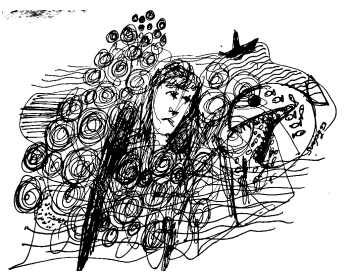

এবার অবিভক্ত বাঙ্গলার অবস্থা দেখা যাক। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলের ডাক সারা বাঙ্গলায় ছড়িয়ে পড়েছে। ইংরাজ ভারত ছাড়! থানা, ডাকঘর, সরকারী অফিস আক্রমণ করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হচ্ছে। রাস্তাঘাট, রেলস্টেশন ভাঙ্গচুর করা হচ্ছে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন লাইন ছিন্ন করে যোগাযোগ ব্যবস্থায় আঘাত হানা হচ্ছে। অন্যদিকে, শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারী পুলিশ ও সেনাবাহিনী জনতাকে বাধা দিচ্ছে, গুলি চালাচ্ছে, এই গণ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে। বৃটিশ রাজশক্তি অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছে মুক্তিকামী বিপ্লবীদের ওপর। কিন্তু অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতবাসী আজ বৃটিশ শাসন চূর্ণ করার জন্য সক্রিয় প্রতিরোধ সাধন মন্ত্রে জেগে উঠেছে। আঘাতের বদলে আঘাত, মারের বদলে মার। কুইট ইণ্ডিয়া! এবার আর ভারতবর্ষকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা যাবে না। ভারতের পূর্বাকাশে স্বাধীনতার সূর্য

দেখা দিয়েছে, পূর্বাকাশ তাই রক্তিম হয়ে উঠেছে। শাসকগোষ্ঠী আর শাসন ক্ষমতা ধরে রাখতে পারল না।

বিপ্লবীরা মেদিনীপুরে জাতীয় সরকার ঘোষণা করলেন। জাতীয় সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য এগিয়ে এসেছেন সতীশচন্দ্র সামন্ত, অজয় মুখোপাধ্যায়, সুশীল ধাড়া এবং আরো অনেকে। বিপ্লবের আগুন সারা বাঙ্গলায় ছড়িয়ে দিতে হবে। ভারত স্বাধীন হতে চলেছে জানতে পেরে আদিবাসী গ্রামগুলির কাছ থেকে সাড়া পাওয়া গেল। আদিবাসীরাও সংগঠিত হতে শুরু করল। তবে এটা স্বীকার করতে দোষ নেই যে, বিহারের আদিবাসী গ্রামগুলিতে আগস্ট আন্দোলনের আগুন যে রকম ভয়াবহরূপে ছড়িয়ে পড়েছিল, বাঙ্গলায় সেরকম হয়নি। অবশ্য কারণও ছিল। গোড্ডা, পাকুড়, দুমকা, দেওঘর, মধুপুর, জামতাড়া, রাজমহল প্রভৃতি স্থানে একসময়ে বহু সাঁওতাল বাস করত, পরে সে সমস্ত জায়গায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজন এসে বসবাস শুরু করায় সে সব জায়গা শহরে পরিণত হয়। আদিবাসী গ্রামগুলির সঙ্গে সে সব শহরের ভাল যোগাযোগ ছিল। কংগ্রেস এবং ফরওয়ার্ড ব্লক এ সমস্ত জায়গায় কাজ শুরু করায় গ্রামবাসীদের ওপর তাদের প্রভাব যথেষ্ট পড়েছিল। অন্যদিকে, বাঙ্গলায় আদিবাসী গ্রামগুলির সঙ্গে শহরের যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। গ্রামগুলি ছিল শহর থেকে বহুদূরে বনজঙ্গলের মাঝে বা ধারে– আর যাতায়াতের ব্যবস্থাও ছিল খুব খারাপ। এ অবস্থায় কোন বিপ্লবী সমিতি কিংবা রাজনৈতিক দল স্বদেশী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আদিবাসী গ্রামে যায় নি। 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলন কেন এবং কিভাবে আন্দোলন চলবে এ সম্পর্কে আদিবাসী সমাজের মানুষ সঠিক কোন নির্দেশ কিংবা কর্মসূচি সেদিন জানতে পারেনি। তবু তারা আন্দোলনে নেমে পড়েছিল স্বাধীনতা অর্জন করার আশায়। মেদিনীপুর জেলায় তাদের নেতৃত্ব দিল আদিবাসী মহাসভা। সেদিন আদিবাসী মহাসভার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন–পারগাণা মনসারাম মাণ্ডি, পারগাণা কালিচরণ সরেন, পারগাণা সুরেন্দ্রনাথ সরেন, পারগাণা শ্রীপতি হাঁসদা, নবীন সরেন, দীনবন্ধু মাণ্ডি, কালিরাম হেমব্রম, গুরাই চন্দ্র সরেন, মঙ্গল চন্দ্র সরেন, ডমন সরেন, ফাগু মুর্মু, সনাতন হাঁসদা, রতন সরেন, সুবোধ সরেন, শ্যামাচরণ মুর্মু প্রভৃতি। আদিবাসী মহাসভার এই সব পরিচালকই আদিবাসীদের নানারকম সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করত। ইতিপূর্বে আদিবাসী মহাসভা কয়েকবারই আদিবাসীদের বিভিন্ন দাবী মেদিনীপুরের জেলা কালেক্টরের নিকট পেশ করেছিল, কিন্তু কোন ফল পাওয়া যায়নি, বিদেশী সরকার তাদের দাবীতে কর্ণপাত করেনি। এবার সুযোগ এসেছে ইংরাজকে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে তারা স্বাধীন হবে। কিন্তু কিভাবে? আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি বাঙ্গলায় স্বাধীনতা লাভের পূর্বে আদিবাসী গ্রামগুলির সঙ্গে শহরের যোগাযোগ প্রায় ছিল না। ভাল রাস্তা ছিল না, টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের যোগাযোগ প্রায় ছিল না, প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং রাস্তাঘাট, সেতু-সাঁকো ভেঙ্গে কিংবা টেলিগ্রাফ-টেলিফোন লাইন কেটে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার উপায় নেই। হ্যাঁ-ট্যাক্স ও খাজনা বন্ধ করে দেওয়া চলে। অবিলম্বে ট্যাক্স ও খাজনা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আদিবাসীদের বলা হল। আর কি করতে পারে আদিবাসী মহাসভা? সরকারী আয় এ সময় বন্ধ করে দিতে পারা যায়, গ্রামে-গঞ্জে সরকারের অসংখ্য আবগারী দোকান আছে, এগুলো থেকে সরকার

প্রচুর আয় করে এবং এগুলির সাহায্যে সরকার সাধারণ মানুষকে শোষণ করে যাচ্ছে। শোষণের এই ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করতে হবে। আদিবাসী মহাসভার নির্দেশে সাঁওতালরা আবগারী দোকানগুলো জ্বালিয়ে দিতে লাগল। ফাগু মুর্মুর নেতৃত্বে শিলদা, বিনপুর, পড়িহাটী, জামবনী, দহিজুড়ীর আবগারী দোকানগুলো ভাঙচুর করে জ্বালিয়ে দেওয়া হল। এ খবর চাপা থাকল না, বিনপুর হাট, শিলদা হাট, ট্যাংরা হাট, পাঁচখড়ি হাট, লালগড় হাট, রামগড় হাট, সারেঙ্গা হাটে খবর ছড়িয়ে পড়ল। ফলে গড়বেতা, শালবনী, গোয়ালতোড়, রামগড় প্রভৃতি অঞ্চলেও মদের দোকানগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হল। চার-পাঁচ মাইল অন্তর এক একটি আদিবাসী গ্রাম এবং তাও বনজঙ্গলের মাঝে মাঝে। থানা পুলিশের সাহস ছিল না আদিবাসী গ্রামে গিয়ে সেদিন দোষীদের বা আন্দোলনকারীদের খুঁজে বের করে।

তিলকা মাঝির সংগ্রাম থেকে শুরু করে স্বাধীনতালাভ পর্যন্ত ভারতে অসংখ্য আদিবাসী বিদ্রোহ হয়েছে। তারা কোনদিন কারো সহযোগিতা পায়নি, বরং বিরোধিতা পেয়েছে। এজন্য তাদের আক্ষেপ নেই। উল্টে বরং দেখা যায়, জাতীয় সংগ্রামের প্রতিটি ডাকে অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলন, আগস্ট আন্দোলন প্রভৃতিতে তারা সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর জেলা

সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়

"ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাত ঝড়,
ওদের কাহিনী বিদেশীর খুনে
গুলি, বন্দুক, বোমার আগুনে
আজো রোমাঞ্চকর;"

— সুকান্ত ভট্টাচার্য
(কবিতা-জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘাতে ব্রিটিশ সরকার ক্রমশ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এই আন্দোলন ভারতের প্রতিটি অঞ্চলকে স্পর্শ করে। শত দমন-পীড়নকে তুচ্ছ করে লক্ষ লক্ষ নর-নারী শুধুমাত্র ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য নিজেদের জীবনবলি দিতেও পিছুপা হননি। এই মহান যজ্ঞে তৎকালীন বাংলার মেদিনীপুর জেলার শত শত মানুষেরাও নিজের প্রাণ সমর্পণ করেন। যার ফলে মেদিনীপুর বাংলার সীমানা অতিক্রম করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য নক্ষত্র হিসেবে পরিগণিত হয়। এই মেদিনীপুর অঞ্চলটি ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার তৎকালীন নবাব মীরকাশিম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ইজারা বন্দোবস্ত দিলে 'চাকলা মেদিনীপুর' গড়ে ওঠে এবং এর অধীনে ৫৪টি পরগনা অন্তর্ভুক্ত হয়।

মেদিনীপুরে ব্রিটিশ বিরোধিতার বীজ মানুষের মনে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথমার্ধ থেকেই বিকাশ লাভ করেছিল। এক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা স্মর্তব্য। মেদিনীপুর জেলার 'জঙ্গলমহল' অঞ্চলে বেশ কিছু নিম্নবর্ণের হিন্দু অর্থাৎ লোধা, মাঝি, কুর্মি, বাগদী প্রমুখ সম্প্রদায়ের মানুষেরা বসবাস করতেন। এদের জমি ছিল একমাত্র সম্বল। কিন্তু ব্রিটিশ কোম্পানি ওই অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে গেলে এই সকল মানুষেরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। এমতাবস্থায় কোম্পানি এদের 'চুয়াড়' বলে অভিহিত করেন। কারণ, কোম্পানির চোখে এই সকল মানুষেরা ছিল হীন। এইভাবে ২টি 'চুয়াড় বিদ্রোহ' সংঘটিত হয়।

তমলুক রাজা কৃপানারায়ণের পত্নী ছিলেন রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া। কৃষ্ণপ্রিয়ার সাথে রাজা আনন্দ নারায়ণের গ্রামের উপর অধিকার নিয়ে মামলা হলে রাণী হেরে যান এবং তৎকালীন ইংরেজ গভর্নর সিপাহী পাঠিয়ে আনন্দনারায়ণের অধিকার সুনিশ্চিত করার প্রয়াস করলে রাণীকৃষ্ণ প্রিয়া এদের বাধা দেন ও খণ্ডযুদ্ধ বাধে। এই ঘটনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ, তৎকালীন সময়ে গভর্নরের বিরুদ্ধাচারণ করে একজন নারীর রুখে দাঁড়ানো যুগান্তকারী ঘটনা ছিল। এরপর একে একে 'নায়েক বিদ্রোহ', 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ', 'মঙ্গলী বিদ্রোহ', 'শোভা সিংহের বিদ্রোহ' জমিদারদের ধর্মঘট, 'নীল বিদ্রোহ' প্রভৃতি বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে মেদিনীপুর জেলায় ব্রিটিশ বিরোধিতার প্রেক্ষাপট রচনা হয়।

উক্ত বিদ্রোহগুলির মধ্যে জাতীয়তাবাদের বীজ না থাকলেও বিদ্রোহগুলি গড়ে উঠেছিল নিজ নিজ অধিকার রক্ষাকে কেন্দ্র করে। বিদ্রোহগুলির মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থ, শ্রেণী স্বার্থ, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, সম্প্রদায়গত স্বার্থ, আর্থিক স্বার্থ প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত হলেও মেদিনীপুরের জনগণের একটি অংশকে এই বিদ্রোহগুলি প্রভাবিত করেছিল। বিদ্রোহগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল অঞ্চল ভিত্তিক। এর মধ্যে সামগ্রিকতা ছিল না।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারত ইতিহাসের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো, লর্ড কার্জনের বঙ্গ বিভাগের পরিকল্পনা। ১৯০৫ সালের ১৯শে জুলাই সরকারিভাবে এই পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যার প্রতিবাদে বাংলা তথা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। এই পরিকল্পনার পশ্চাতে প্রশাসনিক সুবিধার যুক্তি সরকার উত্থাপন করলেও প্রকৃতার্থে বাংলায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বীজকে ধ্বংস করা এবং হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এর প্রতিবাদে কলকাতার টাউন হলে বিক্ষোভের প্রস্তুতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। একইভাবে মেদিনীপুরে ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট বেলী হলে ছাত্রদের সভার আয়োজন করা হয়। এই সভার সভাপতি ছিলেন 'মেদিনীবান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক দেবদাস করণ। ছাত্ররা জ্ঞানেন্দ্রনাথ বোস এবং সত্যেন্দ্রনাথ বোস-এর নেতৃত্বে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিদেশী দ্রব্য বয়কটের আদর্শ প্রচার শুরু করেন। 'ছাত্র ভান্ডার' তৈরীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে তিন দিনের জন্য মেদিনীপুরের ছাত্ররা জুতো, কোট এবং ছাতা না ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা করেন।

মেদিনীপুরের ছাত্র সমাজ বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলন, শোভাযাত্রা, সভা, বনধ্ প্রভৃতি পালন করে। সভায় কলকাতার কাশীচন্দ্র ঘোষাল এবং মেদিনীপুরের ভূমিপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ব্যানার্জী ব্রিটিশ বিরোধী জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। ক্রমে

মেদিনীপুরের শহর ছাড়িয়ে ক্ষীরপাই, দাঁতন, পাঁচবোল, ঘাটাল, মহিষাদল, কাঁথি প্রভৃতি স্থানেও এই কর্মসূচির বিস্তার ঘটে। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর মেদিনীপুরের জনসভায় জনগণ "বাঙ্গালীর সার্বজনীন প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া সরকার যখন বঙ্গবিচ্ছেদ পর্ব সমাধা করিল তখন আমরাও আমাদের জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার জন্য এবং আমাদের দেশ বিভাগের অবসান কল্পে আমাদের সাধ্যসম্মত সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হইব এই শপথ গ্রহণ করিতেছি এবং তাহা ঘোষণা করিতেছি। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন" (স্বাধীনতা সংগ্রাম মেদিনীপুর, পৃ. ৯৪) - এই মর্মে শপথ বাক্য পাঠ করেন।

মেদিনীপুর জেলায় তুলোর উৎপাদন ব্যাপক হওয়ায় স্বদেশী উদ্যোগে বয়ন শিল্পের সূচনা হয়। এছাড়া কাঁথিতে ধন ভান্ডার প্রতিষ্ঠা করা হয়। যাতে বয়ন শিল্প বিস্তার লাভ করতে পারে। এর দরুণ বিলেতি কাপড়ের ব্যবহার মেদিনীপুরবাসীর মধ্যে কমতে শুরু করে। চিত্তরঞ্জন দাশ লিখিত "মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক ইতিহাস" গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন, "বয়ন শিল্প প্রবর্তনের জন্য মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কাঁথিতে একটি বিপুল জনসমাবেশ হইল। সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল–আমরা কাঁথি মহকুমায় অধিবাসীবৃন্দ সর্বান্তঃকরণে আমাদের জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং আমাদের প্রিয় দেশের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হইয়া শপথ গ্রহণ করিতেছি যে বাংলাদেশের সুতা প্রস্তুত কার্য ও বয়ন শিল্পের উন্নয়নের জন্য আমাদের একদিনের উপার্জন দান করিব।"

মেদিনীপুরের তমলুক, ব্রহ্মা বারোয়ারি, মহিষাদল থানা, বামুনারা গ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে সভা, পিকেটিং তীব্র আকার ধারণ করে। এসব অঞ্চলের নেতৃত্বে ছিলেন 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী, রাজেন্দ্র নাথ ভুঁইয়া, কুঞ্জ বিহারী ভক্ত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

বাংলায় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বেশ কয়েকটি গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। যার মধ্যে যুগান্তর দল, অনুশীলন সমিতি ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের কার্যাবলীর মধ্যে গুপ্ত হত্যা ছিল অন্যতম পন্থা। মেদিনীপুরে বিপ্লবী কার্যকলাপের সূত্রপাত ঘটান রাজনারায়ণ বসু। ১৮৮১ সালে তিনি লিখেছেন, "ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যের মধ্যে স্বদেশের উপকার সাধন সর্বাপেক্ষা প্রধান।" ফলে তাঁর লেখা থেকে ধারণা করা যায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব থেকেই বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের ব্যক্তিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ধারণা গড়ে উঠেছিল। তাই তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "এদিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে তিনি একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন।.....দেশের সমস্ত খর্ব্বতা, দীনতা, অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন, তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত.....।"

রাজনারায়ণ বসুর পরবর্তী সময় জ্ঞানেন্দ্র নাথ বসু, হেমচন্দ্র দাস কানুনগো, সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই ব্যক্তি ত্রয়ী মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিপ্লবের বাণী প্রচার শুরু করেন। এছাড়া তাঁদের উদ্যোগে গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে মেদিনীপুরে। তিনজনই ইতালির বিপ্লবের ইতিহাস অনুধ্যান করে মেদিনীপুর তথা বাংলার যুব সমাজকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। হেমচন্দ্র দাস কানুনগো উপলব্ধি করলেন বিপ্লবী আন্দোলন ও আদর্শকে সফল করতে গেলে তাই সুনির্দিষ্ট রূপে বোমা তৈরির শিক্ষার প্রয়োজন। তার জন্য তিনি পরাধীন ভারত থেকে পাড়ি

দিলেন সুদূর পশ্চিমের দেশে। সেই পদ্ধতি শিখে এসে মেদিনীপুর তথা বাংলার গুপ্ত সমিতিতে বোমা তৈরির প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করলেন।

১৯০৬ সালে বরিশালে কংগ্রেসের প্রাদেশিক অধিবেশন শুরু হলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ফুলারের নির্দেশে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দেওয়ার অপরাধে অধিবেশন বন্ধ করে দেন এবং দমনপীড়নে বরিশালের রাজপথ রক্তস্নাত করে তোলেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে মেদিনীপুরের পাবলিক লাইব্রেরীতে উকিল কে.বি. দত্ত-এর সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় যুবক অতুলচন্দ্র বসু ও বিজয়ানন্দ সেন দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে বাংলার যে কোন জেলায় ব্রিটিশদের অত্যাচার নেমে এলে মেদিনীপুর জেলা তার প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিল।

মেদিনীপুরের মাটিতে বিপ্লবের বীজের অঙ্কুরোদগমে তৎকালীন পত্র-পত্রিকাগুলি বিশেষ ভূমিকা নেয়। যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দে মাতরম-এর পাশাপাশি দেবদাস করণ মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মেদিনীবান্ধব' পত্রিকা চরমপন্থী মতবাদের বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। ফলে মেদিনীপুর জেলা ক্রমশ বিপ্লবের আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়। মেদিনীপুরের শক্তি ধ্বংস করার জন্য ব্রিটিশ সরকার বাংলা ভাগের মতো মেদিনীপুরকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করার প্রস্তাব দেয়।

১৯০৭ সালে বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনার মি: হেয়ার মেদিনীপুর পরিদর্শনকালে মেদিনীপুরকে দু'ভাগে ভাগ করা হবে বলে ঘোষণা করেন। যথা, ১) ঘাটাল, মেদিনীপুর সদর (উঃ) ও ঝাড়গ্রাম মহকুমা নিয়ে মেদিনীপুরের জেলা সদর তৈরি এবং ২) তমলুক, কাঁথি ও মেদিনীপুর দক্ষিণ নিয়ে জেলার সদর হিজলি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এই ভাগের পশ্চাতে বাংলা ভাগের ন্যায় প্রশাসনিক সুবিধার কারণ উল্লেখ করা হয়। মেদিনীপুর ভাগের পরিকল্পনার প্রকৃত কারিগর ছিলেন তৎকালীন বঙ্গের ছোটলাট স্যার এন্ড ফ্রেজার।

১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নারায়ণগড় স্টেশনের কাছে 'ডিনামাইট'-র বোমা পেতে ছোট লাট ফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বিপ্লবীদের এই দলে ছিলে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উল্লাস কর দত্ত, বিভূতিভূষণ সরকার, প্রফুল্ল চাকী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বোমাটি উল্লাস কর দত্ত তৈরি করেছিলেন। ফ্রেজারকে হত্যার এর আগে দুটি পরিকল্পনাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তৃতীয়বারের পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হলে মেদিনীপুরের পুলিশ বিপ্লবীদের ধরতে সচেষ্ট হন। নেতৃত্ব ছিলেন জেলার পুলিশের ডেপুটি সুপারেনটেনডেন্ট মৌলবি মহযারুল হক। পুলিশ ৮ জন কর্তব্যরত রেলের নিরপরাধ কুলিকে গ্রেফতার করে। কুলিদের পক্ষে উকিল হিসেবে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল সওয়াল করেন। নিরপরাধ কুলিদের গ্রেপ্তারির ঘটনায় বিচলিত হয়ে পড়লেন বারীণ ঘোষ। তিনি কুলিদের শাস্তি পেতে দেখে মর্মাহত হয়ে বললেন, "যদি আমরা আমাদের বৈপ্লবিক কার্যাবলী বিবৃত না করি তবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই এই বৈপ্লবিক কার্যাবলী মিলিয়ে যাবে। যদি আমরা সমস্ত প্রকাশ করে দিই তবে আমরা ফাঁসী গেলেও আমাদের বৈপ্লবিক আয়োজন বেঁচে থাকবে। দেশের লোক আমাদের পরে কাজ করে আমাদের উদ্দেশ্য সফল করে তুলবে।" এরপর বারীণ ঘোষ সব সত্য হাইকোর্টে বলে নিরাপরাধ কুলিদের মুক্তির ব্যবস্থা করলেন।

মেদিনীপুরের হবিবপুর (মতান্তরে কেশপুর থানা)-এর মোহবনী গ্রামের ভূমিপুত্র ক্ষুদিরাম বসু মজফ্‌ফরপুরে গিয়ে কিংসফোর্ডকে হত্যার গুরু দায়িত্ব নেন। তিনি মেদিনীপুর অনুশীলন সমিতির সদস্যও ছিলেন। ক্ষুদিরাম ও তাঁর সহযোগী প্রফুল্ল চাকী ভুলবশত মিসেস কেনেডি ও তার কন্যাকে হত্যা করলে ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট তরুণ ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। এ প্রসঙ্গে বিপ্লবী যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এক হৃদয়স্পর্শী মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, "দেশ সেবার যজ্ঞবেদীতে স্বার্থলেশহীন আত্মবলিতে যে প্রোজ্জ্বল হোমাগ্নি আজও দেদীপ্যমান, তাতে সবিশেষ সমিধ ও শহীদ হয়েছিল বীর বালক ক্ষুদিরাম।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কাঁথি মহকুমার ভগবানপুর থানার মুগবেড়িয়ার জমিদার দিগম্বর নন্দ মহাশয় ক্ষুদিরাম সহ বহু বিপ্লবীদের সহযোগিতা করেছিলেন।

মজফ্‌ফরপুরে এই হত্যাকাণ্ডের পর কলকাতার পাশাপাশি মেদিনীপুরেও তল্লাশি শুরু হয়। এক্ষেত্রে ব্রিটিশ পুলিশ বেশ কয়েকজনের বাড়িতে আগে থেকে লুকিয়ে বোমা রেখে মিথ্যে মামলায় তাদের গ্রেফতার করা শুরু করে। এই ঘটনার বাস্তব উদাহরণ ১৯০৮ সালের ৮ই জুলাই পুলিশ সাহেব মিস্টার ব্রেটের বাহিনী প্যারীমোহন দাসের ছেলে সন্তোষ দাসকে গ্রেপ্তার করে এবং ২৩শে জুলাই প্যারীমোহন দাসকেও গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর এই একই পন্থা অবলম্বন করে যোগজীবন ঘোষ, নরেন্দ্রলাল খান, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যামিনী মোহন মল্লিক, অবিনাশ চন্দ্র মিত্র, উপেন্দ্রনাথ মাইতি প্রমুখকে কারারুদ্ধ করা হয়।

১৯০৮ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর পুলিশের ডেপুটি সুপার ১৫৪ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করেন। এর মধ্যে ১ জন রাজা, ১৫ জন উকিল, ২১ জন জমিদার, ৩ জন মোক্তার, ২০ জন ছাত্র, ৬ জন ডাক্তার, ৪৯ জন দোকানদার, ১ জন কর্মকার, ১ জন পাতি এবং ১ জন ভিখারী। ফলত, বোঝা যাচ্ছে ব্রিটিশ সরকার এতটাই ভীত হয়ে পড়ে মেদিনীপুরের সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে আসামী খুঁজে বেড়িয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখ্য, ভিক্ষাজীবী মানুষকেও বাদ দেয়নি। ১৫৪ জনের বিরুদ্ধে 'মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা' শুরু করা হয়।

'মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা' মিথ্যের ওপর তৈরি হওয়ায় টিকবে না দেখে সরকার পক্ষের আইনজীবী সত্যেন্দ্র প্রসন্ন ২৭ জনের মধ্যে ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করলেন এবং যোগজীবন ঘোষ, সন্তোষ কুমার দাস ও সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে 'এক্সপ্লোসিভ সাবস্ট্যানসেস অ্যাক্ট'-এর বিভিন্ন ধারাতে অভিযুক্ত করে মামলা সাজালেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ফ্লেচারকে কলকাতা হাইকোর্ট জরিমানা করেন। তবে উচ্চতর বেঞ্চে এই জরিমানা বাতিল করা হয়।

মেদিনীপুর জেলার গড়বেতার বিপ্লবী বসন্তকুমার সরকারকে ব্রিটিশ পুলিশ খুলনা ও যশোর জেলাতে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক ডাকাতির আসামি বলে

কারারুদ্ধ করে। এটি 'যশোর খুলনা গ্যাঙ্গ কেস' নামে পরিচিত। এই কেসে ৪৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া ময়না থানার বিপ্লবী গণেশ চন্দ্র দাস, শরৎচন্দ্র দাস বিপ্লবী কার্য্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। ১৯০৮ সালে গণেশ চন্দ্র দাস ও তৎকালীন মুন্সেফের পুত্র শৈলেন্দ্রনাথ দাসকে 'হলুদবাড়ি ডাকাতি মামলায়' সাত বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

১৯২০-র দশকে ভারতসহ বাংলার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ধারাতে গান্ধীজীর অসহযোগের আদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটে। সারা ভারতে গান্ধীজী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কথা ঘোষণা করলে বাংলার বিপ্লবীদের প্রতিনিধি ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত-র সাথে গান্ধীজীর ১৯২০ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে একটি চুক্তি হয়। চুক্তি অনুসারে শর্ত ছিল, এক বছরের মধ্যে কংগ্রেস স্বরাজ অর্জনে ব্যর্থ হলে বিপ্লবীরা তাদের নিজস্ব পথে ফিরে যাবেন। কিন্তু এই এক বছর বিপ্লবীরা গান্ধীজীর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেবেন। এমতাবস্থায় মেদিনীপুর জেলাতেও বিপ্লবী কাজ বন্ধ রইল।

গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মেদিনীপুরের অন্যতম বিখ্যাত ব্যক্তি বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এই জেলাতে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটালেন। তাছাড়া তাঁর নেতৃত্বে ১৯২১ সালে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয় এবং অতিরিক্ত কর দেওয়ার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হন। সহস্র মানুষ ধ্বনি তুললেন, "ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স দেবো না।।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিকল্পনার পূর্বেই বাংলার মেদিনীপুর জেলা বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ধারণা দেশবাসীকে উপহার দেয়। এই আন্দোলনের ফলে ইউনিয়ন বোর্ড গঠন প্রত্যাহার করা হয়।

অসহযোগের কর্মসূচি হিসেবে 'বেজওয়াদা কর্মসূচি' পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও শিক্ষার্থীরা স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত বর্জন শুরু করলেন। এক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা নেন উকিল বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। এছাড়া সাতকড়ি পতি রায়, বিপিনবিহারী অধিকারী, সুরেন্দ্রনাথ দাস, উদয় নারায়ণ মন্ডল প্রমুখ বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিবর্গ। এছাড়া দলে দলে ছাত্ররা সরকারি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করলে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

বাংলার বিভিন্ন জেলার মতো মেদিনীপুরের কাঁথি, তমলুক মহকুমাতে কলাগেছিয়া জাতীয় বিদ্যালয়, কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়, কাঁকুড়দা জাতীয় বিদ্যালয় প্রভৃতি গড়ে তোলা হয়। এই জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল সক্রিয় অংশ নেন। এরপর যুবরাজ পঞ্চম জর্জের ভারত আগমনকে কেন্দ্র করে সারা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এর প্রতিবাদ স্বরূপ আইন অমান্যের ডাক দিলেন। এই ডাকে সারা দিয়ে মেদিনীপুরের প্রতিটি মহকুমা থেকে আইন

অমান্য শুরু হলো। প্রচুর মানুষেরা কারারুদ্ধ হলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকেও গ্রেফতার করা হয়। পরে মুক্তি পান।

১৯২৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি ভারতে 'সাইমন কমিশন' এলে এর বিরুদ্ধে সারা ভারত জুড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। মেদিনীপুরে বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার গ্রুপের সদস্যরা এর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ জানান। ভারতের ইতিহাসে একের পর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রবাহ চলতে থাকে। ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর লাহোর কংগ্রেসের পূর্ণ স্বরাজের বিষয়টি গ্রহণ করা হয়। এরপর তিনটি রাউন্ড টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এর পাশাপাশি গান্ধীজি ১৯৩০ এর ১২ই মার্চ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন। লবণ সত্যাগ্রহ এর অন্যতম অঙ্গ ছিল। লবণকে বেছে নেওয়ার মূল কারণ ছিল, লবণ হলো মানুষের অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মধ্যে একটি অন্যতম দ্রব্য। লবণ সত্যাগ্রহ পালনের জন্য মেদিনীপুর জেলার কংগ্রেসের কমিটির সভাপতি মহেন্দ্র মাইতির নেতৃত্বে তমলুকে 'অল বেঙ্গল কাউন্সিল ফর সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স' নামক একটি আইন অমান্য সমিতি গঠন করা হয়। সমিতি সম্পাদক সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী এবং বাকি সদস্যগণ জীবেশচন্দ্র দেব, অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, কার্তিক চন্দ্র ভৌমিক, গৌর হরি ভট্টাচার্য, চণ্ডীচরণ দত্ত ১৯৩১ এর ৩০শে মার্চ থেকে তমলুক মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মিটিং মিছিল করে স্বেচ্ছাসেবক ও অর্থ সংগ্রহের কাজ করেন। তমলুক থেকে ১২ মাইল দূরের নরঘাটের নদী তীরে আইন অমান্য করার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা হয়। ৬ এপ্রিল প্রায় সাত হাজার মানুষ হংসধ্বজ মাইতির নেতৃত্বে নরঘাটের উদ্দেশ্য যাত্রা করেন। এই মিছিলে প্রায় ২০০জন মহিলাও ছিলেন। এরপর তারা লবণ তৈরির যন্ত্রপাতি ভেঙে দিলে পুলিশ অকথ্য অত্যাচার চালায়। ১৫ই এপ্রিল অজয় কুমারকে গ্রেপ্তার করে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে ১৬ই এপ্রিল তমলুকে পূর্ণ হরতাল পালিত হল। এইভাবে তমলুক থেকে কাঁথিতে আইন অমান্য আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। কাঁথিতে ৬ থেকে ১০ই এপ্রিল পিছাবনী কেন্দ্রে লবণ আইন অমান্য করার কাজ চলে। এর ফলে ১১ই এপ্রিল সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর মাঝি, বসন্তকুমার দাস গ্রেপ্তার হন।

চেটুয়া হাটের ঘটনা মেদিনীপুর তথা বাংলার ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায় হিসেবে পরিচিত। ১৯৩০ সালের ৫ই জুন চেটুয়া হাটে দারোগার খুনিদের খুঁজে পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত জেলাশাসক করিম সাহেব বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে প্রায় ছয় হাজারের বেশি মানুষদের ঘিরে ফেলে এবং করিম সাহেব নিজে গুলি করে ৮ জনকে হত্যা ও ১২ জনকে আহত করে। এর প্রতিবাদে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নামেন। এই বিক্ষোভকে সামাল দিতে তৎকালীন জেলা শাসক পেডি সাহেব মানুষদের ওপর গুলি চালাতে নির্দেশ দেন। তিনি খবর পান বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এই আন্দোলনকে সহযোগিতা করছেন। ফলত, পেডি সাহেব ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। এই অত্যাচারী পেডি সাহেবকে এক বছর অর্থাৎ ১৯৩১ এর ৭ই এপ্রিল বিমল দাশগুপ্ত এবং জ্যোতি জীবন ঘোষ দিবালোকে হত্যা করলেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে, মেদিনীপুরের আন্দোলন গান্ধীবাদী হলেও এই হত্যার মধ্যে দিয়ে চেটুয়া ঘটনা নিজের স্বতন্ত্রতার পরিচয় দেয়। এক্ষেত্রে অহিংস প্রতিবাদের সাথে হিংসাত্মক প্রতিবাদ এক হয়ে যায়।

ইতিপূর্বে মেদিনীপুর জেলায় রাণী কৃষ্ণ প্রিয়া যে বীজ বপন করে গেছিলেন তাঁর পথ ধরে বহু বীরাঙ্গনা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে ভারতছাড়ো পর্যন্ত বহু নারী সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, মহিষাদলের নীলমনি হাজরার স্ত্রী লক্ষ্মীমণি হাজরা, তমলুকের অনুকূল ভট্টাচার্যের স্ত্রী তরুলতা ভট্টাচার্য, মেদিনীপুর শহরের নর্মদাচরণ চক্রবর্তীর কন্যা তরুলতা দেবী, সুর বালা বসু, সুহাসিনী দেবী, ইন্দুমতী ভট্টাচার্য, লক্ষ্মীমণী মুখোপাধ্যায়, নিত্যাবালা গোল, পুষ্পরাণী ব্যানার্জী, উমা সেন, ইন্দু প্রভা চক্রবর্তী, চারুশীলা জানা, অহল্যা মাইতি, তরঙ্গিনী দাস, রাজবালা দেবী, তিলোত্তমা দেবী, সুখদাময়ী রায়চৌধুরী এছাড়া ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনে অন্যতম মহীয়সী বিধবা মাতঙ্গিনী হাজরা প্রমুখ।

মেদিনীপুরে ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন সতীশ সামন্ত, সুশীল ধারা, কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। তাঁদের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সরকারের শাসনকে প্রাথমিকভাবে ধ্বংস করে স্বাধীন সরকার গঠিত হয়। যা "তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার" নামে পরিচিত হয়। এই ঘটনা ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস কোনো এক রৈখিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অগ্রসর হয়নি। এর মধ্যে বহুমাত্রিকতা রয়েছে। ভারতকে স্বাধীন করতে কোন একটি মাত্র আদর্শ অর্থাৎ গান্ধীবাদী অথবা বৈপ্লবিক হিংসার মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে মেদিনীপুরবাসী এগিয়ে নিয়ে যাননি। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের পতন। তাই প্রয়োজনবোধে অহিংস এবং হিংসা উভয় আদর্শকে পাথেয় করে এগিয়ে যান। এর মধ্যে দিয়ে মেদিনীপুরবাসী বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের কাছে কোনো আদর্শই অচ্ছুত নয়। তাই আসুন, আমরা প্রত্যেকে বাংলা তথা মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরগাঁথা সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।

তথ্যসূত্র :

১) জিলা মেদিনীপুর: স্বাধীনতা আন্দোলন- দিপশ্রী প্রকাশন।
২) Freedom movement in Contai and the 'Nihar' (1901-1935) (Thesis Paper) - Sankar Kumar Das
৩) স্বাধীনতা সংগ্রামের মেদিনীপুর (১ম খন্ড)- বসন্তকুমার দাস
৪) Freedom struggle in India: Midnapore, 1905-1934 (Research Journal)- Sanjib Bera
৫) অগ্নিযুগের অস্ত্রগুরু হেমচন্দ্র- বিনয় জীবন ঘোষ

ইতিহাস যাকে মনে রাখেনি, কালিদাস নাহারায় (১৯১৫-১৯৫৯)

অমল নাহারায়

জন্ম ১৯১৫ সালে বগুড়া শহরে। পিতা হরেন্দ্রলাল নাহারায় ছিলেন ব্রিটিশ রাজশক্তির এক উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার। বগুড়া শহরের টাউন দারোগা। মাত্র ১৫ বছর বয়সে ১৯৩০ সালে গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলনে সাড়া দিয়ে কয়েকজন সংগ্রামীর সঙ্গে লবণ তৈরি করতে ঘর ছেড়েছিলেন। ফিরে আসেন সাতদিন বাদে। গান্ধীজির অহিংস পথে দেশ স্বাধীন করার আদর্শ তাঁর মনঃপূত হয়নি। এরপর কালিদাস যুক্ত হয়ে পড়েন ইংরেজদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সশস্ত্র সংগ্রামে। সদস্য হন অনুশীলন সমিতিতে, পরে বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সদের দলে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ১৯২৮ সালের কলকাতা অধিবেশনের সময় সুভাষচন্দ্র বসু স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে একটি দল গঠন করেন। অধিবেশন শেষ হওয়ার পর দলটি একটি সক্রিয় বিপ্লবী সমিতিতে পরিণত হয়। স্বেচ্ছাসেবকরা ১৯৩০ দশকের প্রথম দিকে বাংলার বিভিন্ন কারাগারে পুলিশি দমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য অপারেশন ফ্রিডম চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে আগস্ট মাসে বিপ্লবী দলটি লোম্যানকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। লোম্যান মারা যাবার মাস তিনেক আগেই কালিদাস এবং তাঁর কয়েকজন সঙ্গী পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ১৯ শে মে ১৯৩০ সালে, এক পরিত্যক্ত মন্দিরে বোমা বানাতে গিয়ে। জেল হয় দীর্ঘ সাত বছরের। প্রথমে রাজশাহী, তারপর দ্বীপান্তর, সন্দীপের জেলে। সেখান থেকে উত্তরবঙ্গে বক্সার, কলকাতার প্রেসিডেন্সি এবং আলিপুর জেলে। শেষের দেড় বছর কাটাতে হয়েছে বাড়িতে অন্তরীণ অবস্থায়।

এক পুলিশ অফিসারের পুত্র সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামী। জানতে পেরে হরেন্দ্রলালকে চাকরি থেকে বহিস্কার করা হয় এবং কেড়ে নেওয়া হয় তাঁর বন্দুক। এইসব আঘাত তিনি সহ্য করতে পারেননি। কয়েকবছরের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা যান।

২৬ শে অক্টোবর ১৯৩৭ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়েও দেশকে স্বাধীন করার আদর্শ থেকে কালিদাস বিচ্যুত হননি। ১৯৪১ সালে ঝাঁপিয়ে পড়েন ভারত ছাড়ো আন্দোলনে। আবার গ্রেফতার। এবার সাড়ে তিন বছরের জন্য। কিন্তু মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই দেশ স্বাধীন হওয়ার ঢাকে কাঠি পড়ে। ছাড়া পান কালিদাস। এরপর বিধবা মায়ের অনুরোধে বিয়ে করেন ঝাড়গ্রামের ইরারাণী গুহকে। জন্ম দেন তিন সন্তান। বিয়ের পরেও কালিদাস ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে গিয়েছেন। দীর্ঘ পুলিশি অত্যাচারে ততদিনে ভেঙে পড়েছে স্বাস্থ্য। ছাড়া পাওয়ার পর আর বেশিদিন বাঁচেননি। মারা যান ১৯৫৯ সালের জুন মাসে। বিধবা ইরারাণী দুই নাবালক সন্তানকে নিয়ে চলে আসেন ঝাড়গ্রামের কদমকাননে। এখানে স্বামীর কেনা জমিতে বাড়ি তৈরি করে মানুষ করেন সন্তানদের। ১৯৭৫ সাল থেকে ভারত সরকার এই মহান বিপ্লবীর ত্যাগ এবং সংগ্রামের স্বীকৃতি দিয়ে পেনশন দেওয়া শুরু করে। সেই পেনশন আজও ইরারাণী পাচ্ছেন।

কালিদাসের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ইতিহাস প্রায় ৮০-৯০ বছর আগের। তাই লিখিত প্রমাণ খুব বেশি নেই। যতটুকু পাওয়া যায় পুলিশি সরকারি নথিপত্র থেকে। দেশভাগের পর বগুড়া হয় পূর্ব পাকিস্তানের অংশ। মৃত্যুর পর তাঁর পরিবার চলে আসে ভারতে। পথে হারিয়ে গেছে অনেক তথ্য এবং কাগজপত্র। সঙ্গী সাথী বন্ধুবান্ধবরা সবাই রয়ে যায় বাংলাদেশে। তাদের সঙ্গে নেই কোনো যোগাযোগ। শুধু কিছু ঘটনা জানা যায় তাঁর ভগ্নী চিন্ময়ী বসু, স্ত্রী ইরারাণী এবং নিকট আত্মীয় কমলেশ নাহারায়ের কাছ থেকে। সেইসব ঘটনার কয়েকটা তুলে ধরলাম।

বগুড়ার যে পরিত্যক্ত মন্দিরে বোমা বানাতে গিয়ে কালিদাসরা ধরা পড়ে, সেই পুলিশ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন তাঁর পিতা হরেন্দ্রলাল নাহারায়। যদিও তিনি জানতেন না সেই দলের মধ্যে তাঁর পুত্র কালিদাসও রয়েছে।

সন্দীপ জেলের অন্তর্গত বঙ্গোপসাগরের এক দ্বীপে তাকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। একটা ছোট্ট ঘরে একজন চাকর তাঁর সঙ্গে থাকত। সপ্তাহে একদিন মূল ভূখন্ড থেকে বোটে করে আসত সাতদিনের রসদ। জায়গাটা ছিল এককথায় ভয়ঙ্কর। সকাল হলেই কালিদাস দেখতে পেত মশারির দড়িতে পেঁচিয়ে আছে নানা ধরনের সাপ। চাকর এসে সেই সাপ তাড়িয়ে, বা মেরে ফেলে উদ্ধার করত তাকে। রাত হলেই বাইরে বেরোনো, এমনকি খাট থেকে নামারও উপায় নেই। এইসব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও তিনি পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছিলেন। জেলে থেকেই পরীক্ষা দিয়ে লাভ করেন স্নাতক ডিগ্রি।

পিতার মৃত্যুর পর বিধবা মা হেমলতা নাহারায়ের কাতর অনুরোধে কালিদাসকে আর বেশিদিন সেই দ্বীপে থাকতে হয়নি। কর্তৃপক্ষ তাকে স্থানান্তরিত করে উত্তরবঙ্গের বক্সার জেলে। স্বাধীনতার পর বিয়ে করে সংসার পুত্র নিয়ে দিব্যি কাটছিল। কিন্তু রক্তে যার বিপ্লবের নেশা, সাংসারিক শান্ত নিরাপদ জীবন তার জন্য নয়। ইতিমধ্যে ১৯৫২ সাল থেকে ভাষা আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছে পূর্ব পাকিস্তান। কালিদাস ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই আন্দোলনে। গ্রেফতার হলেন। রাজশাহী জেল তখন পাক সরকারের অধীনে। বন্দীদের উপর চলছে অকথ্য অত্যাচার। এমনকি শোনা যায়, আন্দোলনকারীদের খাবারে বিষও মিশিয়ে দেওয়া হত। সম্ভবত সেই বিষ খাবার খেয়েই কালিদাস অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাধ্য হয়ে পাক সরকার মেয়াদ ফুরানোর ছয় মাস আগেই মুক্তি দেয় তাকে।

তথ্যসূত্র :

1. The Bengal Revolutionaries Register (1930-1938) under Bogra district.
2. D.I.G. & I.B. Office, West Bengal
3. Freedom Fighter Association
4. Government of India, Home Affair, New Delhi.
5. Wikipedia

জঙ্গলমহলের এক বিপ্লবী ডাক্তার

তমাল চক্রবর্ত্তী

১৯২৮ সাল, সময়টা উত্তাল, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মেতে উঠেছে গোটা ভারতবর্ষ। বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ বুকে নিয়ে পথে নেমেছে যুব সমাজ, অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে মেদিনীপুরের যুবকেরা। সেই সময়ে তৎকালীন মেদিনীপুর জেলার ঝাড়খন্ড সীমান্তবর্তী চিচড়া গ্রামের ছেলে শশাঙ্ক শেখর দাস ছাত্র হিসেবে মেদিনীপুর শহরের কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশুনা করছেন। স্বপ্ন তার ডাক্তার হওয়ার, মনে বইছে বিপ্লবের ফল্গুধারা। গান্ধীজীর স্বদেশী ভাবনাকে সামনে রেখে নিজের হাতেই তৈরি করলেন খাদি কাপড়ের রুমাল; সেই রুমাল প্রদর্শনের দায়ে তাঁকে স্কুল থেকে বরখাস্ত করা হলো। তার গণিতের শিক্ষকের সাহায্যে তিনি পরবর্তীতে মেদিনীপুরের হিন্দু স্কুলে ভর্তি হলেন। সেখানে তার বিপ্লবী চেতনা আরো প্রকাশিত হলো। কারণ এই হিন্দু স্কুলের ১৯৩১-৩২ সালের ছাত্রছাত্রীদের ব্রিটিশ চাকরিতে জয়েন করা নিষিদ্ধ ছিল। ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বোসের আগ্রহে তৈরি হয় "বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স"। বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স ব্রিটিশ পুলিশের নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৯৩০ সালে 'অপারেশন ফ্রিডম' নামে প্রতিবাদ শুরু করে। বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার এর অন্যতম সদস্য দীনেশ গুপ্ত মেদিনীপুরে কিছু যুবককে স্বদেশী আন্দোলনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন ও ট্রেনিং দেন এবং ধীরে ধীরে মেদিনীপুরে বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার এর একটি ইউনিট তৈরি হয়। এই ইউনিট প্রতিবছর শক্তি আরাধনা করতো; যেখানে 'ত্যাং হি দুর্গা দশপ্রহরনদায়নি' অর্থাৎ দেশকে মা রূপে পূজা করা। বর্তমানেও কর্নেলগোলা এলাকায় এই দুর্গাপূজাটি হয়ে আসছে। ডিসেম্বর ১৯২৯ সালে মেদিনীপুর শহরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আসেন; তিনি বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স-এর যুবকদের অনুপ্রেরণা দেন ও মেদিনীপুরের যুবকদের এর সাথে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। এই ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু যুবক মেদিনীপুর বেঙ্গলের সাথে যুক্ত হন তার মধ্যে ডঃ শশাঙ্ক দাশও ছিলেন। উনি কিছু সময়ের মধ্যেই এই বিপ্লবী সংগঠনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আসেন। সেই সময় মেদিনীপুরে পরপর তিনজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে গুলি করে হত্যা করে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সদস্যরা। ১৯৩২ সালের ৩০ এপ্রিল তৎকালীন ব্রিটিশ জেলাশাসক ডগলাসকে গুলি করে হত্যা করেন বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের সদস্যরা। বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার বহু সদস্য গ্রেপ্তার হন; এর মধ্যে মূল অভিযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার হন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। গ্রেফতার হওয়া সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ডঃ শশাঙ্ক শেখর দাস। হিজলি ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দিদের প্রতি ব্রিটিশ পুলিশের অমানবিক অত্যাচারের প্রতিবাদে ডগলাসকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স। অন্যান্যদের মতন শশাঙ্ক শেখর দাসকে বন্দি থাকা অবস্থায় ব্রিটিশ পুলিশের নির্যাতনের শিকার হতে হয়। প্রমাণের অভাবে পরবর্তীতে মুক্তি পান। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের এলএমএফ-এর ছাত্র শশাঙ্কশেখর চিকিৎসার পড়াশোনা শেষ করে চিচড়া গ্রামে এসে চিকিৎসা শুরু করেন। এই বিপ্লবী ডাক্তার স্বাধীনতার পরেও তার গ্রামের

উন্নতির জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা করে গেছেন। গ্রামে স্কুলের উন্নতি, হসপিটাল, লাইব্রেরী এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে সম্প্রীতির ভাব থাকে তা চেষ্টা করে গেছে।

তিনি আজীবন স্বদেশী বস্তু ব্যবহারের সংকল্প পালন করেছেন। এই গ্রামের স্কুলটিকে ম্যাট্রিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। নিজের খরচে দশ বছর স্কুলের ব্যায়ভার বহন করেন। পরে স্কুলটি সরকারি অনুমোদন পেলে তাঁকে আজীবন সম্পাদকের পদ দেওয়া হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখতে গ্রাম সুরক্ষা বাহিনী গঠন করেছিলেন তিনি। এই জন্য তৎকালীন প্রশাসন তাঁকে সম্মানিত করেছিল। ১৯৮২ সালে ৮ই ফেব্রুয়ারি তিনি প্রয়াত হন। ইংরেজ জেলাশাসক হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী শশাঙ্কশেখর দাসের এই কর্মসাধনা কে স্মরণ করতে, গ্রামবাসী ও পরিবারের সহযোগিতায় চিচড়া গ্রামে তাঁর ও তাঁর স্ত্রী শতদলবালা দাসের প্রতিকৃতির ফলক উন্মোচিত হয় স্বাধীনতার ৭৫ বছরে। তাঁর কর্ম সাধনায় সহযোগী হয়ে শতদলবালা দাস তাঁর স্বর্ণালংকার বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার কে দান করেছিলেন। এরকম অজস্র স্বাধীনতা সংগ্রামী ইতিহাস আমাদের অজানা রয়ে গেছে , 'প্রচেষ্টা'র প্রচেষ্টাতে ঝাড়গ্রাম জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাস উন্মোচিত হোক ধীরে ধীরে।

তথ্যসূত্র :

১. মেদিনীপুরের ইতিহাস পুস্তক- The History of Medinipur Part-2 (Fight for Freedom)

২. আনন্দবাজার পত্রিকা

জঙ্গলমহল ও গণবিক্ষোভ : সার্ধশতবর্ষের ইতিহাস

অমর সাহা

পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম সিংভূম জেলার লোক সংস্কৃতি ও ইতিহাস রচনার প্রতি মানুষের আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে। পলাশির যুদ্ধ থেকে ওয়ারেন্ট হেস্টিংস পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (অষ্টম খণ্ড, ৫৬১ পৃষ্ঠা) গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। মীরকাশিমের হাতে রাজস্ব ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যায়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের পর দক্ষিণ পশ্চিম প্রত্যন্ত জঙ্গলমহল ও বাংলার দুর্দিন নেমে আসে। মানবিকতা ও নৈতিকতা বিসর্জন দেয় ঔপনিবেশিক বাণিজ্যনীতি। ১১৭৬ বঙ্গাব্দ বা ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে বাংলা ও বিহারের

প্রায় এক কোটি মানুষ মারা যায়। মহামারীর আকার ধারন করে গ্রামবাংলা। এ সম্বন্ধে দেখি, "সে দৃশ্য এখনও মোর স্মৃতিপটে / যা করেছিলাম অবলোকন, / সংকুচিত অঙ্গ, কোটরগত চক্ষু আর নিষ্প্রাণ ক্রন্দন। / এখনও শুনি মাতার আর্তস্বর, শিশুর কাতর শব্দ / হতাশার সুর আর পীড়িতের ধ্বনি মর্মন্তুদ; / শায়িত মৃত আর মৃত্যুপথযাত্রী, / চরম বিশৃঙ্খলা অপেক্ষায় শেষ আর্তি; / উন্মুক্ত বিক্ষুপ্ত শব। / শোনো শৃগালের চিৎকার, শকুনির কলরব / মধ্যাহ্নের তেজে দীপ্ত প্রহরে ভুলেছে কুকুরের দল চিৎকারে / তারা অনাহত, নির্বিরোধ শিকারে। / বিভীষিকায় ভয়ানক দৃশ্য বর্ণনায় অপারগ লেখনী, / লুপ্ত হয় না বর্ষের গতিভারে স্মৃতির সে ছবিখানি।" (নিখিলসুর— ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ, পৃষ্ঠা- ৪২)। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসেও এই দৃশ্য আমরা দেখি। ১৭৬১-১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জঙ্গলমহলে বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর, আসানসোল ও বড়জোড়ার জঙ্গলে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ চলে। কিন্তু ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংসের ভারত ত্যাগের পর লর্ড কর্নওয়ালিস ভূমিব্যবস্থার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার আগে দশশালা বন্দোবস্তর জন্য জমিদার ও জমির মৌল উৎপাদক শ্রেণিকে সর্বস্বান্ত করে দেয়। শহরের বাবু মহাজন শ্রেণী রাতারাতি জমির মালিক হয়ে যায়। প্রকৃত চাষীদের জমি থেকে উৎখাত করা হয়। জমিদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় চুয়াড় নায়ক ও পাইকশ্রেণির মানুষ। এরফলে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় ইংরেজরা। কোম্পানির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে মেদিনীপুরে বেশ কয়েক বছর ধরে নানারকম অশান্তি ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। চোর, ডাকাত, রাহাজানির ভয় ছিল ব্যাপক। খয়রা, মাঝি প্রভৃতি জঙ্গলমহলের কয়েকটি জাতি মেদিনীপুরে নিরীহ প্রজাদের নানাভাবে অত্যাচার করে। তাদের প্রধান অস্ত্র ছিল তির, ধনুক ও লাঠি। এদের সঙ্গে চুয়াড়দের বিদ্রোহ ও অশান্তি দূর করতে ইংরেজ শাসকদের চল্লিশ বছর সময় লেগেছিল। এইসব জাতি কৃষিকাজ না করে পশুশিকার, জঙ্গলে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করে দস্যুবৃত্তি করে জীবিকার্জন করতো। জমিদাররাও দুষ্ট প্রকৃতির ছিলো। লোকের ধনরত্ন লুঠ করতে পাইক সেনাদের কাজে লাগাতো তারা। শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৭৬০-১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার এখানকার অশান্তি বিদ্রোহ দূর করার প্রয়োজনবোধ করেননি। যার ফলে ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বহুদূরগামী জঙ্গলমহলে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। মেদিনীপুরের সে সময়ের রেসিডেন্ট গ্রেহাম সাহেবের আদেশে লেফটেন্যান্ট ফার্গুসন এই বিদ্রোহ দমনের জন্য একদল সৈন্য নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করেন। বর্ধিত রাজস্ব নিয়ে বশ্যতা স্বীকার করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঝাড়গ্রাম, রামগড়, লালগড়, জামবনী, শিলদা প্রভৃতি মহলের জমিদাররা। বাঁকুড়া জেলার জমিদার আর সিংভূম, মানভূম জেলার জমিদাররাও পরাস্ত হন। চুয়াড়দের বিষাক্ত তীরে কোম্পানির সৈন্যক্ষয় বহু হয়েছিলো। ইংরেজরা কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও অবশেষে অরণ্য দুর্গগুলিকে দখল করে।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে বাংলার নবাবকে পরাস্ত করেন। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৭ শে সেপ্টেম্বর মীরকাশিম মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টোগ্রামের জমিদারি খাজনা আদায়ের অধিকার ইংরেজ কোম্পানিকে দেন। জমির মালিকানা,

খাজনা আদায়, জমিদার-সরকার কৃষি উৎপাদক শ্রেণির মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বেশ সমস্যায় পড়ে। ১৭৬০ এর জমিদারি লাভ করে জমির মালিকানা স্থির করার চেয়ে খাজনা আদায় বৃদ্ধি করাকেই অধিকতর শ্রেয় মনে করে জনস্টোনকে প্রথম রেসিডেন্ট নিযুক্ত করে মেদিনীপুরে প্রেরণ করলেন। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভ করে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জঙ্গলমহলের যে সব জমিদার খাজনা দিতে রাজি হননি তাদের দমনে বদ্ধপরিকর হয়ে এনসাইন ফার্গুসনকে কার্তিকরাম ও চন্দন ঘোষ নামে দুজন গোমস্তা ও একদল সৈন্যসহ পাঠালো। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে কল্যাণপুর, ফুলকুশমার জমিদাররা বেশি খাজনা দিতে রাজি হলেন। কিন্তু ঝাড়গ্রামের উগালষণ্ড মল্লরা খাজনা দিতে রাজি হলেন না। রাধানগর ও জামবনীর জমিদাররা ইংরেজদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করলে ঝাড়গ্রামের জমিদারও বাধ্য হন আত্মসমর্পন করতে। রামগড় ও লালগড়ের বৈষ্ণব জমিদাররা ফার্গুসনের কাছে খাজনা কমানোর ব্যর্থ আবেদন জানালেন। এই সময় সবচেয়ে বেশি বাধা ইংরেজরা পেয়েছিল ঘাটশিলা থেকে। ময়ূরভঞ্জের ভঞ্জরাজারা, বগড়ির রাজারা ও দামোদর সিং সাহায্য করে। বড় বড় গাছের গুড়ি ফেলে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফার্গুসন ভেদনীতি অনুসরণ করে ধলরাজাদের শত্রু জামবনীর জমিদার মোগল রায়ের নেতৃত্বে সৈন্য পাঠান। ধলরাজ পরাজিত হয়ে সামান্য মাসোহারা নিয়ে মেদিনীপুরে নির্বাসিত হন। ইংরেজ সামরিক বাহিনী ও মহাজনদের অত্যাচারে ধলভূমের চুয়াড়রা বিদ্রোহের আগুন জ্বালে।

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে রেগুলেটিং আইন পাস হয়। সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয় নতুন সৃষ্ট কুক্ষিগত স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য। পাঁচ বছরের জন্য শহরের অর্থবান ব্যক্তিদের জমির খাজনা আদায়ের ভার দেওয়া হয়। প্রতি জেলাতে কালেকটর নিযুক্ত হয় চাষিদের কাছ থেকে জমির খাজনা অদায়ের জন্য। আমিনদেরও নিয়োগ করা হয়। ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে বগড়ি পরগনার রাজা যদু সিং প্রতিবেশি রাইপুর, সিমলাপাল প্রভৃতি জমিদারদের উপর হামলা করতে লাগলেন। এদিকে ময়ূরভঞ্জের রাজা দামোদর ভঞ্জ গোপনে যদু সিং এবং জগন্নাথ ধলকে সাহায্য করতে লাগলেন। এই অবস্থায় জঙ্গলমহলের চিত্র হেস্টিংসকে স্বাভাবিকভাবেই অস্থির করে তুলেছিল। সুবলা সিং, কুলিয়া পাল, জাঘিন্দর প্রমুখ পাইক সর্দাররা জঙ্গলমহলের বিভিন্ন স্থানে অশান্তির জল তুলতো। শিলদার জমিদার মানগোবিন্দের মধ্যস্থতায় জগন্নাথ পাত্র ও সুবলা সিংহকে বলা হয় কোম্পানির বশ্যতা স্বীকার করে নিতে। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে জঙ্গলমহলের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। ঘাটশিলার নবনির্বাচিত রাজা বৈকুন্ঠ ধল এক পয়সাও খাজনা পেতেন না। এমনকি শিলদার জমিদার মানগোবিন্দ পর্যন্ত বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। কয়েকজন সর্দার মোহন সিং, লখিন দিগর বন্দি হয়ে জানালো তারা খাজনা না দিয়ে রাজাকে তাদের সেবা দিয়েছে। ১৭৭৪-১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জঙ্গলমহলের সর্দার জমিদাররা খাজনা বন্ধ করে দেয়। ফোর্বেস, হকিন্স প্রমুখ কোম্পানির সেনানায়করা হলদিপুকুর থেকে আন্দোলন দমন করতে থাকেন। অবশেষে তারা বুঝতে পারেন— "Unless Jagannath Dhal is subdued the howble company can never receive and anna from this side of the subarnarekha ... unless with five and sword." (মেদিনীপুর : ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, প্রথম খণ্ড,

পৃষ্ঠা-১৯১)।

১৭৭৭-১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইংরেজরা ওড়িশা দখলের পর মেদিনীপুর ও জঙ্গলমহলে সামরিক ঘাঁটি তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে। মেদিনীপুর কালেকটর দেওয়ানি আদালতের জর্জ রাণী শিরোমণির রক্ষা ও শহরের শান্তি রক্ষার ভার কার উপরে বর্তাবে সেই নিয়ে কলহ শুরু হয়। কমিটি অফ রেভিনিউ তখন বিবাদের নিষ্পত্তি করে দেন। কিন্তু ১৭৮১ এর জুন মাসে রামমোহন রায় নামে জনৈক সেজোয়ান খাজনা আদায় করতে এসে প্রজাদের অকথ্য অত্যাচার আর মেয়েদের শ্লীলতাহীন করতে এলে ধলভূমের রুদ্র বাউড়ির নেতৃত্বে ইংরেজ আশ্রিত খাজনা আদায়কারীদের নিধন করা হয়। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে বীরভূমে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। ভূমিহীন কৃষকেরা সরকারি খাজাঞ্চিখানা আক্রমণ করে পুড়িয়ে দেয়। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাইয়ে মন্ডল প্রধানেরা কৃষকদের বিদ্রোহে মদত দেয়। বিষ্ণুপুর ও বীরভূমে আইনের শাসন বিলুপ্ত হয়। ইংরেজ সরকার সমস্ত শ্রেণির মধ্যে বিভেদের রাজনীতি করে জঙ্গলমহলে বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করে। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ম্যাক পার্সনের পরিবর্তে লর্ড কর্নওয়ালিশ গর্ভনর জেনারেল হয়ে এলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগের কয়েক বছর জঙ্গলমহলে রাজনীতির যুগসন্ধিক্ষণ। নবাবী আমলের ব্যবস্থা ও রীতিনীতি সমূহ একদিকে বিদায় নিচ্ছিলো আর অন্যদিকে ইউরোপীয় সংস্কৃতি প্রবেশ করছিলো। ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতা বাড়লো। জমিদাররা হলেন বাৎসরিক খাজনা আদায়কারী। শান্তি ও সমৃদ্ধির ভারপ্রাপ্ত কর্তা নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হল যার ওপর থেকে ইংরেজ সরকার খাজনা আদায় করতে পারবে। জমিদার ও কৃষকশ্রেণির মধ্যবর্তী একদল জমিদারি আমলা, তহশীলদার, কুসিদজীবী মহাজনশ্রেণি প্রত্যক্ষভাবে মূল উৎপাদকের ওপর আর্থিক শোষণ নির্বিবাদে শুরু করে। বহু কৃষক চড়া সুদে টাকা ধার করে কুসীদজীবীদের হাতে জমি তুলে দিয়ে ভাগচাষী পর্যায়ে নেমে গেলো। চাষের জমি খন্ড খন্ড হয়ে যায়, জমিদারের রাজস্ব বেড়ে যায়। গ্রামে একদল খাজনা আদায়ের তহশিলদার আসতে থাকে। চুয়াড় ও পাইক বিদ্রোহের আগে কৃষি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নাগরিক মধ্যশ্রেণির অনুপ্রবেশ ঘটে। চুয়াড় ও পাইকরা ১৭৯৩-এর পর তুষের আগুনের মত ধিক ধিক করে জ্বলতে জ্বলতে ১৭৯৯-তে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ১৭৯৮-এ সরকারি কর্মচারীরা এক পয়সাও খাজনা আদায় করতে পারলো না। ১৫০০ জমিহীন পাইক ১৭৯৮-এ মে মাসে তারা বরাহভূমের সর্দার রাইপুরের ও বগড়ির দায়ভার গ্রহণ করে। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার কঠিন হাতে অশান্তি দূর করতে বদ্ধপরিকর হন। ওই বছরেই ২৯ শে মার্চ এক আদেশ বলে জেলা কালেকটর নিষ্কর জমি পাইক চুয়াড়দের ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। দেওয়ানি জজ জেলা কালেকটরদের বিরুদ্ধে বিযোদগার করেন। রাইপুর, শিলদা ও মানভূম প্রভৃতি স্থানের অত্যাচারী দারোগাদের বরখাস্ত করা হয়। কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণির নিষ্কর জমির নিলাম ডাক শুরু হলে কোনও ডেকে নিতে সাহসী হল

না। দুর্জয় সিং সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত করে। গোবর্ধন দিকপতি নামে একজন বাগদি সর্দার চারশো পাইকের নেতৃত্বে ১৭৯৮-এ জুলাইতে চন্দ্রকোণা আক্রমণ করে। ১৭৯৯-এর ২৯ মার্চ কর্ণগড়ের রাণীকে আবাসগড় দুর্গে বন্দি করে রাখা হয়। নাড়াজোলের রাজা চুনীলাল খাঁন এবং নরনারায়ণ বক্সী দেওয়ানকে মেদিনীপুর জেলে বন্দি করে রাখা হয়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের শুরুতেই কালেকটর আর্নস্ট রেভিনিউ বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কাউপারকে জানালে চুয়াড়রা নতুন নিলামদার জমিদারদের জমি আক্রমণ শুরু করে। খাজনা অনেক ক্ষেত্রে মুকুব করা হয়। বিক্ষুব্ধ পাইকদের নিজস্ব নিষ্কর জমি নামমাত্র ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে জঙ্গলমহল নামে একটি জেলা তৈরি হয়। পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে জঙ্গলমহলে সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরু হয়।

বর্তমান সময়েও আমরা এই জঙ্গলমহল এলাকায় ঝাড়খন্ডী বিদ্রোহ দেখতে পেলাম। তারপর মাওবাদী আন্দোলন ভয়ংকর রূপ নিলো। বর্তমানে মাহাত সম্প্রদায়ের আন্দোলন। তাদের আন্দোলনের সূচনা ঢেউ কতদূর গড়াবে কে তা বলবে? তবে এবারের মাহাত সম্প্রদায়ের দাবিদাওয়া বনাঞ্চল অর্থনীতি ও জমি সংক্রান্ত সরাসরি নয়। এবারের আন্দোলন জাতিগত শংসাপত্র নিয়ে। তবে এর মধ্যেও গভীর তত্ত্ব লুকিয়ে আছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাড়গ্রামের আদিবাসীদের ভূমিকা

নির্জন পল

ঝাড়গ্রামের আদিবাসীদের ইতিহাস আত্মরক্ষার ইতিহাস, প্রতিরোধ প্রতিবাদের ইতিহাস। তাদের এই আত্মরক্ষা কখনো ভৌগোলিক পরিবেশের বিরুদ্ধে, হিংস্র জীবজন্তুর বিরুদ্ধে, কখনো বা সামন্ত জমিদারদের বিরুদ্ধে। বর্তমান দিকুদের বিরুদ্ধে। আদিবাসীদের উপর এই অত্যাচার অবিচারের জন্য দায়ী তাদের সরলতা, শান্ত ও সুন্দর মানসিকতা। বিশিষ্ঠ লোকসংস্কৃতিবিদ ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে তাঁর সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস গ্রন্থে বলেছেন- প্রকৃতির কোলে সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা বড় হয়। শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে তখন তাদের কন্ঠে জাগে বিচিত্র মধুর সংগীত।-

'বিড় বাড়গে নড়ে অড়াঃ কাঃ-আলাং
রাজরাণী নডে তাঁহেনালাং
রেঙ্গেচ জালাং দলাং এড়ের গিডিয়া,
সেমা রেয়াঃ সুকলাং ভুঞ্জীও সুকজংআ।'

অর্থাৎ-

এ বনভূমিতে আমরা ঘরবাড়ী তৈরী করব।
রাজারাণী হয়ে আমরা থাকব।

জগতের দুঃখ-কষ্ট আমরা ভুলে যাব
স্বর্গীয় আনন্দ আমরা উপভোগ করব।

বছরের পর বছর তাদের জীবন কাটে প্রকৃতির অন্তঃপুরে, অফুরন্ত আনন্দের মাঝে। বাইরের জগতের এতটুকু কালিমা তাদের মনকে স্পর্শ করতে পারে না। প্রকৃতির মতই তারা সরল, শান্ত ও সুন্দর। ছল চাতুরি, প্রতারণা তাদের অজানা"।

কিন্তু 'কালিঞ্জা' আখ্যায়িত সভা ভারতবর্ষে অবহেলিত আদিম জাতিরা অর্থাৎ 'আদিবাসীরা', গিরিজনরা ভারতের সংবিধানে সিডিউল্ড ট্রাইবরা যে নিজ নিজ রাজ্যে অর্থনৈতিক সামাজিক জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা কখনো অস্বীকার করা যায় না। এসব উপজাতির মানুষেরা মূলত কৃষক হলেও ভারতের কৃষি ও শিল্পে এদের ভূমিকা ছিল অনন্য। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে আদিবাসীদের সমস্যা সম্পর্কে নীরোদ সি চৌধুরী তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'দি কন্টিনেন্ট অফ সারসি' গ্রন্থে বলেছেন-

মিশরের নীলনদের জলাধার নির্মাণের ফলে ঐতিহ্যমন্ডিত মিশরের মন্দিরগুলি যে ভাবে ডুবে গেছে সেই তেমনি অবস্থা হয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশের আদিবাসীদের- শিল্পায়নের ফলে। আদিবাসীরা জমিদার জোতদার মহাজন ও পুঁজিপতি লুণ্ঠনের- সর্বত্রই শিকার হয়েছে। তবে এরা বিনা প্রতিবাদে এদের শোষণ ও শাসন মেনে নেয়নি। বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে তারা তাদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে। ভারতের বিভিন্ন নরপ্রবাহের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসী মানুষজন, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের ও তাদের সহযোগী জমিদার, মহাজন, সুদখোর, ইজারাদার, পত্তনিদার, ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। যেমন- পাহাড়িয়া বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ (চুয়াড় না বলে লালমাটির বিদ্রোহ বলা যুক্তিসঙ্গত) তিলকা মাঝির নেতৃত্বে বিদ্রোহ, লাল সিং বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ, ভূমিজ বিদ্রোহ ও গঙ্গা নারায়নী হাঙ্গামা, সাঁওতাল বিদ্রোহ, বিরসা মুন্ডার বিদ্রোহ, ওয়ারলি বিদ্রোহ, ভীল বিদ্রোহ, বাস্তারের আদিবাসী বিদ্রোহ, গঞ্জাম জেলার বিদ্রোহ, খাসিয়া বিদ্রোহ, নাগা বিদ্রোহ, আবর বিদ্রোহ প্রভৃতি আরো অসংখ্য বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। সারা ভারতে এই আদিবাসীদের বিদ্রোহ গুলিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে জাতীয়তাবাদী, মার্কসবাদী, কেমব্রিজ গোষ্ঠী, এলিট গোষ্ঠী, নিম্নবর্গীয় গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক বিভিন্ন শ্রেণী সংগ্রামের চরিত্র খোঁজার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এটা অস্বীকার করা যাবে না যে যেসময় ভারতের শিক্ষিত এলিট ধর্মী বাবু ভদ্রলোকেরা দোকানদারদের (ব্রিটিশরাজ) পদসেবায় নিযুক্ত তখন যাদেরকে অসভ্য, চুয়াড় বর্বর, জংলী, বুনো আদিম কুলি বলে অবজ্ঞা করা হত সেই আদিবাসীদের নিয়ে ইংরাজীতে বুলী ঝেড়ে মাতৃদুগ্ধকে ভুলে গিয়ে আদিবাসীদের নিয়ে লেখালেখি করলেও তাদের লেখনীতে আদিবাসীদের জীবন সংগ্রামের সঠিক লেখনী বা মূল্যায়ণ হচ্ছে কিনা তা প্রশ্ন থেকে যায়। হয়তো বা আদিবাসীদের সঠিক জীবন কাহিনীকে উলঙ্গ করে ভাঁওতামির খোলস গুলিকে লিপিবদ্ধ করে বিদেশের খ্যাতি অর্জনের প্রয়াস ভিন্ন অন্য কিছু নয় বৈকি। আরো বড় কথা হল ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে যে কোম্পানির শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ইতিহাস মানেই আদিবাসীদের বীরত্ব ব্যঞ্জক

সংগ্রামের ইতিহাস। প্রসঙ্গত একটি কথা না বললেই নয় এখনো মিটিং মিছিল, ধর্মঘটের সামনের সারিতেই আদিবাসীদের স্থান। আর রাষ্ট্রকে ধারণকারী অর্থলোলুপ এলিটদের স্থান পিছনে। কারন ছদ্মবেশী ভদ্রলোকেরা সবসময়ই 'ভোগের আগে ও রণের শেষে' নীতি অবলম্বন করে আসছেন যাইহোক গোটা ব্রিটিশ শাসন কালব্যাপী রয়েছে আদিবাসীদের বহু সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস।

তাই আলোচ্য পর্বে মেদিনীপুরের সদর মহকুমার অন্তগর্ত ঝাড়গ্রামের আদিবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত রূপ এই প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা, মেদিনীপুরের সদর মহকুমার অন্তর্গত ছিল বর্তমানে ঝাড়গ্রাম। সদর মহকুমার অন্তর্গতি বলার কারণ হল এই সময়ে ঝাড়গ্রাম বলে কোন শহর ছিল না। ২০১৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল ঝাড়গ্রাম নতুন জেলা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কোম্পানী স্বশাসনিক সুবিধার জন্য ১৮০৫ খ্রিঃ বনাঞ্চলগুলিকে নিয়ে জঙ্গলমহল নামে স্বতন্ত্র জেলা গঠন করে। প্রথমের দিকে এই জঙ্গল মহলের সদর দপ্তর ছিল বীরভূম ও বাঁকুড়া। মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও পশ্চিম দিক হল জঙ্গলমহল যার অর্ন্তভূক্ত বিনপুর, গড়বেতা, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম এবং শালবনী থানা, এই পুরো অঞ্চল অরণ্যাকীর্ণ ও অনুর্বর। এখনকার বসবাসকারীরা প্রধানতঃ আদিবাসী মাল সাঁওতাল, ভূমিজ এবং কুর্মী- (মাহাত) এদের সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের এক বড় সংখ্যক সংখ্যা লঘু নিম্নবর্ণের হিন্দু বাসিন্দারাও রয়েছে। যেমন- বাগদি, গোয়ালা, সদগোপ, যদিও জঙ্গলমহল নিয়ম মাফিক মোঘল নিয়ন্ত্রণে এসেছিল কিন্তু এখানে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব চাপানোর চেষ্টা হয়নি। যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য অরণ্যাঞ্চল দুরধিগম্য হওয়াতেই সম্ভব হয়েছিল এই শিথিলতা বা পোষণহীনতা। স্বশাসিত প্রধানেরা পোড়ামাটির প্রাচীর, কাঁটাঝোপ ও ঘন বাঁশবনে বেস্টিত দুর্গে যথোচিত সুরক্ষার আয়োজন করে এবং স্বল্প সংখ্যক আদিবাসী জনসংখ্যার উপর নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়। ১৭৬০ খ্রিঃ কোম্পানী মীরকাশিমের কাছ থেকে জঙ্গল মহল ও ধলভূম অধিগ্রহণ করে। ১৭৬৫-তে শাহ্ আলমের অনুদানে ছোটনাগপুরও কোম্পানীর দখল আসে। ১৭৬৮ সালে মারাঠা রাজ্য থেকে বাংলা ও বিহারে বেআইনি নুন আসা বন্ধ করা ও রাজস্ব আদায়ের শুরু করার জন্য রেসিডেন্ট ফার্গুশান জঙ্গলমহলে সৈন্য প্রেরণ করে কিন্তু কোন জমিদারই তাকে সাহায্য করেনি। ফারগুশনের প্রথম অভিযান ছিল ঝাড়গ্রামের উপর। জঙ্গল মহলের স্বাধীন সামন্ত রাজাদের করদ পরিণত করতে ফারগুশন ফরমান পাঠান। কিন্তু এতে কোন রাজাই সাড়া দেয়নি, ঝাড়গ্রামের জমিদার সাড়া না দিলে চন্দন ঘোষ নামে এক কর্মচারীর পরিকল্পনায় অতর্কিতে ঝাড়গ্রাম দুর্গ আক্রমণ করে ঝাড়গ্রাম রাজাকে পদানত করেন। মিঃ গ্রাহাম ফার্গুশনের সাফল্যে খুশি হন। এ বিষয়ে ফার্গুশনকে লেখা গ্রাহমের পত্রটি হল-

"Me. Graham was pleased at the capture of the Jhargram Fort and observed: I beg leave to congratulate you on your success against the fort of the Jhargram Jamindar."

এই ভাবে পতন ঘটে ঝাড়গ্রাম মহকুমার রামগড় শাঁকা কুলহি (লালগড়), জামবনি, ঝাটিবনির (শিলদা) এবং ক্রমাগত বিভাজন সংযোজনের পরিণতিতে- বর্তমানে ঝাড়গ্রাম মহকুমার থানাগুলি হল ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর, বেলেবেড়া,-

নয়াগ্রাম, সাঁকরাইল, জামবনি, বিনপুর, লালগড় এবং বেলপাহাড়ি। জঙ্গলমহল গঠন হলেও স্থানীয় আদিবাসী মানুষের অর্থনৈতিক বা প্রশাসনিক সমস্যার কোন কার্যকর সমাধান করতে পারেনি।

বর্তমান স্বাধীন ভারতেও জঙ্গল মহলের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেনি। তাইতো আমলাশোলের আদিবাসীরা না খেতে পেয়ে মারা যায়। এখনো শালপাতা, কেন্দুপাতা, বাবুইদড়ি, গাছ পিঁপড়ে বিক্রি করে জীবন ধারন করতে হয়। বিমলা সর্দার ও সুলেখা মাহাতোর মতো নারীরা পেটের জ্বালায় বন্দুক তুলে নেয়।

তবে উনিশ শতকের শেষ দিকে জঙ্গলমহল কয়েক জন বড় জমিদারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। এগুলির ভেতর ছিল অ্যান্ড্রু ইউল এ্যান্ড কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে মেদিনীপুর জমিদার কোম্পানী, যাদের জমিদারি ছড়ানো ছিল গড়বেতা শালবনী ও শিলদা পরগনায়, ঝাড়গ্রাম থানার বড় অংশে ছিল ঝাড়গ্রাম রাজ এবং গোপীবল্লভপুরের বিস্তৃত এলাকার ময়ূরভঞ্জের রাজা এবং মুর্শিদাবাদের নবাবের জমিদারী। এই সময় রাজা জঙ্গলমহলের আদিবাসীদের কম খাজনায় জমি ইজারা দিতেন। কারন এর ফলে আদিবাসী বনজঙ্গল পরিষ্কার করে জমি বাড়াবে। জঙ্গল মহলে তখন 'মন্ডলি ব্যবস্থা' ছিল, রামগড়, জামবনি, নয়াগ্রামের রোহিনীতে এই মন্ডলকে বলা হত 'প্রধান' এই মন্ডলরা জঙ্গলমহল থেকে ১২.৫ শতাংশ খাজনা আদায় করত। এইভাবে দেখা যায় যে ১৮৭২ খ্রীঃ ঝাড়গ্রাম সৃষ্টি হয়নি, তখন ঝাড়গ্রাম ছিল সদর মহকুমার মেদিনীপুরের একটি থানা মাত্র, ১৯২২ খ্রীঃ ১লা ফেব্রুয়ারী ঝাড়গ্রাম মহকুমা সৃষ্টি হয়। ১৯৫১ সালে লোকগণনার সময় ঝাড়গ্রাম শহর হিসাবে চিহ্নিত হয়।

এই ঝাড়গ্রামে ছিল আদিবাসীদের আদিবাসস্থান। এখানে তারা তৈরী করে ছিল ছোট ছোট জমি। এই জমি থেকে তাদের যে ফসল ফলত তা হয়ত সারা বছর পেট চলত না ঠিকই কিন্তু জঙ্গলের ফল, ফুল, গাছের শাক, ব্যাঙের ছাতা, হরতকী, আমলকী, শাল ফুল ও ফল মহুল, ছাগল, ভেড়াসহ গবাদি পশু পালন করে। হরিণ ও বন শুয়োরের মাংস খেয়ে বছরের বাকি সময়টা পেট চলে যেত।

কিন্তু ঝাড়গ্রামে ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসী জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। দিকুরা আদিবাসীদের উপর চড়া হারে সুদ আদায় করে।

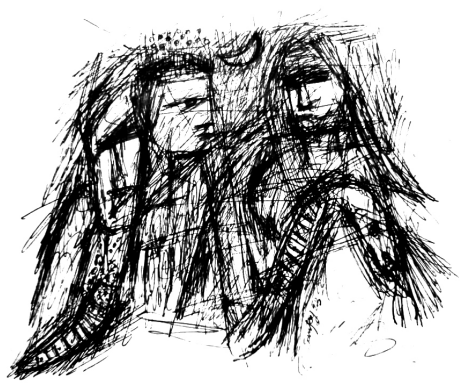

জামবনি, বিনপুর, গোপীবল্লভপুরের আদিবাসীদের কাছ থেকে কম ঋণ দিয়ে চড়া হারে সুদ আদায় করা হত। ১৮৯২ থেকে ১৯৬০ খ্রীঃ এর মধ্যবর্তী চৌদ্দ বছরে দেখা গেছে যে সাঁওতাল, ভূমিজ ও ভূমি কৃষকদের কাছ থেকে ৫৮০.৪ একর জমি ও 'দিকুদের হাতে বদলি হয়েছে। কোম্পানী নতুন নতুন আইন সৃষ্টি করে আদিবাসীদের অরণ্যের উপর

অধিকার কেড়ে নিয়েছে। ১৮৭৮ বন আইন ২৯ নং ধারায় সমস্ত জঙ্গল মহলে গাছ কাটা নিষিদ্ধ হয়েছে। অথচ কোম্পানীর অনুচর ব্যবসায়ীরা গাছ কেটে ট্রাকে ট্রাকে গুদামে পাঠাচ্ছে। জঙ্গলের সমস্ত তৈলবীজ, মহুল, কেঁদুপাতা তোলার অধিকার ও আইন করে কেড়ে নেওয়া হল। এমন কি জঙ্গলের লোহা, কয়লা, সোনা, তামা, সীসা, ইউরেনিয়াম, প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্যের খনি স্থাপনের জন্য আদিবাসীদের হটিয়ে দিতে শুরু করল। ১৮৯৮ খ্রীঃ বেঙ্গল নাগপুরগামী রেল লাইন ও ১৯০৩ খ্রীঃ খড়গপুর আদ্রাকে যুক্ত করে ঝাড়গ্রামের অরণ্য নতুন বানিজ্যিক গুরুত্ব দিয়ে একের পর এক অরণ্য ছেদন করে কাঠ রপ্তানি হতে শুরু করল। ফলে কৃষকদের অরণ্য ব্যবহার ও গোচারণের অধিকার হারালো। আদিবাসীরা খেতে না পেয়ে হা অন্ন রব উঠল। এর ফল স্বরূপ আদিবাসীরা প্রথমে সামন্তরাজাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলল ও পরে কোম্পানীর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করল। শুরু হল অরণ্য অধিকারের লড়াই, স্বাধীনতার লড়াই। যেমন বাগদি, ঘোড়াই, খয়রা, মাঝি ও আদিবাসী কৃষকদের নেতৃত্বে সংঘটিত মেদিনীপুরের কৃষক বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ নায়েক বিদ্রোহ, মলঙ্গী বিদ্রোহ। (১৭৬৬- ১৮০৪ পর্যন্ত বিদ্রোহ) ১৭৯৮-৯৯ খ্রীঃ দ্বিতীয় চুয়াড় বিদ্রোহে গোপীবল্লভপুর, রামগড়, শিলদা ও ঝাড়গ্রামের অচল সিং বিশেষ ভূমিকা গ্রহন করেন। গোলাপী মাহাতোর ঝুমুর গানে বিষণ সিং ও অচল সিং-এর স্মৃতি ফুটে ওঠে যেমন-

"হাঁসা রাজার কাঁসা সিংহ
চড়ল বিষণ সিং (ঝাড়গ্রামের অচল সিং)
এ হো মলভূঁই এ সাজলে লড়াই
মলভূঁই এ মারগেল রাজা হো বিষণ সিং"

গড়ীর নায়েক হাঙ্গামা ও মালঙ্গীদের আন্দোলনে ঝাড়গ্রামের আদিবাসীরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকেও আদিবাসী ও কৃষক অভ্যুত্থানগুলি বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মেদিনীপুরের জাতীয় চেতনায় বিশেষ সহায়তা করেন দুইজন বরেণ্য ব্যক্তি রাজনারায়ণ বসু ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যারা জেলা স্কুল উন্নতি ও বহু প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষাবিস্তার নৈতিক জীবন গঠন, শরীর গঠন ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে ছিলেন। ১৮৭৬ সালের সুরেন্দ্রনাথের ভারত সভার প্রভাবও ঝাড়গ্রামে পড়েছিল। যদিও সেগুলি ছিল 'রায়ত সভা' যার কাজ ছিল- জমির উপর রায়তদের বৈধ স্বত্ত্বাধিকার স্থাপন করা। উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে ঝাড়গ্রামে রাজার অনুদানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সাঁওতাল ছেলে রাজার ছেলে এক সাথে শিক্ষার জন্য মিডিল ক্লাস ইংরাজী স্কুল গড়ে উঠে। ১৯০৫ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গে ও ঝাড়গ্রামের আদিবাসীরা ভূমিকা গ্রহণ করে। এখনো গোপীবল্লভপুর ও নয়াগ্রামের অনেক গ্রামের আদিবাসীরা অরন্ধন ও রাখী উৎসব পালন করে থাকেন।

১৯২১ থেকে ১৯২৩ এর মধ্যে জঙ্গল মহল বাঁকুড়া ও সিংভূমের প্রতিবেশী এলাকায় কৃষকেরা জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে মাথা তুলেছিল। আদিবাসী পরিচালিত এই কৃষক বিদ্রোহকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথমটিকে অসহযোগ

আন্দোলনের পর্ব (১৯২১-১৯২২) এবং কংগ্রেসের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায়। দ্বিতীয়টি রাজনীতির ভাষায়, ১৯২১ সালের আন্দোলনের এবং যুক্তিগত পরিণতি। কংগ্রেস কর্মীরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেও গান্ধীর গ্রেপ্তারের পরবর্তী পর্বে সংঘবদ্ধ কংগ্রেস অংশগ্রহণ ছাড়াই পরিচালিত হয়েছিল। এই আন্দোলনের সমীক্ষা- মেদিনীপুরে প্রথম আদিবাসী বিদ্রোহ এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে মৈত্রী- উভয়ের সম্পর্কের জটিলতা ও নিম্নবর্গের রাজনীতির স্বাতন্ত্র্য উন্মোচন করে।

১৯২১ খ্রীঃ জঙ্গল মহলে কোন কংগ্রেস সংগঠন ছিল না। এই অঞ্চলের আদিবাসী অথবা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের জাতীয় আন্দোলনে শামিল করানোর কোন প্রচেষ্টাই তখনো পর্যন্ত করা হয়নি। ১৯২১ এর প্রথম দিকে চিত্তঞ্জন দাস জেলায় জেলায় প্রচার কর্মের জন্য লোক পাঠানোর নীতির সূত্র ধরে, সাতকড়ি পতি রায় কে মেদিনীপুরে রাজনৈতিক বিক্ষোভ সংঘটিত করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। মেদিনীপুরে অল্পক্ষণ থেকে সাতকড়ি বাবু ঝাড়গ্রামের উপর হয়ে গিধনি যান। সেখানে শৈলজানন্দ সেনের সঙ্গে মিলিত হন এবং মুরারিমোহন রায়কে ও শৈলজানন্দকে দায়িত্ব দেন- আদিবাসীদের অসহযোগ আন্দোলনে শামিল করানোর জন্য। কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল শিলদা পরগনায় মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী। কারণ শিলদাতে কোম্পানী আদিবাসী মজুরদের অরণ্যের কাজের পরিবর্তে যৎসামান্য মজুরি দিত। ১৪ মাইল কাঠ বহনের জন্য ৪ পয়সা এবং ৩৫ মাইলের জন্য পেত ৮ পয়সা। ১৯২১ এর জুলাই মাসে অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপ্তি প্রসারের জন্য শৈলজানন্দ ২০০ জন সাঁওতাল নারী নিয়ে বিক্ষোভ দেখান। জনৈক জমিদারদের ধান কাটার গরুর গাড়ির পথ বন্ধ করে দেন। ধান রপ্তানির বিরুদ্ধে এর প্রতিবাদ করেন। ১৯২১ খ্রীঃ ৭০০ জন সাঁওতালরা মাদক বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। বিশেষত গান্ধী মহারাজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত নৈতিক শক্তি হিসাবে কতদূর গ্রহণীয় ছিলেন তার নির্দেশক। এমন কি বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের উপরও জোর দেওয়া হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় ঝাড়গ্রামের অস্পৃশ্যতার অবসান ঘটেছিল। ঝাড়গ্রামের সাঁওতালেরা গান্ধী টুপি পরে পুলিশের উপর আক্রমন করেছিল। তাদের ধারণা, ছিল যে গান্ধী টুপি পরলে বুলেট লাগে না। আদিবাসীরা জঙ্গলও লুট করেছিল। দহিজুড়ি, কুঠিঘাট, ফেঁকো ও অন্যান্য হাট লুঠ করা হয়েছিল। সাইমন কমিশন এর সময় আদিবাসীরা সংরক্ষণের দাবী জানিয়ে ছিল।

লালগড়ের ধন্য রাজা বিনয় সাহস রায়ের নেতৃত্বে সুভাষ বসু দহিজুড়ি ও ঝাড়গ্রামে এলে ঝাড়গ্রামের আদিবাসীরা ধমসা মাদল শিঙা নিয়ে অসংখ্য সাঁওতাল জনসভায় জমায়েত হয়েছিল।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনে আদিবাসী মহাসভা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। কালিরাম হেমব্রম, ডমন সরেন, সুবোধ সরেন প্রমুখরা এই সভার সাথে যুক্ত ছিলেন। সাঁওতালরা আবগারী জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ফাগু মূর্মুর নেতৃত্বে শিলদা, বিনপুর, পড়িহাটি, জমবনী, দহিজুড়ীর আবগারী দোকানগুলি ভাঙচুর করে জ্বালিয়ে দেয়। বিনপুর, শিলদা, টংরা ও রামগড় হাটগুলিতেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ১৯৪২ এর আন্দোলন সেদিন সাঁওতালদের কাছে ছিল মুক্তির লড়াই।

বাবুলাল সরেনও ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অন্যতম নেতা। ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা বিপ্লবীরা নিশ্চিন্তে কিছুদিন আত্মগোপন করেছিলেন। এছাড়াও ঝাড়গ্রামের শিবপদ রায়, সত্য মন্যু পতি। ধনঞ্জয় কর প্রমুখ ব্যক্তিরাও ৪২ এর আগষ্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এই ভাবে দেখা যায় যে আদিবাসীরা কোনদিনই ইংরাজ রাজকে ভালো চোখে দেখেনি। তিলকা মাঝির সংগ্রাম থেকে শুরু করে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত ভারতের অসংখ্য আদিবাসী বিদ্রোহ হয়েছে। তারা কোনদিন কারো সহযোগিতা পায়নি বরং বিরোধিতা পেয়েছে। এজন্য তাদের আক্ষেপ নেই। উল্টে বরং দেখা যায় জাতীয় সংগ্রামের প্রতিটি ডাকে অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলন আগষ্ট আন্দোলনে প্রভাবিত তারা সক্রিয় ভাবে যোগদান করেছে। তাদের এই সংগ্রাম, প্রতিবাদের প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষার চিত্রগুলি বর্তমান ঝাড়গ্রামে মহকুমার প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক হাত কুঠার, তীরের ফলা, ব্লেড, ছেদনী, ফলা, চাঁচনি প্রভৃতি নিদর্শনগুলি আদিবাসীদের আত্মক্ষার চিত্রকেই তুলে ধরে।

তাই শেষান্তে বিশিষ্ট প্রবন্ধিক সুবোধ ঘোষ মহাশয়ের প্রথম প্রবন্ধ 'ভারতের আদিবাসী'-র উপসংহারে রচিত দৃষ্টিভঙ্গিগুলি খোলাখুলিভাবে বিবৃত করে বলা যায়

"আধুনিক শিক্ষিত ভারতীয় সমাজের চিন্তা ও কর্মক্ষেত্র থেকে আদিবাসীরা দূরে সরে আছে। এটা সম্পূর্ণ সত্য নয়, মোটামুটি সত্য, অসহযোগ অইন অমান্য- এবং আগস্ট সংগ্রামে ও নিখিল ভারতের মুক্তি সাধনার কোন কোন অঞ্চলের আদিবাসীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আত্মোৎসর্গ বিস্মৃত হবার নয়। তাছাড়া ভারতের ব্রিটিশ যুগের ইতিহাস বহু ঘটনার স্বাক্ষর রয়েছে। যাতে প্রমাণিত হয় যে, ভারতের আদিবাসী সমাজ মারাঠা ইত্যাদি ভারতীয় রাষ্ট্রশক্তির মতই দেশ

প্রেমের প্রেরণায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত দিয়ে হাটিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আদিবাসীদের উদ্যোগে পরিচালিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই সংগ্রামের ইতিহাসকে শিক্ষিত ভারতীয়রা যথার্থ সমাদরের সঙ্গে স্মরণ করেন না। সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে আরম্ভ করে অসহযোগ আন্দোলনের আরম্ভকাল পর্যন্ত আধুনিক ভারতবর্ষ ব্রিটিশ রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে একেবারেই কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করেনি। কিন্তু আদিবাসীরা করেছে। আদিবাসীদের এক একটি, বিচ্ছিন্ন অভ্যুত্থান যদিও ব্রিটিশ অস্ত্রশক্তির সাহায্যে সহজেই দমিত হয়েছে কিন্তু তার জন্য আদিবাসীদের ঐতিহাসিক গৌরব ছোট হয়ে যায়নি।"

নতুন মুখ

ঝাড়গ্রাম স্থাপনা

অমৃত ঘোষ

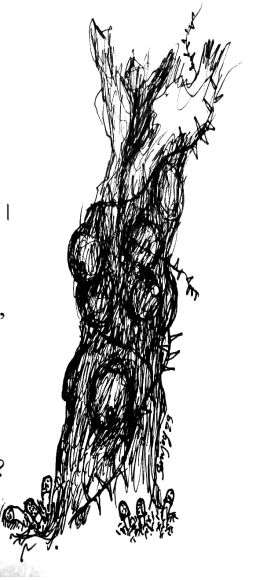

"কংসাবতী-শিলাবতী-ডুলুং-কেলেঘাই
বিধৌত লাল মাটি এবং প্রশস্ত খোয়াই।
লালজল সেথা গাডরাসিনি সুবর্ণরেখা নির্ঝরিণী
লাল মাটি পটে পলাশের হাটে মহুয়া-মাতাল-কিঙ্কিণী।
অশ্বত্থ-বট-সোনাঝুরি, শালপিয়ালীময় আভরণী
চাক্ষুষ করি সাধ হয় ভারি অরণ্য সুন্দরী।"
খানিক থামি শূন্যচিত্তে আকবর কন-"মানসিংহ মিতে,
'জঙ্গলখণ্ড' চাই আমার - পারিবে এনে দিতে?"
কৃপাণ সানি দরবারেতে রাজপুতানায় উচ্চ স্বরে
কহে, প্রভু, "আদেশ তবে করুণ অধমেরে।"
তড়িদ্বেগে প্রত্যুত্তরে শঙ্কিত সভাসদ-
শ্বাপদসংকুল-কান্তার কত? খতিয়ান আছে কি বিশদ?
নৃপতি কহেন, "বাস্তব কথা হোক না যতই রূঢ়।"
রাজোপদেশ কিরীটি পরে, মানসিংহ নিরুত্তর-
খোয়াই জয়ের স্বপ্ন চোখে সঙ্গী সর্বেশ্বর।
'সিংহ-বাহিনী' অগ্রণী হয় রণডঙ্কা বজ্রনিনাদে
প্রতিআক্রমণ কুল নাহি পায়, মালরাজ হটে পশ্চাদে।
নওরতন আবুল ফজল অবরেণ্যে করিয়া বরণ
'আইন-ই-আকরবী' রচেন 'ঝাড়িখণ্ড' করি সম্বোধন।
সর্বেশ্বর সিংহ 'পরে রাজপাট করি সমর্পণ
ফিরিয়া গেলেন মানসিংহ ছাড়িয়া রাজ-সিংহাসন।
সাঁওতাল-কুড়মি-মুন্ডা-শবর ভূমিপুত্র জঙ্গম স্থাবর
এতেক লয়ে 'ঝাড়গ্রাম' স্থাপন করেন সিংহ সর্বেশ্বর।

তুমি আলো নিয়ে এসো

মুকুন্দ কর

এখানে শব্দেরা এলোমেলো
খেলা করে নিবিড় অন্ধকারে,
তুমি আলো নিয়ে এসো
আমি ক্লান্ত প্রাণ হতাশার ভিড়ে।

নিজেকে রোজ ভাঙি-গড়ি
নিদ্রা ছুঁয়ে যায় চোখে,
হাওয়ার নেশায় ছুটে যাই আমি
সবুজের গন্ধ মেখে।

উদ্ধত বায়ু উড়ায় ধুলো
দিগন্তে অশনির চমক;
তারপর ঘন রাত্রি নামে
শব্দেরা যখন যমক।

আমার একলা ঘরে বিষাদ ভরা
আলো নিয়ে এসো তুমি,
শব্দের মালা গাঁথব আমরা
স্পর্শ করে ভূমি।

বিজ্ঞাপন
সমীর শীট

দোতলা বাড়ির দেওয়ালে দেখলাম গাছ লাগানো বিজ্ঞাপন ঝোলানো।
দেখেই বুকের ভেতরটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো,
মনে হল বিজ্ঞাপনটা যেন, বার বার উপহাস করছে আমায় কোন এক অজানা ভাষায়।
তুলে ধরতে চাইছে আমার অপদার্থতা,
চোখের সামনে নেমে এল অন্ধকার
ইচ্ছে হলো মুছে ফেলতে বিজ্ঞাপনটা।

আমায় ভুল বুঝোনা,
আমিও সবুজ চাই, চাই সবুজ জঙ্গল, চাই গাছ লাগাতে।
কিন্তু যে দেওয়ালটাতে আজ গাছ লাগানোর বিজ্ঞাপন ঝোলানো।
ওখানে আগে একটা গাছ ছিল।

কেন
বিশ্বজিৎ দাস

তার সাথে দেখা হয়েছিল....
কোনো এক পড়ন্ত বিকেলে।
তার লাবণ্য আমায় গ্রাস করে নিয়েছিল।
অস্ত যাওয়া রশ্মিরেখা যেন তার দেহে প্রতিফলিত হয়ে আমার দৃষ্টি মোচন করেছিল।
আমি বিহ্বলভাবে চেয়েছিলাম তার দিকে,
আর মনে মনে বলেছিলাম-
স্রস্টা কি দিয়ে বানিয়েছেন তাকে ?
দূর থেকে অজ্ঞান দৃষ্টিতে এখনও তাকে দেখে যায়...।

একটা দীর্ঘ নিস্তব্ধতা
সূর্য অস্ত গেলো, আকাশে লাল আলোর ছটা
আমার চোখের সামনে উদিয়মান তার রমণীয় রূপ,
তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যেন দৃষ্টি ফিরে পেলাম....
নেশা বেষ্টিত তার দুটি চোখ, হারিয়ে গেলাম অজানা এক মহাবিশ্বে।
কোজাগরী আকাশের চাঁদের মতো তার গালগুলো,
যেন মুখের ভেতর সূর্যকে লুকিয়ে রেখেছে....
সময়টা বসন্তের শেষ ছিলো, কিন্তু তার স্বর শুনে মনে হয়েছিল-
বসন্ত আবার ফিরে এসেছে....।

তারপর আবার শান্ত আমি
দেখলাম অন্য একজন এসে তার হাত ধরে তাকে পথে নামালেন,
তার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটি থেকে একটা কালো চশমা তাকে পরালেন;
নির্বাক আমি...হতভম্ব হয়ে বুঝতে পেরে আকাশ পানে চেয়ে বলেছিলাম-
"হে ঈশ্বর, সে যে আমার দৃষ্টি হরন করে নিয়েছিল,
কিন্তু আমি জানতাম না তুমি তারও আগে
ওই মায়াবী চোখ গুলোকে নষ্ট করে দিয়েছিলে?
কেন....কেন...কেন....?"

এই বর্ষায়
অর্পিতা দাস

এই শহরে বর্ষা নেমে এলে,
ড্রেনের অবস্থা এক্কেবারে বেহাল!
ফুটপাতে উপচে পড়ে জল
গরীব দুঃখীদেরও অবস্থা নাজেহাল।

এই শহরে বর্ষা নেমে এলে,
নব চারাগাছে পল্লবের ঘটে সঞ্চার;
মৌমাছি দুইবেলা এসে খোঁজ
নেয়; তাদের সুখ দুঃখের বারংবার।

এই শহরে বর্ষা নেমে এলে,
তুমি আর আমি ভিজবো দুজনায়;
দিনের অন্তিম লগ্নে এসো
মোর দালানকোঠার আঙিনায়।

এই শহরে বর্ষা নেমে এলে,
শ্রাবন্তির রাগে জলরাশির স্ফীতি;
কত বাড়ি গাড়ি ভাসে
অথৈ জলে, আমরা হতবাক মূর্তি।

আত্ম প্রেম
হিমাংশু শেখর মাহাত

আত্ম প্রেমে মগ্ন আমি জেনো
খানিকটা তো বোধাতীতই বটি
ঝুমুর ঝলক যেটি তুমি দেখো
প্রেম বাঁধনে সেটিই হবে খাঁটি

কতকটা যে উদাসীনই ভালো
বাকিটুকু মহানুভবের ঘটে
গোপনতা থাক না মনের কোণে
আমি সেটি বইবো না হয় পিঠে

আমায় তুমি কূপমন্ডুকই ভেবো
নয়তো ভেবো অলসতায় দীন
চাঁদের বুড়ি পারবো না তো ছুঁতে
মান অভিমান হবে নিত্যদিন

বেয়াড়া পান থাকতেও পারে মনে
উদাস হিয়া খেয়ালী কবিমন
চক্ষুশূল হব ই কোন সময়
সইতে তুমি পারবে কি তখন?

এর চেয়ে বড় লক্ষ্মী কে আছে?
নিসর্গ নির্যাস মাহাত

দেওয়ালে ঝুলছে লক্ষ্মী-নারায়ণ
বর গেছে মাঠে
ঘুপচি ঘরের এককোণে চাটাই, মেদু মেদু প্রদীপের শিখা
ছেঁড়া শাড়ি পরে মাটির উনুনে জ্বাল দিচ্ছে ঘেমো ঘরণী
ভাপের তালে দুলে উঠছে মালশা
আঁচল ধরে লুটোপুটি খাচ্ছে বালক
দু'মুঠো ভাত মুখে ঠেসে দেবে মা, সন্ধ্যার মেলাতে দু'টাকা আরও
গ্রামবাংলায় মা ছাড়া ধন-সম্পদের দেবী আছে কে?

প্রাক্তন
অভিজিৎ দত্ত

ভেবেছিলাম কত, রাখবো ধরে।
মোর হৃদয়ের গোপন কুটিরে।।

হাজার বাধা প্রচন্ড আঘাতের তরে,
রয়ে যাবে মোর হাতটি ধরে।

মনে পড়ে আজ তোমার সেই কথা–
আমার হৃদয়ে রয়েছে আজও ব্যাকুলতা।।

ছিন্ন হয়ে গেল হৃদয়ের বাঁধন,
একদিন ছিলে তুমি কত না আপন।
যদি মনে পড়ে শপথ তোমার- তবুও আমি প্রাক্তন।।

হৃদয়ে উঠিল ঝংকার দিয়া তোমায় দেখার পর।
একদিন ছিলে কত না আপন, আজ কতই না পর।।

যেটুকু পেয়েছি তা ছিলো আমার অক্ষয় ধন,
মন ভরে থাকুক এই ক্ষণিকের মিলন।
তবুও আমি তোমার প্রাক্তন।।

গোধূলির সেই নিস্তব্ধ ভরা আকাশ–
তোমার প্রতি ছিল কতই না বিশ্বাস।

আজ মনেতে রয়েছে কতই না বেদন।
কেননা আমি এখন তোমার সেই প্রাক্তন।।

পিঁড়ি এনে বসেনি আগুন নচিকেতা

মঙ্গল হাজরা

পিঁড়ি এনে বসেনি আগুন নচিকেতা
ইন্দ্রিয় তূণে মিথুন মিশে গেছে

ভোগ কুড়িয়ে দেখা কদমমেয়ে
আগামীকালে উপসন্ধ্যায়

এসে, ইন্দ্রিয়হীন বোধ পেতেছে— সিঁড়ি অন্ধকার মাথা
সেখানে, পিঁড়ি এনে বসেনি নচিকেতা
তাই হিংসার নি ঢুকে গেছে শরীর
নগ্ন করে

ক্যানভাস

প্রিয়াঙ্কা দত্ত বনিক

আনমনা তুলির টান
বেরঙিন ক্যানভাসে,
আবছায়া আয়নায়,
কিছু অবয়ব ফিরে আসে,
অজানা রূপকথায়,
ইতিহাস শুধু হাসে,
অভিমান বন্ধ ঘরে,
নয় দ্বন্দ্ব এজলাসে,
সম্পর্কেরা রক্তাক্ত,
বিশ্বাসঘাতকতার নাগপাশে,
লোভাতুর চোখ ছোটে,
মরীচিকার আশে,
বেহুঁস জীবন মত্ত মিথ্যে ভ্রমে,
সময়ের সাথে বাস্তবতার ত্রাসে,
কিছু ফাঁপা ছবি ফুটে ওঠে,
জীবনের ক্যানভাসে।।

দিবা রাত্রি নাচে মুক্তি

দেবব্রত দত্ত

ধরো...
তুমি আমার স্বপ্নবেলার সাথী
সারাটা রাত মাতি
স্বপন চারা করেছি কিছু বপন
রাতজাগা সেই পাখিও কিছু
শুনিয়েছিল গান
চাঁদের আলোও বইয়ে ছিল বাণ
তারপরে যেই ভোরের আলো এলো
শিশির বুঝি অশ্রু ফোঁটা দিল
পশ্চিমেতে তাকিয়ে তখন দেখি...
দূর আকাশে চাঁদটা মরে গেল!

কিংবা ধরো,
আমি তোমার বিকেল বেলার ফুল
ছাপিয়ে প্রেমের কূল
বেসেছি ভালো হৃদয় উজাড় করে
বেলা শেষের শেষ লালিমায়
স্বপ্ন হলো লাল
কাটলো মধুর বেশ কিছুটা কাল
হঠাৎ ঝড়ে ভরলো ধুলার রাশি
ফুলের মালা হলো যতেক বাসি
ভীষণ অন্ধকারে তখন দুজন
অশ্রু ঝরাই শুধুই মুখোমুখি!

দিন বুঝি সব এমনি করেই আসে
একটি ফোঁটায় বিলীন হবে বলে
যতই আকাশ ভরুক তারার ঝাঁকে
মিলিয়ে যাবে সবই সময় হলে!

শহীদ প্রণাম
সাগর মাহাত

আশ্বিনী রাতের ঝরা শালের পাতায়
আজও জ্বলজ্বল করছে বিদ্রোহের ছবি।
ওরা রোদে পুড়ে তৃষ্ণার আঁচে রক্তমাখা পায়ে
হেটেছে স্বাধীনতার পতাকা নিয়ে
পিঠের মত বেঁকে গেছে বিনম্র দিন।

উলগুলান উলগুলান স্বাধীনতার জন্য
তারা রাতভোর পেটে পিঠে সন্তান নিয়ে হেঁটেছে
একটা ঝলমলে সকাল তাদের নাড়ি ছেঁড়া
সন্তানদের উপহার দেবার জন্য।

হায় ঈশ্বর! চোখে জল আসে
জঙ্গলমহলের কত প্রাণ অকালে অনাহারে ঝরেছে,
কত ত্যাগ কত বলিদানের পর
আমরা দেখছি ফুলের সৌন্দর্য, শুনছি পাখির গান।

হে আমাদের পূর্বপুরুষ, হে শহীদ
তোমাদের শতকোটি প্রণাম
তোমাদের বলিদান আমাদের মুখে ভাত তুলে দিয়েছে
শিখিয়েছে উলগুলানের প্রকৃত অর্থ।

ক্লান্ত পৃথিবী
অনুরাধা কর্মকার (রানা)

হে অপরূপ পৃথিবী,
তোমার জন্য আজ বেঁচে রয়েছে প্রাণী।
আর এই পৃথিবীকেই ধীরে ধীরে করে নানা দূষণে করছে গ্রাস,
ধ্বংস করছে শত শত উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলকে করছে হ্রাস।
মানুষ যে হারে প্লাস্টিক অপব্যবহার করছে,
এর ফলে মানুষেই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।
পৃথিবীতে ভাঙছে নিজেদের নিরাপত্তা,
আর পৃথিবীটাকে মানুষেই দিনে দিনে করে তুলছে মলিনতা।
যে হারে আজ দূষণ হচ্ছে বর্ধিত,
পৃথিবী নিরুপায় হয়ে, আজ হয়ে পড়ছে ক্লান্ত।

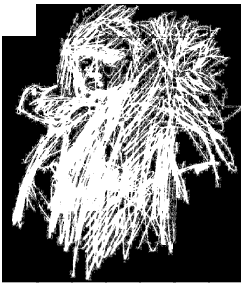

কাকতাড়ুয়ার দল
নীলাঞ্জন চক্রবর্তী

কাকতাড়ুয়ার ভয়ে ওরা উড়েই যাচ্ছিল
তবুও চালালে গুলি
নিহত হলো দুটি কাক!

কী ভেবেছো— বাকি ৫৬ জন এমনিই উড়ে চলে যাবে?

এতদিন তারা প্রত্যেকে মাত্র একটি করে ভুট্টার দানা খেয়েছিল,
এখনও অবধি লড়াইটা ছিল ক্ষুধার

এরপর ওরা রক্তপাতের হিসেব নিয়ে যাবে
৫৮ টি শস্যদানার পরিবর্তে ৫৮ একরে বিস্তৃত ভুট্টাজমি!

তুমি চাইলে বারুদ কিনতে পারো
অথবা আত্মরক্ষাহেতু মোতায়েন করো—
আরও বেশি কাকতাড়ুয়ার দল।

নাগরিক
প্রসাদ সিং

রাষ্ট্র যেটা দিয়েছে
সেটাই পরিচয়
রাষ্ট্র যেটা চায়
আমি দেখাই
সেটাই
পুষ্টি, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সমৃদ্ধি, সন্তুষ্টি
জনগণ আর নাগরিক নয়
হয় পার্টি ক্যাডার
নয় বিরোধী

ঈশ্বর রাষ্ট্র
প্রসাদ মল্লিক

রক্ত উড়ছে, রক্ত —
যেভাবে উড়ে যেত বাতাসে পাখি, এতকাল
শৈশব চুরি করে যেভাবে উড়ে গ্যাছে বে-রঙিন ঘুড়ির দল,
সেভাবেই উড়ে যায় রক্তগ্রীবা, ক্রমশ...

প্রশ্ন করার দায় নিয়ে বুলেট যার রক্ত ছুঁল
অথবা ধর্মব্যাগে ভরে আনা হল যেসব স্বাধীন চিন্তাগুলো —
তাদের রক্তহীন শরীরের পাশে কোনো খুনির চিহ্ন ছিল না,
ছিল ফুলের তোড়া হাতে দাড়িয়ে থাকা ঈশ্বর নামক রাষ্ট্র!

প্রেম তখন

অন্তরা দাঁ

তোমার যুবক দৃষ্টিতে তখনও কোন প্রকাশ দেখিনি
সতেরো বছর বয়েস কি নিজেকেই চেনে?
তখন তো প্রেম মানে
চে আঁকা টি-শার্ট
হু হু ঝড়ে উড়িয়ে নেওয়া বিকেল
আইনস্কের দুপুর
একটা হাতচিঠি
চোদ্দই ফেব্রুয়ারির গোলাপ

তুমি এসবে কোনোদিনই ছিলে না

কায়ক্লেশে পেরিয়েছি খানাখন্দ ভরা রাস্তা
অফুরন্ত জীবনের শস্যক্ষেতে একমুঠো ভিক্ষা চেয়েছে শরীর
সম্ভাবনা সারাদিন ঘুরেফিরে গেছে
নিজেকে অতিক্রম করার যন্ত্রণা
ঘাম রক্ত লজ্জা জুড়ে যেন একখানি বেনারসি শাড়ি!
পালাতে চেয়েছি; পারিনি
আবার যখন দেখা হল
তখন উপন্যাসের শেষ অংক জুড়ে বাজছে দরবারি কানাড়া
অথচ আমার খাতা ভরে উপচে উঠছে
অজস্র প্রেমের কবিতা
অবিকল যেন সেই সতেরো বছর বয়েস।

সকইল ভালবাসাই বাঁচ

অসীম মাহাত

টিঁড়গে মরে হিঁসা
ভর দুপহরে গগাই টেঁসা।
চুরকা আলু খাম আলু লাগে সুআদ মিঠা
মন খঁইজাবঅ ঢইনকে ঢইনকে ঢুঁড়ছি বাবলা আঠা।
খুকড়াই ইঁচরাই জত অঁজরা
দাদা হে মন খাঁড়ালে খাপরা।
আঁধার রাইতে ভেবাই চেরেং ছানা
খাল ঢড়াই ঢুকছি হামি গঅ তালকানা।
হুকুড় গুডুম ডুডুম বাজে ঝুমইর পাতা নাচ
অসিম কহে সকইল ভালবাসাই বাঁচ।
পুইচকে পালাই হাথের ভুখেল চেং
দেশ দশের কথা ভাইবে ভাইবে লুটপুটাঁই জাছে ঠেং।

ধ্বংসের উৎস মুখ

হরি শংকর দে

সারাদিন ঘুম ঘুম,
জোকের মতো কামড়ে ধরেছে বেকারত্ব
আমরা বাঁচতে বাঁচতে মরছি প্রতিনিয়ত।
কেউ আগুনে পুড়ে হচ্ছে দগ্ধ
কেউ বা বেকারত্বের জ্বালায়।
একদিকে পুড়ছে নশ্বর শরীর, মাংস
অন্যদিকে নিষ্পাপ মন, ধৈর্য
ক্রমশ আমরা এগিয়ে চলেছি উন্নত সভ্যতার দিকে
মানুষ পুড়ছে, মাংস পুড়ছে, পুড়ছে মানবতা।
সূর্য নাকি পুড়ে হয়েছে খাঁটি,
কই প্রতিটি সকালের সূর্য ওঠা দেখে তা মনে হয় না তো!!!

সাঁতার

রাজু রানা দাস

জলের ছায়ার নিচে জীবনের অর্ধেক সাঁতার।
বজ্র হ্রস্ব-ই কার; ঝলসে যাওয়া পরিণামটুকু
দ্বীপের ক্ষুধা ও ক্লান্ত হরপ্পার অন্ধকার ঘর,
ঘৃণা ফেলে নিরীক্ষণ আড়ালে গিয়েছি, আমিও।
নিয়তিকাল, যাদের সন্ধানে রূঢ় জল বায়ু
দু'পায়ে জলসা ভাঙে -

প্রাণ

মনতোষ মন্ডল

জলসিক্ত কথার দরজিপনায়
গা-ভেজানো চেহারার,অগ্নিবন্যা।
অনুশাসন, নেপথ্যে নিভৃতবাস...!

কবিতারা মেনে নেয়না সংজ্ঞা
বিধাতারা ছুঁয়ে দেখেনা প্রজ্ঞা;
শোষিত, গলিত হাহাকারের
মাঝ বরাবর বয়ে চলে...শঙ্কা!

চেরা চোখের আপ্রবেষ্ঠিতে
লজ্জা নিবারণের বৃথা অভিলাশ;
কাল বিলম্বের অগ্নিগর্ভে
যাঁতাকলের, আত্ম বহিঃপ্রকাশ।

হয়তো নেশায় বুঁদ...নদী
হয়তো বেকায়দায়...পাহাড়
হয়তো বা আকারে প্রকাশ, আকাশ!

সবই তো সবারই দান...!
ছুঁয়ে দেখো-না... নিরাকার প্রাণ!!

দিন বদলের ডাক
চিত্ত মাহাতো

কালো সাপের মত শহরের রাজপথে
সারিবদ্ধ হাজার হাজার মানুষ এগিয়ে চলে
রোদে গলে যাওয়া পিচ পা আটকায়
তবুও এগিয়ে যায় মঞ্চের দিকে
হাতে হাতে নীল লাল কত রঙের ঝান্ডা
সমস্বরে স্লোগান তোলে যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই
ধ্বংস নয়, সৃষ্টি চাই।
অনেক দূরে সজ্জিত মঞ্চ ঝলমল করে
ক্রমশ পৌঁছায় মিছিল গুলো
মঞ্চে তখন একদল কিশোর সুর তুলেছে
মোরা এই বিশ্বের বুকে .... করব দিন বদল।

ছাই-ভস্ম-উত্থান
সজল মহাপাত্র

জীবন থেকে আলগা করেছ হাত
আর কোনো বাতি নেই-
ঘিলু মাখা রক্ত আভা ছাড়া।
সম্ভ্রম থেকে আলগা করেছ গুলি গুলি সুতো
অপয়া-গার্হস্থ্য পাড়া
এখন সাপের পাশে সিঁড়ি;
সিঁড়ির নিচে সাপ ও তালপাতার ঘর
মানুষ পোড়া গন্ধ - ধোঁয়া;
পাক মারে খুলির ভিতর।
যারা দেখে গেলো,
দরজার পাশে পড়ে আছে শোক
তারা কজন জানে কে বুদ্ধ কে অশোক!

নেতৃত্ব
চিন্ময়ী মারাণ্ডী

কৃতিত্ব যদি প্রভাব ফেলে
জনপ্রিয়তা নিশ্চিত
হতে পারে তাতে তোমার
কিছু উদ্দেশ্য নিহীত।

মানুষের মধ্যে তুমিই সেরা
ওরা তোমাকে দেখে শিখে,
কাজ করে যাও সঠিক ভাবে
নিঃস্বার্থ কাজের উৎস ধরে রেখে।

দৃঢ়তার সঙ্গে তুমি এগিয়ে যাবে
সততা, স্বচ্ছতা, পরিসেবা প্রদান করে,
সেবায়ে, ব্রতিতে, কৃতিত্ব তোমার
সাধারণ জনতা কে আপন করে।

মনের মধ্যেই লুক্কায়িত থাকে
বিবেক-বিবেচনা,
করো-না কখনো কাকেও তুমি
তাদের কে বঞ্চনা।

আদর্শ চরিত্রের নিদর্শন হলে তুমি
মানুষ দেখবে তোমার কাছে দক্ষ প্রশাসকের প্রতিবিম্ব,
হাতের মুঠোয় থাকবে তোমার
দক্ষ শাসকের দম্ভ।

সেবক হয়ে তুমি বুঝতে পারো
সাত জনের সুখ, দুঃখ, খুশি, বেদনা, ক্রন্দন
সেবার মাধ্যমে আপন করতে পারো
সমস্ত হৃদয়ের স্পন্দন।

তোমার পরিচিতি হোক তোমার কর্মে
মনুষ্যত্ব জাত-পাতের উর্ধে,
মনের মধ্যে থাকুক কিঞ্চিত প্রচেষ্টা
চিন্তাধারা মানবিকতার মূল্যবোধে।
সীমাবদ্ধ ক্ষমতা কে সঠিক কাজে লাগিয়ে
সকলের আশা অভিলাষার উর্ধে,
দয়া মায়া ধর্মে রাখ স্নিগ্ধ হৃদয়
কর্ম হোক সর্বদা অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ।

শত সহস্র শোকার্ত মুহূর্তে উপস্থিত হয়ে
তুমি দিলে সামান্য অস্বাশনা,
তুমারই প্রাপ্য সবাইয়ের ভালোবাসা
শুভ্র শীতল জ্যোৎস্না।

সবাঙ্গীন বিকাশ উদ্দেশ্য কে পাথেয় করে
ক্ষমতার বলে প্রভাব ফেলে
লক্ষ্য রাখ বিশ-ভাতৃত্ব গড়া
সর্বশ্রেষ্ঠ নেতৃত্ব বলে।

আলোর খোঁজে
সুদীপ্তা মাহাত

যে শিশুটি কাল সকাল দেখেছিল মায়ের কোলে,
আজ সে হারিয়ে গেছে।
গোধূলির বুকে যেমন করে এসে দুপুর হারায়।
খুদে খুদে চার আঙুলে রোদ ধরেছিল,
বোঝেনি সে, কখন তারা দিয়েছে ফাঁকি।

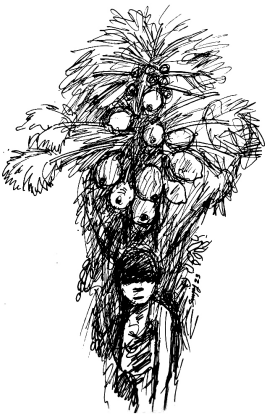

অগোছালো চুলে একরাশ ধুলো নিয়ে,
যে যুবতী এখনো পড়ে ত্রিপলের ভিতর;
নিথর, নিস্পন্দ...
কাল সেও গেয়েছিল গান।
দাঁড়িয়েছিল সারির প্রথমে।
আজও সে সারিতে, তফাৎ শুধু আলোয় ফেরা।

হয়

তপন চক্রবর্তী

ভালো লাগলেই থাকতে নেই
ভালোবেসেই থাকতে হয়,
ভুল দিয়ে ঠিক মাপতে নেই
ফুল দিয়ে ভুল মাপতে হয়।

প্রেম করে হার মানতে নেই
হার মেনে প্রেম করতে হয়,
তার-পরে আর কিচ্ছু নেই
ঘর বেঁধে প্রেমে থাকতে হয়।

জল দেখে তল বলতে নেই
ডুব দিয়ে তল জানতে হয়,
রূপ দেখে মন জানতে নেই
মন দিয়ে মন জানতে হয়।
রং দিয়ে মন আঁকতে নেই
মন দিলে রঙ আপনি হয়।

ঘর দেখে লোক চিনতে নেই
লোক চিনে ঘর জানতে হয়,
হার হলে হার মানতে নেই
হার হলে জিৎ আনতে হয়।

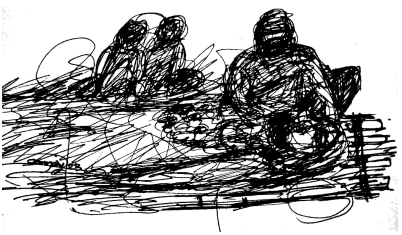

মায়ার বাঁধনে

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

নাই জন্ম, নাই মৃত্যু;
শুধুই রূপান্তর।
নাই সৃষ্টি, নাই ধ্বংস;
শুধুই মতান্তর।
নাই দেশ, নাই কাল;
শুধুই স্থানান্তর।
নাই লাভ, নাই ক্ষতি;
শুধুই মনান্তর।
নাই হার, নাই জিৎ;
শুধুই হস্তান্তর।
নাই কর্ম, নাই ফল;
শুধুই কথান্তর।
নাই বিদ্যা, নাই বুদ্ধি;
শুধুই প্রকারান্তর।
নাই শক্তি, নাই যুক্তি;
শুধুই পক্ষান্তর।
নাই ভক্তি, নাই মুক্তি;
শুধুই গৃহান্তর।

আছে শুধু মহাশূন্যে মহামায়া,
পদ্মাসনে আসা, শবাসনে যাওয়া।
আমি-আমি, আমার-আমার;
বাঁচার মন্ত্র আসা আর যাওয়ার।
কায়ার সাথে ছায়ার লড়াই,
শুধু মোহ আর মায়া।
এটাই আশা, এটাই বাঁচা;
জীবনের গীত গাওয়া।

অপেক্ষা-২

উদয় শঙ্কর রক্ষিত

যাওয়ার সময় দিয়ে গেলে এক আঁচল কাজুফুলের সুঘ্রাণ

আর কবে তোমার চরণস্পর্শ করবে আমার চৌকাঠ শ্রীধাম
দরজা খোলা রেখে করি ইন্তেজার।

যতটা সুগভীরভাবে তোমার কথা ভাবি রোজ
(কি জানি?) সেভাবে ভাবলে হয়তো কবিতা হত ঢের।

সাইকেলের চাকার মতো গভীর ক্ষত নিয়ে ঘুরছি
সাপলুডো জীবনের প্রতিটি বাঁক

আমার কাছে তুমি তো আশ্চর্য মলম এক
অথচ ফিরবে বলে রাধাভাব জাগিয়ে ছুঁলে কোন এক পরবাসী মেঘ-

স্বপ্ন

মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী

আমার স্বপ্নেরা সব ঘুরে-বেড়ায়
পরীর মত নয়।
বুকে পাথর চাপা দিয়ে
আগুনের স্ফুলিঙ্গ হয়।

নীড়-হারা পাখি

সৌমেন মন্ডল

নীড় হারা পাখীটার মনে কোন দুঃখ নেই আজ
ঝড় এসে কতোবার উড়িয়ে নিয়ে গেছে তার
ভালোবাসার ছোট্ট একটুকু বাসা-কে ।
কতো সুখ স্মৃতি মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে গেছে,
তবুও কিছুই যায় আসে না তার,
নতুন করে বাসা বাঁধার চেষ্টা করে সে বারবার
কে না চায় ভালোবাসার বাসা বাঁধতে
কিন্তু পারে ক'জন??
গোধূলির আলো ডানায় মেখে উড়ে,
শুকনো গাছের কোটরে কাটিয়ে দিতে পারে সে
সারাটা জীবন।

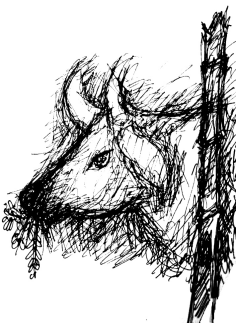

অরণ্যসুন্দরী

একটি ভয়াবহ সমস্যা ও তার সমাধান

আনন্দ রঞ্জন দাশগুপ্ত

পৃথিবী যত আধুনিক হয়েছে, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান মানুষকে অনেক কিছু উপহার দিয়েছে, যা জীবনযাপনকে এবং বেঁচে থাকাকে করেছে সহজতর। কিন্তু বিজ্ঞানের সেই আশীর্বাদ মানুষের বিবেচনার অভাবে পরিণত হয়েছে অভিশাপে। প্লাস্টিক বর্জ্য তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ!

প্লাস্টিক আবিষ্কারের পিছনে কারণ ছিল বিভিন্ন দ্রব্যকে ধূলো, ময়লা, জীবাণু, আর্দ্রতা থেকে বাঁচানো, কারণ সেই সময় সমস্ত প্রকার দ্রব্য সমুদ্রপথে জাহাজে করে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাতায়াত করতো, সেগুলো জল ও নোনা হাওয়া থেকে বাঁচাতে না পারলে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি হয়ে চলছিলো প্রতি বছর!! তাছাড়াও বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যকে বাইরের জার্ম ও ব্যাক্টেরিয়া থেকে বাঁচানো! বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও ইলেকট্রিকাল দ্রব্যকে জল ও ড্যাম্পের হাত থেকে বাঁচানো! জলের মধ্যে দিয়ে ইলেক্ট্রিক, কেবেল নিয়ে যাওয়া! এগুলোই ছিলো প্রধানত: প্লাস্টিক আবিস্কারের পিছনে কারণ!

আমাদের প্রতিদিনের বেঁচে থাকায় প্লাস্টিকের ব্যবহার আজ অপরিহার্য! জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বিকল্প সামগ্রী হিসেবে পলিমারের ব্যবহার হচ্ছে! ক্যারি ব্যাগ থেকে ওষুধের বোতল, খাদ্য পরিবেশনের পাত্র থেকে ফুলের টব - বিভিন্ন ক্ষেত্রে চটের ব্যাগ হোক কিংবা কাঁচের শিশি অথবা চিনেমাটির থালা কিংবা মাটির টব-এ সব কিছুরই বিকল্প হিসেব ব্যবহৃত হচ্ছে প্লাস্টিক! অপেক্ষাকৃত সস্তা, বহনযোগ্য হওয়ার কারণে দ্রুত জনপ্রিয়তা পেয়েছে পলিমারে তৈরি সামগ্রী! এর ব্যবহার নিয়ে আপত্তি নেই, কিন্তু ব্যবহারের পর যেভাবে এগুলিকে যত্রতত্র ফেলে দেওয়া হচ্ছে, আপত্তি তাতেই! সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব থাকায় তারা ব্যবহার করা প্লাস্টিকের সামগ্রী যেখানে-সেখানে ফেলে দিচ্ছে! যেহেতু প্লাস্টিকের সামগ্রী মাটিতে মিশে যায় না, এর একাংশ পুনর্ব্যবহারযোগ্য নয়, তাই ক্রমশ তা বর্জ্য হিসেবে জমা হচ্ছে লোকালয়ের বুকে! আর তা থেকেই ছড়াচ্ছে দূষণ! পলিমার সামগ্রী পুড়িয়ে ফেললে আরও বিপদ, হাইড্রোকার্বন হয়ে বাতাসে মিশে তা বাড়িয়ে দিচ্ছে দূষণের মাত্রা।

প্রতি বছর ভারতে ৫৬ লক্ষ টন প্লাস্টিক বর্জ্য জমা হয়! এর মধ্যে রাজধানী দিল্লি প্রতিদিন ৯,৬০০ মেট্রিক টন বর্জ্য উৎপাদন করে! এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কঠোর কোনো আইন ভারতে নেই! একটাই আইন রয়েছে ৭৫ মাইক্রনের কম প্লাস্টিকের ব্যাগ কেউ উৎপাদন বা ব্যবহার করতে পারবে না যেহেতু তা পুনর্ব্যবহারযোগ্য হয় না! কিন্তু সরকারি নিয়মের তোয়াক্কা না করে কম মাইক্রনের সামগ্রী তৈরি হচ্ছে, যা বর্জ্য হিসেবে জমে উঠছে আমাদের পরিবেশে! এই অবস্থা থেকে মুক্তি কোথায় ? সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে না থেকে অনেকে মুক্তির পথ দেখাচ্ছেন। অনেক পরিবেশ সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিজেদের উদ্যোগে প্লাস্টিকের অভিনব ব্যবহারে উদ্যোগী হয়েছে! অনেকে একেবারে ব্যাক্তিগত উদ্যোগে প্লাস্টিক বর্জ্যের মোকাবিলায় এগিয়ে এসেছেন।

বর্তমান পৃথিবীর মানুষের দৈনন্দিন জীবন প্লাস্টিক ছাড়া কল্পনাতীত! প্রায় সকল ধরনের মোড়ক ও বোতল প্লাস্টিকের তৈরি। ব্যবহৃত প্লাস্টিকের কিছু অংশ রিসাইকেল করা হলেও বেশিরভাগই বর্জ্য হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছে!

প্লাস্টিক বর্জ্য ৪০০ বছর পর্যন্ত পরিবেশে বিরাজ করে জীব ও প্রকৃতির ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। উন্নত দেশে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থাকায় ব্যবহৃত প্লাস্টিক পরিবেশে কম ছড়িয়ে পড়ে! তবে এশিয়ার দেশগুলো বিশ্বের ৫১ শতাংশ প্লাস্টিক দূষণকারী।

প্লাস্টিক বর্জ্য মারাত্মক ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ পরিবেশে নিঃসরণ করে।

মাইক্রো কণা হিসেবে এসব ক্ষতিকর পদার্থ খাদ্যদ্রব্য (সব্জী, মাছের পেটে, মুরগী ও ছাগলের পেটে পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিক ও মাইক্রোপ্লাস্টিক) ও জলের মাধ্যমে মানুষের দেহে সরাসরি প্রবেশ করছে। মাইক্রোপ্লাস্টিক কণায় থাকা বিভিন্ন বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ মানুষের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার বিরূপ পরিবর্তন ঘটাচ্ছে বলে বিজ্ঞানীরা দাবী করছে!

প্লাস্টিক বর্জ্য মাইক্রো কণার ক্ষতিকর পদার্থ মানবদেহে থাকা হরমোনজনিত পরিবর্তন করে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু তৈরি ব্যাহত করতে পারে। স্নায়ুকোষ ক্ষতিগ্রস্ত করে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের নানা রোগের কারণ হতে পারে। কোষের জীনগত পরিবর্তন করে ক্যানসারসহ আরও নানা ধরনের রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এ ছাড়া, প্লাস্টিক পণ্যের সরাসরি সংস্পর্শে (যেমন থার্মোকল ও প্লাস্টিক উৎপন্নকারি বিভিন্ন রাসায়নিক) ত্বকের রোগ হতে পারে।

প্রতিদিন গ্রহণ করা খাবার, জল ও বাতাসের মধ্য দিয়ে প্লাস্টিকের ক্ষুদ্র কণা (মাইক্রোপ্লাস্টিক) আমাদের শরীরেও প্রবেশ করছে। তবে এই প্রথমবারের মতো গর্ভের শিশুদের নাড়িতেও মাইক্রোপ্লাস্টিক কণার উপস্থিতি খুঁজে পেয়েছেন একদল গবেষক।

তারা বলছেন, এমন সংবেদনশীল প্রত্যঙ্গে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি হতে পারে শিশুদের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির কারণ। এই ঘটনাকে 'চরম উদ্বেগের' বিষয় বলেও অভিহিত করেছেন ওই গবেষকরা।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম "দি গার্ডিয়ান" জানাচ্ছে, সম্প্রতি চার জন অন্তঃসত্ত্বার ওভারিতে ইতালির রোমের একদল গবেষক মাইক্রোপ্লাস্টিক কণার অস্তিত্ব খুঁজে পান। গবেষণায় অংশ নেওয়া নারীরা শারীরিকভাবে সুস্থ ছিলেন। তারা সন্তান প্রসবও করেছেন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। গবেষকদের ধারণা, খাদ্যগ্রহণ বা নিঃশ্বাসের ভেতর দিয়ে ওই কণাগুলো ওভারিতে প্রবেশ করেছিল।

গর্ভাবস্থায় শিশুদের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ওভারি। এটি গর্ভের শিশুদের শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ ও অপ্রয়োজনীয় উপাদান বের করে দেওয়ার কাজ করে। শিশুদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরিতেও ভূমিকা রাখে প্রত্যঙ্গটি।

গবেষকরা বলছেন, ক্ষুদ্র মাইক্রোপ্লাস্টিক কণায় এমন রাসায়নিক উপাদান থাকতে পারে, যা শিশুর বিকাশে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

গবেষণায় ওই অন্তঃসত্ত্বাদের ওভারিতে অন্তত কয়েক ডজন প্লাস্টিক কণা খুঁজে পাওয়া যায়। এর মাত্র চার শতাংশকে পরীক্ষা করেই আরও বেশি ক্ষুদ্র

প্লাস্টিক কণা পাওয়া যায়।

বেশিরভাগ কণা ছিল নীল, লাল ও কমলা রঙের। গবেষকদের ধারণা, এগুলো পণ্যের মোড়ক, রঙ, প্রসাধনী বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র থেকে এসেছে।

প্লাস্টিকের কণাগুলোর আকার এত ছোট ছিল যে, সেগুলো খুব সহজেই রক্তে মিশে যেতে পারে। প্লাস্টিকের তৈরি বিভিন্ন দ্রব্য ছাড়া আধুনিক জীবন অচল। এ জন্য প্লাস্টিক পণ্য নিষিদ্ধ করে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগ যৌক্তিক নয়। বহুল ব্যবহৃত প্লাস্টিকে তৈরি পলিথিন ব্যাগ দূষণে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। পলিথিনের পরিবর্তে কাগজ, পাট বা প্রাকৃতিক তন্তুর তৈরি ব্যাগ ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে, প্রয়োজনে পলিথিনের ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যেতে পারে।

পাতলা প্লাস্টিক ব্যাগগুলির মূল্য খুবই কম এবং এগুলিকে আলাদা করা খুবই কষ্টকর। যদি প্লাস্টিক ব্যাগ পুরু বা মোটা করা যায় তা হলে এই ব্যাগের দাম বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে এবং এর ব্যবহারও তখন সীমিত হয়ে যেতে পারে। প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ এবং তা নষ্ট করে দেওয়ার কাজে প্লাস্টিক ম্যানুফ্যাকচারার অ্যাসোসিয়েশন এবং কাগজ কুড়ানিদের নেওয়া যেতে পারে। পৌরসভা এলাকাগুলিতে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের ব্যাগ, জলের বোতল, প্লাস্টিকের পাউচ বিরাট চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করে। সিকিম, জম্মু-কাশ্মীরের মতো বেশ কয়েকটি পাহাড়ি রাজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ি এলাকার পর্যটনস্থলে প্লাস্টিক ব্যাগ ও বোতলের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হিমাচল প্রদেশের সরকার রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'এইচপি নন-বায়োডিগ্রেডেবল গারবেজ (কন্ট্রোল) অ্যাক্ট ১৯৯৫' আইনটিকে ব্যবহার করে ২০০৯ সালের ১৫ আগস্ট থেকে গোটা রাজ্যেই প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারও প্লাস্টিক থেকে পরিবেশের কী ক্ষতি হতে পারে তার একটি সমীক্ষা করিয়েছে। এর জন্য একটি পরামর্শদাতা কমিটি এবং টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে যারা পুরো পরিস্থিতি বুঝে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে।

১৯৯৯ সালে পরিবেশ এবং বন মন্ত্রক একটি রিসাইকেলড প্লাস্টিকস ম্যানুফ্যাকচার অ্যান্ড ইউজেজ রুল নামক বিধি তৈরি করে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের (১৯৮৬) আওতায় ২০০৩ সালে এটিকে সংশোধিত করা হয়। এই আইনে প্লাস্টিকের ব্যাগ ও কন্টেনার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে নীতিনির্দেশ জারি করা হয়েছে। ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস

(বিস) বায়েডিগ্রেডবল প্লাস্টিকের জন্য দশটি মান নির্ধারণ করেছে! তা সত্বেও মাঠে নেমে কাজের ক্ষেত্রে এখনো সেইরকম তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না! সবকিছুই আছে খাতায় কলমে! কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু আধিকারিক ও প্রশাসনিক কর্মঠ মানুষ নিজের থেকে কিছু কাজ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার চেস্টা করছেন, কিন্তু আপামর মানুষের উদাসীনতা ও অবহেলায়, তা মাঠে মারা যাচ্ছে!

সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক সামগ্রীর কারণে যে দূষণ সৃষ্টি হচ্ছে তা দেশকে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত সমস্যার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। সিংগ্‌ল্‌ ইউজ প্লাস্টিক থেকে সৃষ্টি আবর্জনার দূষণ প্রশমনের জন্য ভারত খুবই ধীরে ধীরে হলেও জেগে উঠছে। ২০১৯ সালে রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ সংক্রান্ত চতুর্থ সভায় ভারত একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক পণ্যের দূষণ মোকাবিলায় একটি প্রস্তাব পেশ করে। বিশ্বব্যাপী এর গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করে সভায় এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং স্থির করা হয় যে, ২০২২ সালের পয়লা জুলাই থেকে পলিস্টাইরিন ও সম্প্রসারিত পলিস্টাইরিন সহ একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের উৎপাদন, আমদানি, মজুত, বিতরণ, বিক্রি এবং ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে। আসাম, নাগাল্যান্ডে সেই নিয়ম লাগুও হয়েছে, ধীরে ধীরে সমস্ত দেশের রাজ্যগুলি এই নিয়ম মানার কথা ভাবছে!

হাল্কা ওজনের প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগের কারণে যে আবর্জনা সৃষ্টি হয় তা বন্ধ করতে ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে তা বাড়িয়ে ১০০ মাইক্রন করা হয়েছে। এই ঘনত্ব বৃদ্ধির কারণে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ পুনরায় ব্যবহার করা যাবে। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের প্যাকেজিং সামগ্রী থেকে মূলত দূষণ সৃষ্টি হয়। তাই এই ধরণের প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করা বিশেষ প্রয়োজন। প্লাস্টিক উৎপাদক, আমদানিকারী এবং ব্র্যান্ডের মালিককে তাই পরিবেশের দিকে তাকিয়ে এই ধরণের একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশোধনী বিধি ২০২১-এর মাধ্যমে এই বিষয়টিকেই আইনী স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা হয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক/ দফতরগুলিকে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহার নির্মূল ও প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি ২০২১ কার্যকরীভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও তা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহার না করার বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে প্রচারাভিযান চালানো হচ্ছে, যদিও তা স্বল্প পরিসরে!।

সমাধান :

রিসাইকেল!

বিষয়টি নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেন, অথচ যে যে দেশ এবং আমাদের দেশেই বিচ্ছিন্নভাবে যে যে রাজ্য, শহর এবং গ্রাম এই নিয়ে কাজ করে সফল হয়েছে বা হচ্ছে, তাদের কাজের মডেলকে কেউ অনুসরণ বা পর্যবেক্ষণ করে না!

প্রথম কাজ হওয়া উচিত সচেতনতামূলক লাগাতার প্রচার! প্লাস্টিকজাত

দ্রব্যকে ব্যবহারের পর যত্রতত্র ফেলে না দিয়ে, তাকে রিসাইকেলের জন্য যা যা করণীয়, তাই করা উচিত! আমাদের মধ্যে নিয়ম না মানার একটা প্রবৃত্তি আছে! সেখান থেকে সবাইকে সচেতন করা খুবই কঠিন কাজ! প্রশাসনের এই বিষয়ে অতি সত্বর কঠোর হয়ে লাগাতার সচেতন করা, আইন করে ফাইন করা, বাড়ি বাড়ি ও দোকানে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করার পরিকল্পনা নেওয়া উচিত! মানুষকে সচেতন না করে নীল বালতি বা সবুজ বালতি ধরিয়ে দিলেই মানুষ নিয়ম মানবে না, তাদের কারণটা বোঝাতে হবে, উদ্দেশ্যটা বোঝাতে হবে, আগামি দিনে প্লাস্টিকের কারণে দেশে মৃত্যুর মিছিল ও মহামারি হতে পারে, সেটা বোঝাতে হবে! এটাই প্রশাসনের কাজ!

রিসাইকেল করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্পই এর থেকে মুক্তি দিতে পারবে না! এটা বুঝতে যত দেরি হবে, বিপদ তত ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে!

পাহাড় পূজো কানাইসর

বিচিত্র গুপ্ত

স্থানীয় সঙ্গীত, সাহিত্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, আবেগ, অনুভূতি, উন্মাদনা, ভালোবাসা, প্রেম তথা ঐতিহ্য ও বংশানুক্রমিক পরম্পরা হিসাবে প্রকৃতি পূজোর যে বিশ্বজনীন ইতিহাস বহমান, তা এই অঞ্চলের মানুষের কাছেও অনুসৃত হয়ে আসছে স্মরণাতীত কাল ধরে, পাহাড় পূজো তার মধ্যে অন্যতম।

এই পরম্পরা অনুসরণ করেই প্রতি বছর আষাঢ় মাসের তৃতীয় শনিবার, ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর দুই নম্বর সমষ্টি উন্নয়ন অঞ্চলের অন্তর্গত সন্দাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খন্ড রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমানায় অবস্থিত, কানাইসর পাহাড়কে কেন্দ্র করে যে প্রকৃতি পূজোর আয়োজন হয়, সেটাই কানাইসর পাহাড় পূজো নামে পরিচিত। কেউ কেউ বলেন কানাইশর/ কানাইশহর পাহাড় পূজো।।

ভারতবর্ষের পাঁচ রাজ্য যথা পশ্চিম বঙ্গ, ঝাড়খন্ড, বিহার, ছত্রিশগড় ও উড়িষ্যা জুড়ে বিস্তৃত ছোট নাগপুর নামক যে মহাদেশীয় মালভূমি অবস্থান করছে, তারই অন্তর্গত একটি নাতিউচ্চ পাহাড় এই কালাইশর। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা আনুমানিক ৩০০ মিটার থেকে ৩৩০ মিটার অর্থাৎ ৯৮৫ ফুট থেকে ১০৮৩ ফুট। মূলত গ্রানাইট, নিস, হেমাটাইট, কোয়ার্টজাইট পাথর দিয়ে গঠিত এই পাহাড়। ৫০ মিলিয়ন বছর আগে ক্রিটেশিয়াস যুগে ছোটনাগরপুর মালভূমি সৃষ্টির প্রাক্কালে এই পাহাড়ের সৃষ্টি বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান।

এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উল্লেখ যোগ্য কয়েকটি পাহাড় পূজো যথা গাডরাসিনী পাহাড় পূজো, হাতিমারা পাহাড় পূজো, গোটা শীলা পাহাড় পূজো ইত্যাদি হলেও কানাইসর

পাহাড় পূজোই যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন এবং সর্বাধিক পরিচিত, এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই।

জনশ্রুতি, পাশাপাশি দুটি পাহাড়। একটির নাম রাজাপাহাড় আরেকটির নাম রাণী সাহাড়। কথিত আছে এখানকার পাহাড়ী গুহায় বাস করতেন জঙ্গলের এক রাজা এবং তার রাণী। এই রাজাকে 'ঠাকুর' এবং রাণীকে 'ঠাকুরাণী' বলেও ডাকা হতো, এমন জনশ্রুতিও আছে। যাই হোক, পূর্ব থেকে পশ্চিম দিক বরাবর এই পাহাড় দুটোর অবস্থান বা বিস্তার। পূর্ব দিকের পাহাড় রাজার খুব পছন্দের। সেটি রাজা পাহাড়। পশ্চিমের পাহাড়টি রাণীর পছন্দের। সেটি রাণীপাহাড়। রাজা শিকার করতে ভালো বাসতেন। জঙ্গলে ঘুরে বরা (শুয়োর), সজারু, বন খরগোশ, পাখি ইত্যাদি শিকার করতেন।

প্রসঙ্গত এই পাহাড় দুটোর সাথেই পশ্চিম দিকে আরও অনেক গুলো ছোট ছোট পাহাড়ের বিস্তার ঘটেছে, যেগুলোর বিস্তার গোটাশিলা, ঢাঙ্গীকুসুম, কাকড়াঝোর, ঝাটিঝর্ণা, বুরুডি ড্যাম হয়ে দুয়ারসিনির দিকে চলে গেছে। রাজা পাহাড়, রাণীপাহাড় লাগোয়া একই সারিতে পশ্চিম দিকের পাহাড় ও পাহাড়ী জঙ্গলে ছিলো বরাহ (বরা/ শুয়োর) অর্থাৎ বুনো শুয়োরের বিচরণ ক্ষেত্র। অর্থাৎ বরাহদের ঘাঁটি। এটি এখন বারহাঘাট নামেই পরিচিত।

এই দুই পাহাড়ের মাঝখানে অর্থাৎ রাণীপাহাড়ের পূর্ব দিক আর রাজা পাহাড়ের পশ্চিমদিক সীমানা বরাবর উঁচু একটু পাথরের থান ছিল। এখানে রাজা রানি পূজো করতেন। এটি 'দে হরির থান' বলে পরিচিত ছিল। হরির দেবতার থান। অর্থাৎ এখানে ঈশ্বর হিসাবে ভগবান কানাই অর্থাৎ কৃষ্ণের পূজো হত। অর্থাৎ সেই রাজা এবং রাণী এই ভগবান কানাই ঈশ্বর ' কে পূজো করতেন। পাহাড়ের পাথর দিয়ে সেখানে একটি মন্দিরও তৈরি করেছিলেন। সেই মন্দিরের জীর্ণ ধ্বংসাবশেষ এর কথা আজ থেকে ১০২ বছর আগে ১৩২৮ বঙ্গাব্দ নাগাদ প্রকাশিত 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে শ্রী যোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয় উল্লেখ করেছেন— "একস্থানে একটি জীর্ণ প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই রূপ কিংবদন্তি যে, পূর্বে ওই স্থানেই পাহাড়ের পূজা হইত।"

এই রাজা এবং রাণীর মধ্যে মাঝে মধ্যে ঝগড়া ঝাটি হত বিভিন্ন কারণেই। কথিত আছে, রাজা এবং রাণী দুজনেই জঙ্গলে ঘুরতে বের হয়েছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে পাহাড় জঙ্গল ঘেরা একটি প্রশস্ত জলাশয়ের কাছে উপস্থিত হন। সেখানে কোন কারণ বশতঃ রাজার সাথে রাণীর মনোমালিন্য হয়। শুরু হয় কলহ। বাগ বিতণ্ডা। রাজা ক্রোধ সংবরণ করতে না পেরে হাতের শিকারের জন্য রাখা অস্ত্র দিয়ে রাণীর নাক কেটে দেন এবং এই ঘটনার পরে সেই রাজা এবং রাণীর আর দেখা পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি সেই পাহাড় ঘেরা জলাশয় আজকের 'খাঁদারাণী'। আর সেই রাজা এবং রাণী দ্বারা পূজিত 'কানাই ইশ্বর' এর পাহাড় 'কানাইশর পাহাড়'। কানাই + ঈশ্বর = কানাইশ্বর। ক্রমে লোক মুখে হয়ে গেছে, কানাইশর / কানাইসর / কানাই শহর।

বর্ষা শুরু হলে, স্থানীয় মানুষ চাষ আবাদে মেতে উঠতেন। জমি তৈরি করা। ধানের পাতো দেওয়া। সেই পাতো ফুলে তৈরি করা জমিতে বোনা সম্পূর্ণ হলে রাজা আদেশ দিলেন, একটু সবাই মিলিত হয়ে যদি পূজো করা হয় এবং সেই

পূজো উপলক্ষে সবাই এক জায়গায় মিলিত হয়ে খাওয়া দাওয়া করা হয়, তাহলে বেশ হয়। কিন্তু একটা শর্ত দিলেন, সেই উৎসবে কোন নারী উপস্থিত হতে পারবে না। কারণ কি ? কারণ সহজেই অনুমেয় রাজা বিভিন্ন কারণে যেহেতু রাণীর উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন সেই কারণে এই রকম বিধান।

প্রতি বছর শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবার এই বিশেষ পূজো এবং উৎসব এর সূচনা হলো। পাহাড়ের উপরে হরির থানে এই পূজো হলেও, সেখানে কোন রকম পশু বলি দেওয়া যাবে না। রাণীপাহাড়ের পূর্বদিকে অপেক্ষাকৃত নিচু স্থানে অবস্থিত বড় মেগালিথ পাথরের থানে হবে পশু বলি এবং পূজো। যিনি পূজো করতেন তাকে বলা হতো 'দেহরী' অর্থাৎ 'হরি দেবতার পূজারী'। ছাগল, মোরগ, পায়রা ইত্যাদি বলি দিয়ে পূজোয় উৎসর্গ করা হবে। এবং সেই মাংস সবাই এক স্থানে উপনীত হয়ে রান্না করে খাওয়া দাওয়া করবে। সেই সঙ্গে আরও দুটো নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। রান্না করা মাংস কোন অবস্থায় বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যাবে না। অবিবাহিত মহিলা, সন্তান সম্ভবা বিবাহিত মহিলারাও এই প্রসাদ খেতে পারবে না। দ্বিতীয়ত পাহাড়ের পূর্ব দিক দিয়ে- উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে বয়ে চলা ডুলুং নদী পার হয়ে নদীর পূর্ব পাড়েও যাওয়া যাবে না। যিনি পূজো করবেন তিনি থাকবেন প্রাকৃতিক অর্থাৎ নিরাভরণ। যদিও বর্তমানে এই নিয়মের অবসান হয়েছে দেখা যায়। বর্তমানে এই পূজোর দায়িত্ব কেন্দাপড়ার শবর সম্প্রদায় এর মানুষের উপর।

সিতাপুর মধুপুর কিংবা লোয়াদা থেকে বুরুড়ি গ্রাম বাম দিকে রেখে যে পাহাড়ী রাস্তা পাহাড় টপকে কাকরিঝর্ণা, ডাকাই গ্রামের দিকে উঠে গেছে। সেই পথের দু পাশে রাজা পাহাড়ের পাদদেশে বসে এই উৎসব পালিত হয় এবং বলি দেওয়া প্রচুর মাংস রান্না করে খাওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই পূজোয় কোন দোকান পাট বসে না। মূলত চারপাশের গ্রামগুলো থেকেই মানুষের সমাগম ঘটে।

জনশ্রুতি আছে, রাণী চাষবাস পছন্দ করতেন। জঙ্গলে জঙ্গলে শিকার করে পশু শিকার পছন্দ করতেন না। পছন্দ করতেন না নিরীহ পশু বধ করে রক্ত পাত ঘটানো অথচ রাজার কাছে জঙ্গলে ঘুরে পশু শিকার করা ছিল নেশার মত। এই নিয়েই রাজা রাণীর কলহের সূত্রপাত। এই কারণে রাজা রাণীর বিরুদ্ধে গিয়ে এই উৎসবের সূচনা করেছিলেন, যেখানে শুধু নিজের রাণীই নয়, অন্য কোন নারীও যেন এখানে আসতে না পারে, এমন বিধান দিয়েছিলেন। কৃষি কাজে চারা রোপণ শেষ হলে একটু সবাই মিলে পশু বলি দিয়ে খাওয়া দাওয়া করে দেবতা কে সন্তুষ্ট করা এবং ফসল যাতে ভালো হয় সেই জন্যে 'কানাই ঈশ্বর' এর কাছে প্রার্থনা করা এমনটাই মনে করা হয়।

এদিকে, আষাঢ় মাসের তৃতীয় শনিবার যে পাহাড়ে পূজো হয়, সেটাই আসলে রাণীপাহাড়। এই রাণীপাহাড়ই 'কানাইসর' পাহাড় নামে পরিচিত। এই পাহাড়ের পাদদেশে রয়েছে বড় বড় প্রাচীন জাম গাছ। রয়েছে শাল মহুয়া কেঁদু গাছ। পাহাড় লাগোয়া একটি সুবিশাল পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত মেগালিথ পাথর। এই পাথরটি হলো দ্বিতীয় পূজার স্থান। পূজোর এই থানের পূর্ব দিক দিয়ে পাহাড়ের শীর্ষ দেশে পৌঁছানোর যে রাস্তা সেটি সব থেকে পুরনো রাস্তা। পশ্চিম দিক দিয়ে পরবর্তী কালে আরো একটি রাস্তা উপরে ওঠার জন্যে তৈরি হয়ে গেছে। এই

দুই রাস্তা দিয়েই পায়ে হেঁটে পাহাড়ের শীর্ষ দেশে পৌঁছতে হয়। শীর্ষ দেশে পৌঁছনোর প্রায় ২০ ফুট নিচে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত রয়েছে গ্রানাইট পাথরের সুবিশাল দেওয়াল। রয়েছে পূজোর প্রথম থান। এখানেই ছিল এক সময় সেই রাজা রাণীর বসবাসের গুহা। যদিও কালের বিবর্তনে সেই গুহা কিংবা গুহামুখের অস্তিত্ব বর্তমানে বিলুপ্ত। রাজা রাণী অন্তর্ধানের পর থেকে এখানেই পূজোর প্রবর্তন হয়। পাহাড়ের শীর্ষ দেশ সমতল।

এই সমতল বরাবর পূর্ব দিকের শেষ প্রান্তের কাছকাছি আরো একটি প্রাচীন থান আছে। পাথর ও পাথরের ধ্বংসাবশেষ দেখে অনুমান করা যেতে পারে, এখানেই হয় তো যোগেশ চন্দ্র বসু উল্লেখিত সেই প্রাচীন মন্দিরের অবস্থান ছিল। এবং এটাই সেই রাজা রাণী দ্বারা পূজিত কানাই বাবার থান। যেহেতু এই পাহাড়টি রাণীর প্রিয়, এবং রাণী পশুবধ রক্ত পছন্দ করতেন না,- তাই এখনও কানাইসর পাহাড় পূজোর দিন পাহাড়ের উপরে কোন রকম মাংসাদি আমিষ আহার করা নিষিদ্ধ। এই পাহাড়ের পাদদেশে যেমন মেলা বসে, ঠিক তেমনই শীর্ষ দেশের এই সমতল স্থানেও বসে মেলা। পূজোর দিনে লক্ষ লক্ষ মানুষ যেন পাহাড়, পাহাড়ের পাদদেশ, ঢাল, ঢালের খাঁজ উপ খাঁজে মৌমাছির চাকের মত বিচরণ করতে থাকে, পূজোর প্রার্থনা যে যার মত শেষ করে।

যেহেতু, আষাঢ় শ্রাবণ বর্ষা কাল। এই বিস্তীর্ণ পাহাড় জঙ্গল ঘেরা জনপদে কৃষি কাজ সূচনার কাল। বৃষ্টি না হলে কোন ভাবেই কৃষি কাজের সূচনা করা যাবে না। বৃষ্টি হলে তবেই মাটি নরম হবে। মাটি নরম হলে তবেই মাটি লাঙ্গল দিয়ে কিংবা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে বীজ রোপন করে পাতো তৈরির ও ধানের চারা লাগানোর উপযোগী করে তোলা যাবে। অতি বৃষ্টি হলে কিংবা বৃষ্টি একবারে না হলে এই কাজ কিছুতেই করা যাবে না। সুতরাং প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে, যাতে কৃষিকাজের উপযোগী বৃষ্টিপাত হয়। এই উপলক্ষে কানাইসর পাহাড়ে কানাই বাবার থানে সকলে জড়ো হয়ে পূজো করা প্রার্থনা করা, রাণীমা এমনটা পছন্দ করতেন এবং এখানে সকলে এসে মিলিত হয়ে প্রকৃতি পূজো তথা বাবা কানাই এর অবস্থান এই পাহাড়কে পূজো করতেন। সেই ঐতিহ্য এখনও বহমান। প্রতি বছর দুই বার। আষাঢ় মাসের তৃতীয় শনিবার এবং শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবার।

স্থানীয় বহু মানুষের বিশ্বাস, কানাইবাবা আসলে বুড়হা বাবা'র 'বুড়হা বাবা' মানে বাবা ভৈরব। অর্থাৎ বুড়ো বাবা শিব এর অধিষ্ঠান। ওদিকে ঢলভূমগড়ের রাজাদের আরাধ্য দেবী 'রংকিনী মাতা'। ইনি আসলে ভৈরব বাবার ভৈরবী, এমনটাই বিশ্বাস। ভৈরবী অর্থাৎ মা পার্বতী। কেউ কেউ বলেন ইনি মা দুর্গা। এই কারণে ঢলভূমকে মাতা রংকিনী

র নাম অনুসারে 'রংকিনীভূম'ও বলা হত। বুড়া বাবা হলেন রাজা। রাণী হলেন মা ভৈরবী। এই পাহাড়ে রাজা বা রাণীর বাস বলে যে জনশ্রুতি, আসলে তারা বাবা ভৈরব এবং মা ভৈরবী। অবসর যাপন করতে বাবা ভৈরব এবং মা ভৈরবী এই পাহাড়ে এসে অবস্থানও করেন। এটাই লোক শ্রুতি।

এই কানাইসর পাহাড় পূজো সম্পর্কে শ্রী যোগেশ চন্দ্র বসুই সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন- "এই জেলার (তখন অবিভক্ত মেদিনীপুর) পশ্চিম সীমান্তে বিনপুর থানায় কানাইসর নামে একটি পাহাড় আছে। এতদ অঞ্চলের পাহাড় কয়টির মধ্যে ইহাই সর্ব্বোচ্চ। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে এই পাহাড়ে দুইবার পূজা হয়। তদুপলক্ষে বাঁকুড়া, মানভূম, সিংহভূম প্রভৃতি জেলা হইতে লোক আসিয়া থাকে। গিরি-শৃঙ্গের দৃশ্য অতি মনোরম। সেখানে নানা প্রকার অদ্ভুত ও বিচিত্র পুষ্পোদ্যান দৃষ্ট হয়। তথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষও আছে। শিখর দেশ বিস্তৃত। তন্মধ্যে মাত্র ছয় বিঘা ভূমি উদ্ভিদ বর্জিত সমতল ক্ষেত্র। অবশিষ্ট প্রায় পঞ্চাশ ষাট বিঘা ভূমি নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ। একস্থানে একটি জীর্ণ প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এইরূপ কিম্বদন্তী যে, বহুকাল পূর্বে ঐ স্থানেই পাহাড়ের পূজা হইত। কিন্তু বলিদানের পর তথায় কাহারও থাকিবার বা যাইবার অধিকার ছিল না। এক সময় পূজক বলির খড়্গটি আনিতে ভুলিয়া গিয়া পুনরার যখন উহা আনিবার জন্য উপরে গমন করেন, তখন দেখেন যে, দেবতা তথায় দুইটি ব্যাঘ্র লইয়া উপবিষ্ট আছেন। দেবতার প্রত্যাদেশ হয়, "আর কখনও এই স্থানে আসিও না— এবার হইতে নীচে পূজা করিও। তদবধি আর উপরে পূজা হয় না বা সচরাচর কেহ উপরে উঠেও না। দেবতার আদেশে হউক বা না হউক, ব্যাঘ্রের ভয়েই যে পূজকগণ আর অত উচ্চে সেই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানের জীর্ণ মন্দিরে বসিয়া পূজা করিতে সাহসী হন নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। পাহাড়টির সানুদেশে 'দে হরির স্থান' নামে একটি প্রশস্ত স্থান আছে তথায় কতকগুলি বড় বড় প্রস্তর আছে। এক্ষণে পূজা প্রথমে সেই স্থানে হয়। তৎপরে পাহাড়ের পূর্ব্বদিক দিয়া উপরে উঠিবার যে পথ আছে, সেই পথে কিছু দুর উঠিলে যে স্থানে উপনীত হওয়া যায় উহাই পূজার দ্বিতীয় স্থান। স্থানটা অত্যন্ত ঢালু বলিয়া বেশী লোক একত্র তথায় থাকিতে পারে না। একদল নামিয়া আসিলে আবার একদল উপরে যাইতে পারে। পূজার স্থানে প্রায় শত হস্ত দীর্ঘ এবং প্রায় পঞ্চাশ হস্ত প্রস্থ ও তদনুরূপ উচ্চ একটি প্রকান্ড প্রস্তর আছে। উহার মধ্য দিয়া একটি গর্ভ আছে; পূজা শেষ হইলে যাত্রীগণ ঐ গর্ভের উপরে আমলকী ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়া নিচে হাত পাতিয়া থাকে। পূজারী বলেন, উক্ত আমলকী ও পুষ্প যত শীঘ্র যাহার হস্তে পতিত হয় তাহার মনস্কামনা তত শীঘ্র পূর্ণ হইয়া থাকে। আর যাহার হস্তে একবারে পড়ে না— তাহার মনস্কামনাও সিদ্ধ হয় না । পর্ব্বত-গাত্রে একটি কূপ আছে। উহার গভীরতা মাত্র দুই তিন হাত হইলেও উহার সঙ্গে একটি ঝর্ণার সংযোগ থাকায় মেলার সময় পাঁচ ছয় হাজার লোক জলপান করা সত্ত্বেও উহার জল সমভাবেই বর্তমান থাকে জলও পরিষ্কার।"

কিংবদন্তির সেই পূজারীই ছিলেন শবর সম্প্রদায়-এর মানুষ, এমনটা শোনা যায়। সেই পূজারী শবর। দেহরীর নাম ছিল কানাই। কানাই শবর। রাজা রাণী অন্তর্হিত হওয়ার পর তিনি ওই পাহাড়ে পূজোর দায়িত্ব পান। আষাঢ় মাসের

তৃতীয় শনিবারে পাহাড়ের দে হরির থানে পূজো করার প্রধান পুরোহিত ছিলেন এই কানাই শবর। পূজোর পর খড়্গ ভুল করে রেখে আসা, দুটি বাঘের দর্শন লাভ দৈব বাণী ইত্যাদি যা সব ঘটেছিল, সব এই কানাই শবরকে কেন্দ্র করে। বহু বছর আগে আনুমানিক প্রায় ৩০০ বছর আগে এই পূজোর দায়িত্ব শবর সম্প্রদায় এর কাছ থেকে মাল সম্প্রদায় এর হাতে অর্পিত হয়।

তবে শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবারের রাজা পাহাড় পূজোর দায়িত্ব শবরদের উপরেই ন্যাস্ত থাকে। এই কানাই শবর এর নাম থেকেই ক্রমশ এই পাহাড়ের নাম লোক মুখে হয়ে যায় কানাইসর, এমনটাই অনেকের মত।

কানাই + শবর > কানাই শহর > কানাইশর / কানাইসর।

বর্তমানে এই পাহাড় পুজোয় প্রায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়ে থাকে। ঝাড়গ্রাম এর পর্যটন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিগত কয়েক বছর এই জন সমাগম বৃদ্ধি পেয়েছে। পাহাড়ের পাদদেশে এবং পাহাড়ের উপরের সমতল অংশে বিবিধ মনোহারী দোকানপাট বসে। বসে চাউমিন এগরোল, ঘুঘনি, আইসক্রীম, মাংস, রুটি ও ভাতের অস্থায়ী দোকানপাট। পূজোর উপচার নিয়েও বসে দোকান। স্থানীয় খাবার শিল্পসামগ্রী ও পানীয়ের পসরা। বহু দূর-দূরান্ত থেকে মানুষজন বাইক, বাস সহ অন্যান্য গাড়ি ভাড়া করে এখানে এসে মিলিত হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে বহু মানুষ একসাথে হেঁটে, সাইকেলে কিংবা টোটো ভাড়া করে উপস্থিত হয়। সারাদিন সারারাত ধরেই এই জনসমাগম ঘটে। তৃতীয় শনিবার এর ঠিক পরের দিন অর্থাৎ রবিবারে ঝাড়খন্ডের দিকেও মেলা বসে। পূজো হয়। এটা কে বলে 'বারহাঘাট/ বারাঘাট এর মেলা'। বরাহ ঘাটি বা বন শুকরের ঘাঁটি ছিলো বলে ওই স্থানের নাম এমনটা হয়েছে বলে স্থানীয় মানুষদের অভিমত।

প্রসঙ্গত, কানাইসর পাহাড় পূজোর দায়িত্ব বর্তমানে রয়েছে অধুনা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পূর্ব সিংভূম জেলার চাকুলিয়া ব্লকের কেন্দাডাংরির ঢেঁঙ্গাম গ্রামের মাল সম্প্রদায় এর সেবাইত শ্রী সহদেব নায়েক (স্বামীজি), শ্রী রবীন্দ্র নায়েক, শ্রী গৌরাঙ্গ নায়েক এবং শ্রী দানব নায়েক মহাশয়দের হাতে। সহদেববাবু জানিয়েছেন, বংশানুক্রমে তারাই 'লায়া/দেহরী' হিসাবে এই পূজো করে আসছেন বহু যুগ ধরে। কত পুরুষ আগে থেকে এই পূজোর দায়িত্ব তারা পেয়েছেন সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলতে না পারলেও তিনি জানিয়েছেন তার বাবা, দাদু, দাদুর দাদুরও আগে থেকে তাদের বংশের মানুষ এই পূজোর সাথে যুক্ত। অনুমান করা যায় প্রায় ৩০০ বছরেরও অধিক সময় ধরে এরা এই পূজোর সাথে যুক্ত। এক সময় এই পাহাড় পূজোর দিন আগত ভক্তগণের প্রিয় খাবার ছিল লুচি, মাংস এবং কাঁঠাল।

Midnapore.in এ ঝাড়গ্রাম জেলার সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে উৎসাহী গবেষক ধ্রুব মাহাত মহাশয়। কানাইসোর পাহাড় পূজো শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, 'এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ, বিশ্বাস আছে যে যদি প্রাকৃতিক দেব-দেবীকে তুষ্ঠ রাখা যায় তাহলে সমস্ত মনস্কাননা পূরণ হবে। তাই বছরের বিভিন্ন সময়ে তারা প্রাকৃতিক দেব-দেবীর পূজা করে। তেমনই বর্ষার শুরুতে আমন ধান চাষের আগে যাতে বৃষ্টি ভালো হয়, কারণ বৃষ্টি পর্যাপ্ত হওয়া

মানেই চাষবাস ও ফলন ভালো হবে, সেই কামনার পাহাড় পূজা করে থাকে।- কানাইসোর পাহাড়ে একদা ঠাকুর-ঠাকুরাণী বাস করতেন। তাদের মধ্যে মাঝে-মাঝে অন্তর্কলহ হতো। একদিন তা চরম আকার ধারণ করলে ঠাকুরাণী রাগ করে চলে যেতে থাকেন। এমতাবস্থায় ঠাকুরও তার পিছু নেন কলহ গড়ায় পাহাড় থেকে সমতলে। জোড়াম গ্রামের পূর্বে বিরদহ মৌজার কাছে দু-জনের মুখোমুখি হয়। ঠাকুর প্রচন্ড রাগবশতঃ ঠাকুরাণীর নাক কেটে দেয়। এদিকে ভোর হয়ে যাচ্ছে দেখে ঠাকুর-ঠাকুরাণী অন্তর্ধান করেন। সেই থেকে জায়গাটি খাঁদারাণী নামে। পরিচিতি লাভ করে।"

"দেহরী প্রথমে খান্দারাণীতে পূজা করে বোম ফাটায় এরপর তারা পাহাড়ে গিয়ে পূজা করে দু-জায়গায়। উপরে অবস্থিত এক বড় পাথরের সামনে ও নীচে জামগাছের তলায় এক গুহার মুখে দাঁড়িয়ে থাকা শিলায়। শুরু থেকেই ঢেঙ্গাম গ্রামের নায়েক সম্প্রদায়ের লোকেরা দেহরী (পূজারী/লায়া) হিসাবে নিযুক্ত রয়েছে। তবে যে কেউ নিজে-নিজেই এ পূজা করে নিতে পারেন। আগত দর্শনার্থীদের অনেকেই ফল ফুল নিবেদন করে। কেউবা আবার পারিবারিক মঙ্গল কামনায় পাঁঠা, মোরগ ও পায়রা বলী দেয়।"

পাহাড়ের উপরে একটা সুড়ঙ্গ ছিল যার ভিতরে কানাই-ঈশ্বর দেবতার অবস্থান ছিল। সুড়ঙ্গের উপরে ছাউনির আকারে একটি বড় পাথর ছিল। এই দেবতার নাম অনুসারেই পাহাড়ের নাম 'কানাইসোর'। এখানে প্রাচীনকাল থেকেই এই দেবতার পূজা করা হতো রাতে। পূজার নিয়মানুসারে রাতে পূজার পর দেহরীরা সুড়ঙ্গ ছেড়ে বেরিয়ে আসলে পুনরায় সেখানে যাওয়া বারণ। কারণ ঠাকুর নাকি এ সময় পূজার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করতে আসেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কোন এক সময়ে দেহরীরা পূজা শেষে নীচে এসে পূজা করার সময় দেখেন যে খড়্গ উপরে ছেড়ে এসেছে। সাত-পাঁচ না ভেবেই দেহরীদের একজন খড়্গ নিয়ে অসার জন্য উপরে যায়। বাকীরা তাকে পিছন থেকে পূজার নিয়ম স্মরণ করিয়ে ডাকলেও তা তিনি শুনতে পাননি কারণ এই দেহরীরা বংশ পরম্পরায় কালা যা বর্তমান প্রজন্মেও লক্ষ্যণীয়। উপরে গিয়ে তিনি দেখেন ঠাকুর স্বয়ং প্রসাদ খাচ্ছেন। তাকে দেখে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন কে তুমি ? উত্তর আসে আমি দেহরী, ঠাকুর বলেন আমার সেবক বলে জীবন দান দিলাম খড়্গ নিয়ে যাস আজ থেকে এখানে আমার দশন আর কেড পাবে না। এই বলে ঠাকুর তার ঘাড় মটকে রাস্তার দিকে ঘুরিয়ে দেয়। বাকি জীবন তিনি ঐ অবস্থায় অতিবাহিত করেন। পরের দিন দেহরীরা গিয়ে দেখেন যে সুড়ঙ্গের উপরের ছাউনির পাথরের একটা বড় অংশ পড়ে গিয়ে সুড়ঙ্গের প্রবেশ পথ বন্ধ হয়ে গেছে সেই থেকে সুড়ঙ্গের মুখে পড়ে থাকা বড় শিলা বা পাথরেই পূজা

হয়।"

'জলদর্চি' পত্রিকার ইন্টারনেট সংস্করণ এর "পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক উৎসব, পর্ব- ২৭ (৩ জুলাই, ২০২২) তে লোকগবেষক ভাস্করব্রত পতি উল্লেখ করেছেন:

কানাইসর নামের মধ্যে দুই দেবতার খোঁজ মেলে। কানাই + সর > কানাইসর। 'কানাই' অর্থে শিব। আর 'সর' অর্থে দুর্গা। এই কানাইসর পাহাড়ের একটি অংশকে বলে 'রাজা' পাহাড়। আর একটি অংশকে বলে রাণী পাহাড়। শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবার রাজা পাহাড়ে কানাইবাবার তথা শিবের পূজা হয়। মুরগী ও পাঁঠাবলি হয়। এই পূজাতে কোনো মহিলার প্রবেশ নিষিদ্ধ। এমনকি এই পূজার প্রসাদও মহিলাদের খাওয়ার বিধান নেই। বিশেষ করে যেসব মহিলাদের এখনো বিয়ে হয়নি বা যাদের বাচ্চা হওয়ার বয়স রয়েছে তাঁদের এই প্রসাদ দেওয়া যাবে না। শুধুমাত্র যেসব মহিলা আর সন্তানের মা হবে না, তাঁরাই খেতে পারে। ডুলুং নদী পেরিয়ে নিয়েও যাওয়া যাবেনা কানাইবাবার প্রসাদ। নদীর এপারেই খেতে হবে। কানাইবাবার পূজক হলেন খেড়িয়া শবর গোষ্ঠীর মানুষ কেন্দ্রাপাড়ার সন্তোষ শবর। তিনিই মূল পূজক।

আর রাণী পাহাড়ে আষাঢ়ের তৃতীয় শনিবার সর মায়ের তথা দুর্গা মায়ের পূজা হয়। এই পূজার পূজক হলেন ঢেঙ্গাম গ্রামের সহদেব নায়েক। এখানে পাঁঠার পাশাপাশি মুরগি বলিও দেওয়া হয়। লুচি, মাংস ও কাঁঠাল খাওয়ার প্রাচীন চল রয়েছে এখানে। আসলে বর্ষার শুরুতে ভালো চাষের আশায় বৃষ্টির কামনায় পাহাড়পূজায় শামিল হন মানুষজন। প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট রাখার ভাবনায় পাহাড় পূজা। এই কানাইসর পাহাড়ের অর্ধেক অংশ পড়ে বেলপাহাড়ী ব্লকের সন্দাপাড়া পঞ্চায়েতের মধুপুর মৌজায়। বাকিটা পড়ে ঝাড়খণ্ডের চাকুলিয়া ব্লকের মধ্যে। দুই রাজ্যের সীমান্তে কয়েক বর্গমিটার জুড়ে পাহাড়টির অবস্থান।

কানাইসর পাহাড়পূজাতে ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন মৌজার মানুষ ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত থাকেন। সেই গ্রামগুলি হল দুয়াল্লিশোল, জয়নগর, তুলসীবনি, শালগেড়িয়া, জোড়াআম, কিয়াশোল, বিদাহ, ভাণ্ডারু, বৈকুন্ঠপুর, শিলাখুলি, দুবরাজপুর, পচাপানি, বেহারপুর সহ আরো তিনটি গ্রাম ডেঙ্গাআম, লুহামাইলা ও বরালটা। এই মৌজাগুলির প্রতিটির একজন করে গ্রামপ্রধান পূজার কমিটিতে আছেন। এঁদের মধ্যে প্রধান নির্বাচিত করা হয়েছে (২০১৬) জয়নগরের সমায় মাণ্ডিকে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের যেসব গ্রামের মানুষ এই পাহাড়পূজায় যুক্ত থাকেন সেগুলি হল শিলদা, মধুপুর, সীতাপুর, ঝেঁটাড়া, কেন্দাপাড়া, চুটিয়াভদরি, মুনিয়াদা, খাঁকড়িঝর্ণা, ডুমুরিয়া এবং বাগালপাড়া। এগুলির মধ্যে খাঁকড়িঝর্ণা গ্রামের দেওয়া পাঁঠা প্রথম বলি দেওয়া হয়।

পাহাড়পূজায় এখানে মূলতঃ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ উপচার পালন করেন। আবার মুণ্ডাদের আরাধ্য দেবতা 'সিংবোঙ্গা' আসলে পাহাড় দেবতা। তাঁরা আষাঢ় মাসে কানাইসর পাহাড়ে পাহাড় দেবতার পূজা করলেও মুণ্ডা কিশোরীদের 'কানফোঁড়' অনুষ্ঠান করে ১লা মাঘ। যা 'টুকাই লুতুর' নামে পরিচিত। বাগাল সম্প্রদায়ের লোকেরা এই ১লা মাঘ আইখান দিনে পাহাড় পূজা করে। এজন্য তাঁরা উইঢিপি কেটে এনে পাহাড়ের প্রতীক হিসেবে শুদ্ধাচারে পূজা করে ফুল, ফল, সিঁদুর সহ হাঁড়িয়া নিবেদনের সাথে সাথে বলিদানের মাধ্যমে। এঁরা

পাহাড়পূজা করে গবাদি পশু যাতে না হারিয়ে যায় এবং রোগাক্রান্ত না হয় এই কামনায়। কালো পাঁঠাবলি দিয়ে সেই পাঁঠা ও খিঁচুড়ি সহযোগে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এইদিনে মুণ্ডাদের মতো বাগাল কিশোরীদের কানফোঁড় করার উত্তম দিন বলে বিবেচিত। ঐ কিশোরী নতুন কাপড় পরে আলপনা দেওয়া মাটির মেঝেতে রাখা কাঠের সিঁড়ি 'মারুয়া'তে বসে। আর দেহরীর অনুমতি নিয়ে বেলকাঁটা দিয়ে কানফোঁড় করা হয়। আর একজন ঘরের চালে উঠে পিঠা ছড়ায় সেখানে। ফোঁড় শেষ হলে সেখানে রাখা একটা জ্যান্ত মুরগিকে আছড়ে মেরে ফেলা হয় কিশোরীর মঙ্গল কামনায়। এইদিনে বাগাল সম্প্রদায়ের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জোড় বা প্রণাম করে।"

"কানাইসর পাহাড়ের নিচে বসে বিশাল মেলা। বিভিন্ন এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন আসেন। অন্য সম্প্রদায়ের লোকজনও এখন আসছেন। দুদিনের মেলা। প্রথম দিন সকলের জন্য খোলা। দ্বিতীয় দিন শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষজন আসেন। মেলায় দেদার বিক্রি হয় কাঁঠাল, জিলিপি, বাদ্যযন্ত্র, পাথরের সামগ্রী থেকে হাঁড়িয়া, মদ বিয়ার ইত্যাদি। ভাত খাওয়ার হোটেল বসে যায়। বহু দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসেন এখানে। ভিড়ে ভিড়াক্কার হয়ে ওঠে কানাইসর সংলগ্ন এলাকা। 'ঘঙ' পাতার টুপি এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ। বারোডাঙা, মালিবনি গ্রামে এগুলো তৈরি হয়। এ এক অন্য ধরনের লৌকিক উৎসব। একটা আস্ত পাহাড় হয়ে ওঠে উপাস্য দেবতা।"

বাংলা দৈনিক সংবাদ পত্র 'একদিন' পত্রিকায় ৫ই জুলাই, ২০২২ স্থানীয় ইতিহাস কৃষ্টি, সংস্কৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু গবেষক অরূপ ঘোষ মহাশয় 'বেলপাহাড়িতে কানাইসর পাহাড় পূজোয় অসংখ্য মানুষের সমাগম' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন এ বলেছেন— "এই কানাইসোর পাহাড় পূজো অনেক প্রাচীন। মূলত এখানকার আদি জনজাতি বাসিন্দারা চাষবাসের আগে প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করতে এই পাহাড়ের পূজো করে থাকেন। এঁদের লোকবিশ্বাস মতে এই পাহাড় পূজো করলে চাষবাস ভালো হবে। অতিবৃষ্টিতে কেউ বানভাসি হবে না। হড়কাবান হবে না। তাই চাষবাস শুরু করার আগে কৃষিজীবী সবাই পাহাড়ে পূজো দেন।"

বহু বছর আগে এলাকার প্রবল বন্যায় ঘরবাড়ি, গরামথান বা গ্রাম রক্ষার দেবতা সমস্ত কিছু ভেসে গিয়েছিল। পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী ঢেঙ্গাম গ্রামের বাসিন্দারা সেই সময় পাশাপাশি অন্যান্য গ্রামবাসীদের সঙ্গে সভা করে তবে গ্রাম রক্ষার দেবতাকে এই পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত করেন সেই সময় থেকেই এই পাহাড়ে ঢেডাম গ্রামের মাহাদি সম্প্রদায় পূজারী হিসেবে রয়েছেন। শনিবার এই পাহাড় পূজো অনুষ্ঠিত হয় এই পাহাড় পূজা অনুষ্ঠান দু দিন ধরে চলে। একে কেন্দ্র করে ওখানে মেলা হয়। দূর-দূরান্ত থেকে আত্মীয়-স্বজন ও কুটুম লোকজন ওই এলাকায় হাজির হয়েছেন। অন্যান্য গরানথানে পোড়া মাটির হাতি গড়া মূর্তি উপবিষ্ট করে রাখার

মত এই পাহাড়েও সেই মূর্তি রেখে পূজো করা হয়। পূজোর মুরগি বা ছাগ বলি প্রথা প্রচলিত রয়েছে। ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি থেকে এই পাহাড়ের দূরত্ব প্রায় ৯ কিমি। চাকুলিয়া রেলস্টেশন থেকে এই পাহাড়ের দূরত্ব প্রায় ১১ কিমি। বিনপুর ২ ব্লকের সোন্দাপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের সীমান্তবর্তী কেন্দাপাড়া রাঙামাটি, ডুমুরিয়া ও সীতাপুর এই গ্রামগুলির একেবারে পাহাড়ের পাশে অবস্থিত। পাহাড় পূজো ঘিরে এখানে বড় আকারের মেলা বসেছে। এই মেলাতে লোক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমস্ত রকমের বাদ্যযন্ত্র ও কৃষি কাজের নানান সামগ্রী পাওয়া যায়। পাহাড় পূজোর পরের দিন রবিবার পাশেই কেবলমাত্র আদিবাসীদের বারাঘাটে পৃথক পাহাড় পূজো ও আচার অনুষ্ঠান পালিত হয়। আদিবাসীদের নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।' বঙ্গাবুরু বা পাহাড় পূজো পালন করা হয়। তাই রবিবারের আদিবাসীদের পাহাড় পূজোর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শনিবার থেকেই দূর দুরান্ত থেকে লোকজন এই পূজোর জন্য আত্মীয় বাড়িতে এসে থাকছেন।

আবার, কানাইসর পাহাড় পূজো সম্পর্কে সদ্য প্রকাশিত "মুসাফিরের চোখে ঝাড়গ্রাম" গ্রন্থে ঝাড়গ্রাম জেলার ইতিহাস জন জীবন কৃষ্টি সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীর ভাবে অনুসন্ধিৎসু লেখক অরুণাভ দত্ত লিখেছেন "... ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ি (বিনপুর- ২) ব্লকের একদম শেষ প্রান্তে, ঝাড়খন্ড রাজ্যের গা ঘেঁষে কানাইসর পাহাড়ের পাহাড়পূজো শুধু প্রাচীনই নয়। ঐতিহ্যশালী ও বটে। প্রত্যেক বছর আষাঢ় মাসের তৃতীয় শনিবার কানাইসর পাহাড়ে অনুষ্ঠিত হয় এই পাহাড় পূজো। ... হেঁটে যেতে যেতেই দূর থেকে কানাইসর পাহাড়ের ওপরে অসংখ্য মানুষ দেখতে পাচ্ছি। এতো মানুষ তখনই পাহাড়ের এতো ওপরে উঠে গেছে দেখে অবাক হলাম। পাহাড়ের নীচে যেতেই দেখলাম মেলার মত প্রচুর অস্থায়ী দোকান বসেছে। যেকোনো জায়গায় গেলে এই মেলা দেখতে আমার সব চেয়ে ভালো লাগে। চেনা জিনিস এর সঙ্গে প্রত্যেকবারই অচেনা অজানা বহু নতুন জিনিস চোখে পড়ে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হবে না জেনে ভেতরে ভেতরে একটা উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। তেলেভাজা, ঘুঘনি, চাউমিন, রোল, জিলিপি, বিভিন্ন ধরণের মিষ্টিসহ অসংখ্য খাবারের দোকান। আর একটা জিনিস চোখে পড়ল বরফের আইসক্রীম। কতজন যে বরফের আইসক্রীম বিক্রি করছে তার হিসেবে নেই। এই তীব্র গরমে সেই বরফগোলা আইসক্রীমের বিক্রিও জবরদস্ত। খাবারের দোকান বাদ দিয়ে আছে পানীয়ের দোকান। পাহাড়পূজো দেখতে আগত দর্শনার্থীদের স্বাগত জানাতে অসংখ্য দোকান তাদের দেশী বিলেতি পানীয়ের পসার সাজিয়ে বসে আছে। সেই সঙ্গে আছে পানীয়ের চাট। বিভিন্ন ধরণের চাটের গন্ধে মেলা প্রাঙ্গন ম-ম করছিল। এ এছাড়া আছে বিভিন্ন জিনিসের দোকান। কি নেই সেখানে সেটাই বলা মুশকিল, বাচ্চাদের খেলনা থেকে শুরু করে, আয়না লোহার বিভিন্ন জিনিস পত্র গাথা, ঝুড়ি, প্লাস্টিকের জিনিস, বিভিন্ন ধরণের গ্রাম্য বাদ্যযন্ত্র, কাঠের জিনিস, পাথরের বিভিন্ন জিনিস পত্র, তালিকাটি দীর্ঘ। ঝাড়গ্রামে প্রথম কোনো মেলায় তীর ধনুক বিক্রি করতে দেখলাম।"

সুতরাং কানাইসর পাহাড় এবং এই পাহাড় পূজো কে কেন্দ্র করে যে সব জনশ্রুতি, লোক বিশ্বাস ইত্যাদি জড়িয়ে আছে বিভিন্ন গল্পে গানে সাহিত্যে উৎসব অনুষ্ঠানে তার কোনটি সত্যি আর কোনটি সত্যি নয়, সেই তর্ক দূরে সরিয়ে

রাখা ভালো ।বরং এই অঞ্চলের এই পাহাড় এবং পাহাড় পূজো কে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলের মানব গোষ্ঠীর মধ্যে যে সকল বিবিধ আচার অনুষ্ঠান রীতি নীতি বিশ্বাস ইত্যাদি জন্ম নিয়েছে তার মধ্যে যেমন এই অঞ্চলের বহমান সংস্কৃতির ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনই খুব ভালো ভাবে গবেষণা পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করলে এই সকল সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির ধারক-বাহকদের আদিম ইতিহাসের বিভিন্ন দিক উন্মোচন করা সম্ভব। এমনকি এই পাহাড় পূজো কে কেন্দ্র করে পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের জনবসতির আদিম ইতিহাসের অসংখ্য নিদর্শন ও ইতিহাসে উপাদান খুঁজে বের করা সম্ভব বলেই প্রতীয়মান হয়। এবং এই সকল পাহাড় পূজো বহু প্রাচীন। এই পাহাড় পূজো কে কেন্দ্র করে মানুষের আবেগ শ্রদ্ধা তথা পূর্ব পুরুষদের প্রতি আধুনিক মানুষের ভালোবাসা, আত্ম নিবেদন ও হার্দিক তর্পণ উপলব্ধি করা যায়। প্রসঙ্গ ক্রমে আরো একটি বিষয় অনুমান করা যায়, বর্ষার প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত কানাইসর তথা অপরাপর পাহাড় পূজোর মিলন উৎসবে মানুষ তার নিজের কাছে সংরক্ষিত আগামী কৃষি কাজের উপযোগী ফসলের বীজ-এর আদান প্রদান তথা বিনিময় ও করত। হতো কৃষি কাজ সংক্রান্ত বিবিধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আদান প্রদান। কৃষি কাজের উপযোগী পশু ও যন্ত্রপাতির বিনিময় হওয়াটাও অস্বাভাবিক ছিল না। এবং কৃষিভিত্তিক মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন এর এক ধারাবাহিক অকথিত ইতিহাস যে এই উৎসবের পরতে পরতে মিশে আছে, সে কথা বেশ দৃঢ়তার সাথে বলা যায়।

সাইবানি: ঝাড়গ্রামের একটি বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ

রাজেন্দ্র প্রসাদ দে

এমন একটা সময় ছিল ঝাড়গ্রামের সবথেকে পরিচিত আগাছা ছিল সাইবানি। এমন কোনও পতিত জায়গা ছিল না যেখানে সাইবানি লাটায় ঝোড় হয়ে থাকত না। বাড়ির বেড়ায়, অনেকদিন ফাঁকা পড়ে থাকা বাড়িতে বা যেকোন রাস্তার দুপাশে সাইবানি লাটার ঝোপ একটি অতি সুপরিচিত দৃশ্য ছিল। তার সৌন্দর্যই আলাদা ছিল। এই ঝোপগুলো ভরে থাকত অজস্র থোকা থোকা হলুদ আর কমলা ফুলে। অন্য জায়গাতেও এই গাছ ছিল তবে ঝাড়গ্রামে এর যে প্রাচুর্য আর এখানের লাল প্রান্তরে বা মোরাম রাস্তার পাশে হলুদ-কমলা ফুলের বর্ণবিন্যাসে যে নয়নাভিরাম রূপ সৃষ্টি হত তার তুলনা হয় না। এটা এমনই না-চাইতেই পাওয়া যে তখন এর সৌন্দর্য অবহেলিতই থেকে গেছে। তখন মনে হত এটি একটি বিরক্তিকর আগাছা। কিছুতেই দূর করা যায় না।

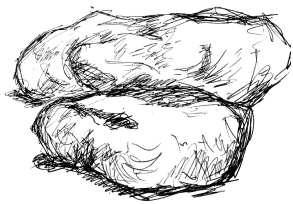

গাছটি বিদেশি। এর আদি বাসস্থান মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার ক্রান্তীয় অঞ্চল। রক্সবার্গ লিখেছেন ডব্লিউ হ্যামিলটন ১৮০৯-এ আমেরিকা থেকে এই গাছটি শিবপুর উদ্ভিদ উদ্যানে এনেছিলেন। ১৯০৩-এ রচিত ডেভিড প্রেন-এর বেঙ্গল প্ল্যান্টস বইতে এর কোনও বাংলা নাম নেই। কিন্তু সেই সময়েই এটি বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। গিরীশচন্দ্র বসুর ১৯২৫-এর উদ্ভিদ-জ্ঞান থেকে জানা যায় তখন লোকের ধারণা ছিল যেখানে এই গাছ থাকে সেখানে ম্যালেরিয়া হয়। সে জন্য সেইসময় এর নাম হয়েছিল ম্যালেরিয়া ফুল। ১৯৪১-এ বিভূতিভূষণের অভিযাত্রিকে এটি এই নামেই উল্লেখিত। অবশ্য ম্যালেরিয়া হবার এই ধারণাটি ভুল।

ঝাড়গ্রামে এর প্রধান নাম ছিল সাইবানি। সাইবানি নামে গ্রামের নাম আছে নারায়ণগড়ে। এই নামের কয়েকটি ভেদ আছে যেমন, সাঁইবনি বা সাইবান্তি। কেউ কেউ কিরকিটি বলে, যদিও এই নামটি আসলে কুচিকাঁটার (*Mimosa rubicaulis Lam.*)। বর্তমানে অনেকে কুটুস, পুটুস বা পিটিস বলে। ঝাড়গ্রামের উপকণ্ঠে কুটুসগেড়িয়া বলে একটা গ্রামও আছে। বেলপাহাড়িতে আবার কুটুসের বদলে কুটিস বলে। এর একটা পুষ্পবিন্যাসে নানা রঙের ফুল থাকে বলে বিনপুর অঞ্চলে একসময় এটি নানাজাতি নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ধেড়ুয়ার দিকে একে ভরভরি বলতেও শোনা গেছে। এর প্রতিযোগী ভুরভুরি বা পুরুগাছের সঙ্গে সাদৃশ্যের জন্য, কারণ এই ভুরভুরি গাছের (*Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob.*) একটি নাম ভরভরি। সেই সূত্রে শালবনির দিকে এটি হয়েছে ভুরভুতি বা ভুরভুটি। এই নামটির উৎস ভূতভৈরবও হতে পারে।

প্রধানত বাঁকুড়ায় এর নাম ভূতভৈরব। ঝাড়গ্রামেও কেউ কেউ বলে। সাঁওতালিতে ভুতভৌরব বলে। নয়াগ্রামের দিকে আবার সব সাইবানিকে ভূতভৈরব বলে না, কম কাঁটাযুক্ত গোলাপি ফুলের সাইবানিকেই বলে। ভূতভৈরব বলার কারণ অবশ্য অন্য। সাইবানির আগেই ভূতভৈরবী নামে গণিয়ারি (*Premna serratifolia L.*) পরিচিত ছিল। পরে এই গাছটি আসায় কিছু একটা সাদৃশ্য থাকায় একেই ভূতভৈরব বলা শুরু হয়। আসলে দুটো গাছই একই গোত্রের। আবার অনেকে লাটিমগাঁদাকেও (*Leonotis nepetifolia (L.) R.Br.*) ভূতভৈরবী বলে কারণ এর ফুলের সঙ্গে সাইবানির বেশ মিল আছে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের দক্ষিণ অংশে সাইবানি গুয়েগাঁদা বলে পরিচিত ছিল। উত্তরবঙ্গে প্রধানত দিনহাটার রাজবংশীরা একে উদরভুসি বলেন। কোথাও কোথাও বিদেশি বলে এর নাম জার্মানলতা।

বইতে অনেক সময় এর নাম লেখা হয় চোতরা বা চোত্রা। আসলে চোতরা (*Dendrocnide sinuata (Blume) Chew*) হল একরকম বিছুতি, উত্তরবঙ্গে পাওয়া যায়। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে যার নাম চোতড়া। মনে হয় সাধারণ বিছুতির পাতার সঙ্গে সাদৃশ্যের জন্য সাইবানিকে চোতরা বলা হয়। বৈজ্ঞানিক নামের থেকে এটি অনেক সময় ল্যানটানা বা ল্যানটানা ক্যামেরা নামে পরিচিত। গিরীশচন্দ্র বসু বানানটা লিখেছেন লানটেনা। ইংরেজিতে এর নাম *Common lantana* বা *Lantana*।

নামের আধিক্য থেকেই বুঝতে পারা যায় একসময় এই গাছটি কী বিপুল

সংখ্যায় সর্বত্র ছিল।

উদ্ভিদবিজ্ঞানে গাছটি দুরন্ত গোত্রের (*Verbenaceae*)। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Lantana camara subsp. aculeata (L.) R.W.Sanders*। আগে এর নাম ছিল *L. camara var. aculeata (L.) Moldenke* ও *L. aculeata L.*। বড় ঝোপাল গুল্ম, গোটা গাছটাই কর্কশ এবং শক্ত রোম ও বাঁকানো কাঁটাযুক্ত। গাছে বিশেষ একরকম গন্ধ থাকে। কাণ্ড চারকোণা, কাঁটাযুক্ত। পাতা বিপরীত, ডিম্বাকৃতি, খাঁজকাটা, ডগা সুচালো, কর্কশ। ফুল গুচ্ছাকারে থাকে। মাঝের অপরিণত ফুলগুলি হলুদ, ধারের গুলো কমলা। ফুল একটু ছোঁয়া লাগলেই ঝরে যায়। একসঙ্গে অনেকগুলো গোল-গোল ছোট ছোট মটরের মতো ফল ধরে, পাকলে কালো। এর আর একটি জাত আছে যেটা একটু কম পাওয়া যেত। এর কাঁটা কম, পাতাগুলো একটু বড় আর ফুল হলুদ-কমলার বদলে হলদেটে সাদা-গোলাপি।

এই গাছটি বেড়া দেবার কাজেও ব্যবহৃত হত। অনেক বাড়ির বাঁশের বেড়াতেও এটি দেখা যেত। ডালপালা জ্বালানি হত। বাচ্চারা খেলার সময় এর পাতা পান করত, তার সঙ্গে এর পাকা ফলও দিয়ে চেবাত। অনেকে দাঁত লাল করার জন্য এর পাতা বা ফল কুড়চি ছালের সঙ্গে চেবায়। বাচ্চারা এর পাতা, ফুল ও ফল খেজুর পাতার টুকরো আর শিমুল কাঁটা দিয়ে পানের মতো চেবায়, এর ফলে দাঁত ও মুখ লাল হয়। তবে এর পাতা ও ফল ঠিক খাদ্য নয়, হিতে বিপরীত হতে পারে। পাতা কর্কশ বলে এর পাতা দিয়ে বাচ্চারা চুল আঁচড়াত। আর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, এর ডাল মাস্টারমশায়রা ছাত্রদের ঠ্যাঙাতে ব্যবহার করতেন। বৃহত্তর দুরন্ত গোত্রীয় অন্যান্য কিছু গাছের মতো এর ডালের দুটি খণ্ড ঘষে আগুন জ্বালানো হয়। এককালের অরণী বা অগ্নিমন্থও (*Premna*-র কয়েকটি প্রজাতি) এই জাতীয় উদ্ভিদ। ঘেঁটু (*Clerodendrum infortunatum L.*) ডালও এভাবে আগুন জ্বালাতে ব্যবহৃত হত।

স্থানীয় ভেষজ ব্যবহারও একটি আছে। লোধারা এর পাতা জলে চটকে শরবত তৈরি করে। এই শরবত অর্শ হলে দিনে একবার করে খায়।

প্রকৃতিতে কমে গেলেও এর অন্য কয়েকটি জাতি বাগানের শোভা বর্ধন করছে।

এর স্বর্ণযুগ ছিল ষাট থেকে আশির দশক। জঙ্গলের কেটে ফেলা অংশেই এরা আধিপত্য বিস্তার করে। নতুন সহস্রাব্দের সূচনা থেকে এটি কমতে শুরু করে। তবে মানুষ এর অন্যতম কারণ হলেও আসল কারণ নয়। এই বিলুপ্তি প্রাকৃতিক। এর প্রধান কারণ এর শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ভুরভুরি গাছের বাড়বাড়ন্ত। ঠিক যেখানে যেখানে সাইবানি হত ঠিক সেই জায়গাগুলো এটি দখল করে। তারপর সাইবানির বদলে চারদিকে ভুরভুরি গাছ দেখা যায়। বর্তমানে মনে হয় সেই ভুরভুরি বা

পুরুও পরাজিত হয়ে গেছে।

আজ সাইবানি গাছের সঙ্গে সাইবানি নামটাও লুপ্ত হতে চলেছে। নতুন প্রজন্মের কাছে এই গাছ ও নাম দুটোই অপরিচিত। কিন্তু এককালে ছিল। এই নাম এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে এর অনুকরণে অন্য একটি গাছের নাম রাইবানি রাখা হয়েছিল। একসময় যা ঘরের পাশে পাওয়া যেত, এখন তা বনে-বাদাড়ে খুঁজে বেড়াতে হয়। শহরের মাঝে একেবারেই নেই। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, ঝাড়গ্রামের একসময়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য রচনায় সাইবানির ভুমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

কুড়মালি টোটেমবাদের আলোকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

রাকেশ সিংহ দেব

কথায় আছে- "বহু কাঠে মহুল সিঝে / আর বহু কথায় কুড়মি বুঝে।" কিন্তু, এই লেখা শুধুমাত্র কুড়মিদের জন্য নয় বরং আপামর বাংলা ভাষাভাষী সমস্ত মানুষের জন্যও। তাই যৎসামান্য কথায় তুলে ধরবার চেষ্টা করব জঙ্গলমহলের ভূমিপুত্র সুদীর্ঘকালের এই টোটেমিক উপজাতি প্রসঙ্গে। যারা এই প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় থেকেও তাদের ভিন্নতর সমাজ, ভিন্নতর ভাষা বৈভব ও সংস্কৃতি সগর্বে বহন করে চলেছে। তাদের নেগ-নেগাচার, আচার-বিচার, কথা ও অন্যান্য সবকিছু নিয়ে কুড়মি ও কুড়মালি ভাবধারা। যারা আজও নিজেদের অক্লেশে সমর্পণ করে প্রকৃতির কোলে। তাদের চোখে প্রকৃতির বাইরে কোনও কিছুই নয়, না দেব-দেবী না পরব তেওহার আর না নেগ-নেগাচার। তাই তাদের জীবন বোধ ও শৈলী আবর্তিত হয় এই একক কুগুলি জুড়ে। এদের মূল আবাসভূমি শিখ শিখর নাগপুর আধাআধি খড়্গপুর। সম্পূর্ণ এলাকাটাই বনজঙ্গল, পাহাড়, ডাহি, ডুংরি, নদী নালা দিয়ে আবৃত। এ কারণে কৃষি প্রধান কুড়মিরা তাদের জীবিকার ব্যাপারে অনেকাংশে অরণ্যের উপর নির্ভরশীল। শুধুমাত্র জঙ্গলমহল নয় সমগ্র ছোটনাগপুরের টোটেমিক কুড়মিদের সঙ্গে প্রকৃতির একটা আলাদা সহাবস্থান রয়েছে। তারা তাদের জীবনযাপন, সংস্কৃতি ও মননে এক উন্নত পরিবেশ চেতনা লালন করে। হিন্দুদের মতো কুড়মি জাতির মধ্যে গোত্রের প্রচলন নেই, রয়েছে গোষ্ঠীর প্রচলন। বৈদিক গোত্রগুলি যেমন বিভিন্ন মুনি ঋষির নামে হয়ে থাকে সেখানে কুড়মি গুষ্টি বা গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি এবং উপাদানকে তাদের গোষ্ঠীর টোটেম বা প্রতীক রূপে গ্রহণ করেছে। প্রত্যেক গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট প্রতীক বা টোটেমগুলি তাদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। টোটেম হল সেই প্রতীক যা দিয়ে টোটেমিক আদিবাসীদের বংশ বা কুল চিহ্নিত হয়। টোটেম-এর উপাদন বা চিহ্নগুলি গোষ্ঠী বা কুলের প্রতীক পূর্বপুরুষদের স্মৃতি বা তাদের গৌরবময় কিংবদন্তীগুলির সাক্ষ্য বহন করে।

টোটেম-এর অর্থ Webster's Dictionary-তে বলা হয়েছে "A natural object usually an animal that serves as a distinctive, often venerated emblem or symbol, It is a means of personal or spiritual identity."

Oxford Advanced Learner's Dictionary-এর মতো টোটেম-এর অর্থ "A natural object or animal that is believed by a particular society to have Spiritual significance and that is adopted by it as an emblem."

অর্থাৎ, টোটেম আসলে কুলচিহ্ন। নৃতত্ত্ববিদদের মতে বিশ্বের সব নরগোষ্ঠীকেই ক্রমবিবর্তনের ধারায় অনেকগুলি স্তর অতিক্রম করে আসতে হয়েছে। টোটেম হচ্ছে সকল মানবগোষ্ঠীর প্রাথমিক পর্যায়। আধুনিক মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের জনক হিসেবে পরিচিত Sigmund Freud তাঁর 'Totem and Taboo' শীর্ষক প্রবন্ধ সংকলনে টোটেম-এর সামাজিক এবং নৃতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মানুষের গোষ্ঠীগত অর্থাৎ পরিবারভিত্তিক রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়তার বন্ধনযুক্ত যে প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, তাকে নৃবিজ্ঞানীরা টোটেম নামে অভিহিত করেছেন। শিকারজীবী জীবনযাপন স্তরে এর উদ্ভব। প্রধানত বিভিন্ন পশু পাখির নামে একেকটি গোষ্ঠী নামাঙ্কিত হতো। প্রাথমিক পর্যায়ে টোটেম উল্লিখিত জীবটি ছিল সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর জীবনধারণের একমাত্র উপায়। পরবর্তীকালে বিকল্প খাদ্যের সংস্থান নিশ্চিত হলে টোটেমটি ওই গোষ্ঠীর জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তখন টোটেম হয়ে ওঠে তাদের পূর্বপুরুষ এবং স্বগোষ্ঠীর এক অভ্যন্ত আপনজন ও কল্যাণকামী। এরফলে টোটেম গোষ্ঠীতে দুটি ক্ষেত্রে ট্যাবু বা বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। প্রথমত, বিভিন্ন টোটেম নামাঙ্কিত গোষ্ঠীতে টোটেম পশু আহত, হত্যা এবং ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, ট্যাবু-ভঙ্গজনিত সামাজিক শাস্তির ব্যবস্থা। টোটেম কেবল নিরীহ বা হিংস্র জীবজন্তুই নয়, ছোট উদ্ভিদ থেকে বিশাল বৃক্ষ পর্যন্ত টোটেম হিসেবে বিবেচিত হতে দেখা যায়। Totemism can also be defined as a complex of Varied ideas and wasy of behavior based on a world view drawn from nature (Dagba, 2013)

আধুনিক নৃতত্ত্ববিদগণ মনে করেন আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির টোটেম আসলে তাদের জীবনযাত্রার সাথে প্রকৃতির অন্তবর্তী সম্পর্ককে কেন্দ্র করে আবৃত হয়। এই টোটেম এর ধারণা তাদের সাথে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, পশু পাখি এবং প্রাকৃতিক উপাদানগুলির মধ্যবর্তী সম্পর্কগুলির যোগসূত্র রক্ষা করে। টোটেম-এর ধারণা মানুষের সাথে প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যেভাবে সহজ যোগসূত্র রক্ষা করে তা আসলে টোটেমিক মানুষজনের মধ্যেকার সর্বপ্রাণবাদ তত্ত্ব-এর উপস্থিতির বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই সর্বপ্রাণবাদ তত্ত্ব-এর মূল বিষয়বস্তু হল আমরা সবাই প্রকৃতির সন্তান এবং প্রাকৃতিক সমস্ত কিছুর মধ্যেই অন্তনিহিত রয়েছে আত্মা এবং আত্মিক বন্ধন সর্বপ্রাণবাদী আদিবাসী সমাজে বস্তুপূজা এবং বৃক্ষপূজার প্রচলন আছে। তাদের বিশ্বাস ভূতাশ্রিত বা দেবতাশ্রিত বস্তু বা বৃক্ষপূজার মাধ্যমে তারা সংশ্লিষ্ট ভূত বা দেবতার পূজাই করে থাকে। শাল, করম, মহুল, আম, পলাশ, তুলসী, বেল, বট, পাকুড় প্রভৃতি বৃক্ষ পূজিত হওয়ার মূলে সংশিষ্ট দেবতাদের অধিষ্ঠানকে কল্পনা করা হয়। এই বিশ্বাসে নদ-নদী, পাহাড়-

পর্বতও মানুষের পূজা পেয়ে থাকে।

"শাল মহুল সারি সারি / তর কলেই গো জনম লিলি
গাছপালা মায়েরই সমান / গাছতলে গাঁয়েরই গরাম।"

ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকায় গরাম থান ছাড়া কোন কুড়মি গ্রামের অস্তিত্ব নেই। সাধারণত গ্রামের একপ্রান্তেই গরাম থান গড়ে ওঠে। গরাম থানের জায়গাটি বড় বড় গাছ এবং ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ থাকে। আসলে যখনই কুড়মি জনজাতির মানুষ গ্রাম পত্তন করেছে, তখন প্রথমেই গরাম থান প্রতিষ্ঠা করে পূজো দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে জমি তৈরির কাজ শুরু করেছে। সারা গ্রাম জুড়ে বসত বাড়ি এবং জমি তৈরি করা হলেও গরাম থানের চারপাশের বেশ কিছুটা জায়গা অবিকৃত রেখে দেওয়া হয় আদিমতার স্মারক হিসেবে। পরিবেশবিদদের ভাষায় এই অঞ্চলগুলিকে বলা হয় Sacred groves বা পবিত্র বনভূমি। আমাদের ঝাড়গ্রাম জেলার ডুলুং নদী তীরবর্তী চিল্কিগড়ের 'কনক অরণ্য' এরকম এক পবিত্র বনভূমি। এই পবিত্র থান অঞ্চল ঠাকুরের এলাকা বলে এখানে গাছ কাটা নিষিদ্ধ। সাধারণত কেউ এই এলাকায় বসবাসরত পশু পাখিদেরও কোন ক্ষতি করে না। এরফলে গরাম থান অঞ্চলের আশেপাশের জীববৈচিত্র্য খুবই সমৃদ্ধ হয়।

টোটেমিক জনজাতির মানুষজনের তাদের টোটেমের প্রতি এই গভীর আস্থাশীলতা বা শ্রদ্ধাপ্রদর্শন আক্ষরিক অর্থে প্রকৃতিকে স্বাভাবিকভাবে তার নিজস্ব জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সাহায্য করে। এই টোটেম-এর ধারণা আসলে আধুনিক জীববৈচিত্র সংরক্ষণের ধারার প্রাথমিক সহজপাঠ। মুক্তমনা কুড়মিরা এই পাঠ পেয়েছিল প্রকৃতির পাঠশালায়। জঙ্গলমহলে বসবাসকারী আর পাঁচটা আদিবাসী জনজাতির মতোই কুড়মিরাও টোটেমিক। কুড়মিদের ৮১টি গোষ্ঠী রয়েছে। প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর নিজস্ব টোটেম বা কুলচিহ্ন রয়েছে। এবং এই টোটেমগুলি নেওয়া হয়েছে স্থানীয় পরিবেশের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব ও উদ্ভিদ থেকেই। প্রতিটি আদিবাসী গোষ্ঠীর মতই কুড়মিরাও তাদের টোটেম সিস্টেম (ভক্তি প্রথা) এর মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করে চলেছে। প্রতিটি ভূপ্রাকৃতিক এলাকায় সেখানকার পশুপাখি বা উদ্ভিদদের এলাকার টোটেমিক আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি তাদের নির্দিষ্ট টোটেম হিসেবে গ্রহণ করেছে। ছোটনাগপুরের টোটেমিক কুড়মি জনজাতি এর ব্যতিক্রম নয়। ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকায় প্রাপ্ত পশুপাখিদের তাই এই এলাকায় টোটেম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। টোটেমিক কুড়মিরা তাদের উৎসবের মধ্যে পালিত বিভিন্ন পারস্পরিক নেগ-নেগাচারের

মাধ্যমে তাদের জনগনের ভেতরে পরিবেশ চেতনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উন্মেষ ঘটায়। টুসু পরব আদ্যপান্ত একটি কৃষি ও প্রকৃতির মেলবন্ধনের উৎসব। পুরখেনি টুসু গীতগুলি প্রায় সবই প্রকৃতি ও মানবসমাজের মেলবন্ধনের কথা বলে। রইহেন পরব পালিত হয় সাপ ও সরীসৃপ সম্পর্কে সচেতনতা ও তাদের রক্ষার বার্তা নিয়ে। রইহেন ও ডাক সংক্রান্তির মতো দিনগুলিতে সাপ মারা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। জিতিয়া পরবের নেগাচারগুলি পালিত হয় একটি আখ গাছকে কেন্দ্র করে। কুড়মিদের অন্যতম প্রধান পরব বাঁদনা এক শাশ্বত পশুপ্রেমের বার্তা দেয়। এই উৎসবের মাধ্যমে মানবজীবনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য গবাদি পশুদের কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। করম পরব আবার পরিচালিত হয় করম গাছ আর কৃষিকে কেন্দ্র করে। করম পরবের জন্য করমতিরা গাঁয়ের পার্শ্ববর্তী জঙ্গল থেকে কেউয়া, বানয়ারি, বন হলুদ, বন আদা, আমলকি, হরিতকী, বহেড়া, ভেলা, ডুমুর, শালপাতা, শাল দাঁতন, রাম দাঁতন, সাঁচি খৈড়কা, রাম খৈড়কা ইত্যাদি ভেষজ উদ্ভিদের পাতা ও দাঁতন সংগ্রহ করে আনে। যা তাদের ভেষজ উদ্ভিদ চর্চা ও সেগুলি সংরক্ষণের প্রথম পাঠ।

"হালা হালা বনফুল / তুলেছি বিকালে
জইড় পাকইড় আম-জাম / আর কোঁম্ম ফুলে
করম থানে রে....."

কুড়মিদের মধ্যে রয়েছে আম বিহা আর মহুল বিহার নিয়ম। পাত্র পাত্রীকে প্রথমে আম ও মহুল গাছের সাথে বিবাহ দেওয়া হয়। 'Environmental ethics' অনুযায়ী কোন জীবজন্তু বা গাছপালা সে যতই ভুচ্ছ হোক না কেন, তা যদি মানুষের বিন্দুমাত্র নাও কাজে আসে তাকেও সংরক্ষণ করতে হবে, তাকেও স্বাভাবিক পরিবেশে। বাঁচতে দিতে হবে। এই পৃথিবীতে তারও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। কুড়মিরা তাদের টোটেম সিস্টেমের মাধ্যমে এভাবেই বিস্মৃতকাল থেকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবকে পালন ও রক্ষা করে আসছে।

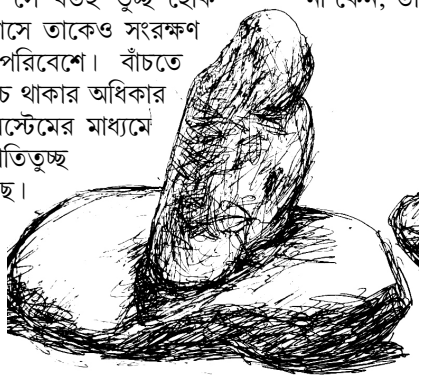

একথা অনস্বীকার্য এই টোটেমিক বিশ্বাস শুধুমাত্র আদিবাসী জনজাতির সমাজ- সংস্কৃতি, ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের পরিচয় বহন করেনা এটা প্রকৃতির সাথে মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক সহাবস্থানের বার্তা দেয়। বর্তমান সময়ে দিন দিন মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নগরায়ণ। যত্রতত্র নির্বিচারে বৃক্ষছেদন চলছে। খনিজের খোঁজে উজাড় হয়ে যাচ্ছে বনভূমি। আকাশছোঁয়া বহুতলের নীচে চাপা পড়ছে জলাভূমি। বিঘ্নিত হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য।

"জল জংগল লদি / কেসন সুনদর
দিন দিন বাড়ে / পরগতি বহর
বাইচলে পরকিতি / বাঁচে মানব জাতি।।"
[ঝুমুর গান। ভূপেন চন্দ্র মাহাত]

পাখি নামে কুড়মি টোটেম

ক্রমিক সংখ্যা	গুষ্টি বা গোষ্ঠীর নাম	প্রশাখা	টোটেম	বিধি নিষেধ বা ট্যাবু
১	কাদিমার	_____	কাদাখোঁচা	কাদাখোঁচা মারা ও খাওয়া নিষেধ।
২	গুঁড়ুরিআর	_____	গুড়ুর বা কোয়েল	গুঁড়ুর মারা ও খাওয়া নিষেধ।
৩	চিলুআর	_____	চিল	চিল পাখিদের সম্মান করে মান্য করা।
৪	টিটিআর	_____	টিটাহু বা তুলিকা	টিটাহু পাখি মারা ও খাওয়া নিষেধ।
৫	ঠুঠুআর	_____	কাঠঠোকরা	কাঠঠোকরা পাখি মারা নিষেধ।
৬	তিতরিআর	ফাঁইস তিতরিআর, জাল তিতরিআর	তিতির	তিতির পাখি ধরা, মারা ও খাওয়া নিষেধ।
৭	বানুআর	কাউআ বানুআর	কাক	কাক মারা নিষেধ।
৮	বাঁসগিআর	_____	বাজ	বাজপাখি মারা নিষেধ।
৯	বকুআর	কেশ বকুআর, চুঁধি বকুআর	বক	বক মারা নিষেধ।
১০	সিখিআর	_____	ময়ূর	ময়ূরদের সম্মান করে মান্য করা।
১১	সেকুআর	_____	শিকরা	সম্মান করে মান্য করা।
১২	হঁসতআর	_____	বালি হাঁস	ধরা, মারা ও খাওয়া নিষেধ।
১৩	হাঁসদা	_____	রাজহাঁস	ধরা, মারা ও খাওয়া নিষেধ।
১৪	লাঠোআর	সাঁড় লাঠোআর, গাওয়া লাঠোআর	ল্যাঠা চোং (পাখি ধরার যন্ত্র।)	ব্যবহার করা মানা।

স্তন্যপায়ী প্রাণী নামে কুড়মি টোটেম

ক্রমিক সংখ্যা	গুষ্টি বা গোষ্ঠীর নাম	প্রশাখা	টোটেম	বিধি নিষেধ বা ট্যাবু
১	কাড়ুআর	কাড়াকাটা কাড়ুআর, সিঁকাকাটা কাড়ুআর, ঘি ঢালা কাড়ুআর, টাকাকাটা কাড়ুআর, অঁধচভরা কাড়ুআর, ঘোড়াকাটা কাড়ুআর	কাড়া (পুরুষ মোষ)	কাড়া বলি দেখতে নেই। মোষের দুধের ঘি খেতে নেই। কাড়ার লাঙ্গল করতে নেই।
২	কাইটুআর	_____	কটাশ বা বন বিড়াল	কটাস মারতে নেই।
৩	খুখুআর	_____	খেঁকশিয়াল	খেঁকশিয়ালকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা।
৪	খেড়ুআর	_____	খরগোশ	খরগোশ মারা ও খাওয়া নিষেধ।
৫	গুড়রিআর	_____	গাঢ়র ভেড়া	গাড়র ভেড়াকে মান্য করা।

৬	চিড়ুআর	_____	কাঠবেড়ালি	কাঠবেড়ালী মারা নিষেধ।
৭	চুঁটরিআর	_____	নেংটি ইঁদুর	নেংটি ইঁদুর মারা নিষেধ।
৮	নেলুআর	_____	নেউল	নেউল মারে না।
৯	বনসুআর	_____	বন বরাহ	বনের শূকর শিকার নিষেধ। শূকর কে মান্য করা।
১০	বিলুআর	_____	বিড়াল	বিড়াল কে মান্য করা।
১১	বানুআর	বাঘ বানুআর, হাতি বানুআর, ভালুক বানুআর, ঘোড়া বানুআর।	বাঘ, হাতি ভালুক, ঘোড়া	সম্মান করে মান্য করা।
১২	বাগসারিআর	_____	হুড়ার বা নেকড়ে	হুড়ারকে মান্য করা।
১৩	বনসিআর	_____	বন শিয়াল	বনের শেয়ালকে মান্য করা। বনের শেয়াল মারা নিষেধ।
১৪	মুসরুআর	সাঁড় মুসরুআর, ভুঁই মুসরুআর, চাং মুসরুআর।	ইঁদুর	ইঁদুর মারা নিষেধ।
১৫	মুরমুআর	_____	নীলগাই	নীলগাইকে মান্য করে।
১৬	মানুআর	_____	সম্বর হরিণ	সম্বর হরিণকে মান্য করে।
১৭	লাগড়ুআর	_____	হায়েনা বা লাগড়া বাঘ	হায়েনা বা লাগড়া বাঘকে মান্য করে।
১৮	সিংঘুআর	_____	সিংহ	সিংহকে মান্য করে।
১৯	সিঁগুআর	_____	শিং নির্মিত বাঁশি	শিংএর বাঁশি বাজানো নিষেধ।

সরীসৃপ ও উভচর প্রাণী নামে কুড়মি টোটেম

ক্রমিক সংখ্যা	গুষ্টি বা গোষ্ঠীর নাম	প্রশাখা	টোটেম	বিধি নিষেধ বা ট্যাবু
১	কাছুআর	_____	কাছিম	কাছিমকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা। খাওয়া ও মারা নিষেধ।
২	দরুআর	রাজ দরুআর, টুরি দরুআর।	ব্যাঙ	ব্যাঙ মারা নিষেধ।
৩	নাগটুআর	_____	নাগ	সাপ মারা নিষেধ।
৪	মগুআর	_____	কুমীর	কুমীর কে মান্য করে।
৫	হঁসতুআর	_____	কচ্ছপ	কচ্ছপকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে।

কীটপতঙ্গ কম্বোজ প্রাণী (জলজ ও স্থলজ) নামে কুড়মি টোটেম

ক্রমিক সংখ্যা	গুষ্টি বা গোষ্ঠীর নাম	প্রশাখা	টোটেম	বিধি নিষেধ বা ট্যাবু
১	করকুআর	কারি করকুআর, সাঁচি করকুআর।	কাঁকড়াবিছা	কাঁকড়াবিছা মারতে নেই।
২	কাটিআর	কাটিকুটি কাটিআর, কানবেদ কাটিআর, ঝাঁটি কাটা কাটিআর, গুটি কাটিআর, সাঁচি কাটিআর।	তসর পোকা	তসর পোকা মারতে নেই। তসর কাপড় ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। তসর কাটা নিষেধ।
৩	কড়িআর	_____	কড়ি	কড়ি ব্যবহার নিষেধ।
৪	কেঁকুআর	সাঁচি কেঁকুআর, দুধি কেঁকুআর, ভেলু কেঁকুআর।	কাঁকড়া	কাঁকড়া মারা ও খাওয়া নিষেধ।
৫	গুলিআর	_____	গুগলি শামুক	গোগলী শামুক খাওয়া নিষেধ।
৬	গেঁটিআর	_____	বড় শামুক	শামুক খাওয়া নিষেধ।
৭	জংটিআর	_____	কেঁচো	কেঁচোকে মারা নিষেধ।
৮	জুমরিআর	_____	কেন্নো	কেন্নো মারা নিষেধ।
৯	জুঁইআর	_____	জুঁইয়া পিঁপড়া	জুঁইয়া পিঁপড়া মারা নিষেধ।
১০	টিড়ুআর	সনা টিড়ুআর, সাইটকা টিড়ুআর।	ফড়িং	ফড়িং মারে না।
১১	ডুঁংরিআর	_____	উই মাকা বা টিলা	উই টিলা ভাঙা নিষেধ।
১২	বুঁদিআর	_____	বুঁদিকড়ি	বুঁদি কড়ি ব্যবহার করা নিষেধ।
১৩	মুতরুআর	ছঁচ মুতরুআর, ছাঁচ মুতরুআর।	মাকড়সা	কোন ধরনের মাকড়সাকে মারে না।
১৪	লুতিআর	মম লুতিআর, গুড় লুতিআর।	মৌমাছি	মৌমাছি মারা ও মধু ব্যবহার নিষেধ।
১৫	সাঁখুআর	শাঁখ সাঁখুআর, শাঁখা সাঁখুআর।	শাঁখ	শাঁখ বাজানো নিষেধ। শাঁখা ব্যবহার নিষেধ।
১৬	উঁচড়িআর	_____	উচ্চিংড়ে পোকা	উচ্চিংড়ে পোকা মারতে নেই।

মৎস শিকার পদ্ধতি ও মৎস নামে কুড়মি টোটেম

ক্রমিক সংখ্যা	গুষ্টি বা গোষ্ঠীর নাম	প্রশাখা	টোটেম	বিধি নিষেধ বা ট্যাবু
১	বানুআর	জাল বানুআর	মাছ ধরার জাল	জাল বোনা ও ব্যবহার নিষেধ।
২	হিঁদইআর	সাঁচি হিঁদইআর, কুচিয়া হিঁদইআর।	কুচিয়া মাছ	খাওয়া নিষেধ।

উদ্ভিদ নামে কুড়মি টোটেম

ক্রমিক সংখ্যা	গুষ্টি বা গোষ্ঠীর নাম	প্রশাখা	টোটেম	বিধি নিষেধ বা ট্যাবু
১	কড়রআর	_____	কড়র গাছ	কড়র গাছ কাটা নিষেধ।
২	কেসরিআর	ঝাঁপা কেসরিআর, গুয়া কেসরিআর।	কেসর ঘাস	কেসর ঘাস কাটতে নেই।
৩	কুঁদরিআর	_____	কুঁদরি	কুঁদরি ফল ও পাতা খাওয়া নিষেধ।
৪	কাঁচিআর	_____	কচি ঘাস	কচি ঘাস ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করা নিষেধ। বাঁদনা পরবের সময় কাঁচি দুয়ারি দেওয়া নিষেধ।
৫	খেসুআর	_____	খেসারী ডাল	খেসারী ডাল চাষ করা নিষিদ্ধ।
৬	খেড়আর	_____	এক ধরনের ঘাস	খেড় ঘাস কাটা ও ব্যবহার নিষেধ।
৭	খিরুআর	_____	শশা	শশা খাওয়া নিষেধ।
৮	গাঁধারীআর	_____	গাঁধারী শাক	গাঁধারী শাক খাওয়া নিষেধ।
৯	ডুমরিআর	ঘোড় ডুমরিআর, টঁকিপিঠা ডুমরিআর।	ডুমুর	ডুমুর গাছ কাটা নিষেধ। ডুমুর গাছের তলায় যাওয়া নিষেধ। বিবাহে মোড় ব্যবহার নিষেধ।
১০	তিলরআর	_____	তিল	তিল চাষ নিষেধ।
১১	পাকুড়আর	_____	পাকুড় গাছ	পাকুড় গাছ কাটা নিষেধ।
১২	বঁসরিআর	করইল বঁসরিআর, ঝাঁপা বঁসরিআর, ঝাড় বঁসরিআর, বাঁশি বঁসরিআর।	বাঁশ	বাঁশ গাছ কাটা নিষেধ। বাঁশ গাছ লাগানো নিষেধ। বাঁশের বাঁশি বাজানো নিষেধ।
১৩	পুনরিআর	পাত পুনরিআর, লত পুনরিআর, পইনা পুনরিআর,	পুঁই	পুঁই শাক, লতা খাওয়া নিষেধ।

		চিলবিঁধা পুনরিআর।		
১৪	বেহড়আর	_____	বহেড়া	বহড়া গাছ কাটা নিষেধ। বহড়া ফল খাওয়া নিষেধ।
১৫	সিধুআর	_____	মনসা গাছ	মনসা গাছ কাটা নিষেধ।
১৬	হেমরম	_____	পান	পান খাওয়া নিষেধ।

অবাঞ্ছিত বৃদ্ধ ছেদন বন্ধ ও নতুন করে বৃক্ষরোপণের দ্বারা বনভূমি সৃজনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করতে 'অরণ্যসপ্তাহ' ও 'বনমহোৎসব' পালনের মতো একাধিক কর্মসূচি নিচ্ছে সরকার। কিন্তু কুড়মি জনজাতির সমাজ সংস্কৃতির মধ্যেই এই বোধ জড়িয়ে রয়েছে। তাই আজও জীবন যাপনের শর্তে কুড়মিরা আদ্যপান্ত প্রকৃতি প্রেমিক। গাছপালা, গোরু ছাগল, পশু পাখি নিয়েই এদের সংসার। বর্তমান সময়ে আদিবাসী কুড়মি সমাজ'-এর মত কুড়মি সমাজ সংগঠন অরণ্য তথা শালজঙ্গল ধ্বংসের বিরুদ্ধে 'জঙ্গল জিয়াও হামদুমি'-র মত কর্মসূচী পালন করছে। প্রকৃতির মাঝে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদেই তারা পরম্পরায় এই কাজ করে আসছে যুগ যুগ ধরে।

আমাদের বেলপাহাড়ি (ঘাঘরা, খাঁদারাণী এবং...)

তাপস কুমার পাল

সদ্য প্রয়াত সাহিত্যিক, প্রকৃতি প্রেমিক, পরিবেশবিদ ও অ্যাডভেঞ্জার প্রিয় বুদ্ধদেব গুহের লেখা পড়তে কার না ভালো লাগে। তাঁর "বাংরিপোসায় দু'রাত্তির", "একটু উষ্ণতার জন্য", "ঋভু", "বাবলি", "কোয়েলের কাছে" কে না পড়েছেন। তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস "জ্যোৎস্না রাতে বেতলাতে" গতবারের শারদীয় বর্তমানে পড়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। খারাপ হয়ে গেল আমাদের প্রিয় বেলপাহাড়ির কথা ভেবে। আমরা ছেলেবেলায় যে বেলপাহাড়ি কে দেখেছি আজ কি সেই বেলপাহাড়ি আছে। আমরা ৫টাকা ও এক কনা চাল দিয়ে গরুর গাড়িতে ঘাঘরা বনভোজন করতে গিয়েছি। তখন ঘাঘরার ছিল এক অনন্য রূপ-নিস্তব্ধ সুন্দর, রোমাঞ্চকর শালের জঙ্গলের হাতছানি, ঝিরঝির করে বয়ে চলা তারাফেনী–যার ফেনায় তারা ফোটে।

কিন্তু আজ বনভূমি কাঁপানো ডিজের আওয়াজ, যেখানে সেখানে ভাঙ্গা মদের বোতল, পরিবেশ নষ্টকারী থার্মোকলের পাতা খালা, স্ফূর্তি ছেলেমেয়েদের অভব্য চালচলন যা শুধু পরিবেশকেই নয়, বন জঙ্গলের পশু পাখিদেরও বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেলপাহাড়ির সৌন্দর্য চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে–লাল জলের আদিম মানুষের গুহা, ঢাঙ্গিকুসুমের পাহাড়ি ঝরনা, তামা জুড়ির তাম্র যুগের কুঠার,

গাররাসিনির গিরি আশ্রম, খাঁদারাণীর নীল জলে সুদূর সাইবেরিয়া থেকে আসা পরিযায়ী পাখিদের কোলাহল হয়তো আর বেশি দিন শোনা যাবে না। মানুষের ব্যবহারে অতিষ্ঠ জঙ্গলমহল-জঙ্গলের ভূমিপুত্র ও পশু পাখি সবাই। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে ঘাঘরা গাররাসিনি, খাঁদারাণীতেও তৈরি হবে টুরিস্ট লজ, হলিডে হোম, হোমস্টে-কল-কোলাহলে ভরে উঠবে জঙ্গলমহল, দীঘা-মন্দারমনির মতোই হারিয়ে যাবে প্রকৃতির আপন ছন্দ-আপন নিস্তব্ধতা। কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার আরণ্যক উপন্যাসে মিশরের ফ্যারাওদের পিরামিড প্রসঙ্গে যে আক্ষেপ করেছিলেন, একই সুর ধরা পড়ল বুদ্ধদেব বাবুর লেখনীতে। "শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সব জায়গাতেই দেখেছি, মানুষ খোদার উপর খোদকারী করতে গিয়ে খোদাকেই অপমান করছে বারবার। একই সঙ্গে মানুষকেও বঞ্চিত করছে প্রকৃতির স্বাভাবিক এবং অপরূপ সৌন্দর্য থেকে। আমেরিকা এবং কানাডাতেও এই কথা পুরোপুরি প্রযোজ্য। অনেকদিন আগে কানাডা থেকে নায়াগ্রা প্রপাতের যে অপরূপ দৃশ্য দেখেছি আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে, তার সৌন্দর্য এখনো চোখে লেগে আছে। কিন্তু গত বছরই যখন কানাডায় গেলাম, নায়াগ্রা দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। সেখানে নানা হোটেল, টুরিস্ট লজ হয়েছে। নায়াগ্রার কাছেই ডলফিন শো এর আয়োজন হয়েছে। আরো নানা দর্শক মনোহারী চিত্ত বিনোদনকারী সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কিন্তু মানুষের চিত্ত বিনোদন যে প্রকৃতিকে তার মতো করে ছেড়ে রাখলেই সবচেয়ে বেশি হতে পারে এই সাধারণ বুদ্ধিটা ব্যবসা ও টাকা সর্বস্ব পশ্চিমের মানুষগুলোর হয়নি। নায়াগ্রা যে কত বড় প্রপাত তা নিজে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। এই প্রপাতের অবস্থান আমেরিকা ও কানাডা-দুই দেশেরই সীমান্তে। তবে কানাডিয়ান প্রান্ত থেকেই নায়াগ্রার শোভা অনেক বেশি চিত্তকর্ষক। তাই কানাডিয়ান সাইডেই এই প্রপাতের উপর অত্যাচার বেশি হয়েছে। মানুষেরই দোষে মানুষেরই ক্ষুদ্র বুদ্ধির উচ্চ মন্যতার আস্ফালনে এই প্রকৃতি যেমনভাবে প্রতিদিন অত্যাচারিত লুণ্ঠিত হচ্ছে তাতে এই প্রকৃতিকে আমরা যে নিবিড়ভাবে পেয়েছিলাম পরবর্তী প্রজন্ম আর খুঁজে পাবেনা-এটাই তাদের দুর্ভাগ্য।

বনে আসে অনেক মানুষ। আজকাল বনে-জঙ্গলে আসাটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বনকে কিভাবে অনুভব করতে হয়, কীকরে নিজের সর্বস্ব দিয়ে বিভিন্ন রাতের বনের আলাদা আলাদা রূপকে আলিঙ্গন করতে হয়, তা শিখতে বহুদিনের সাধনা লাগে। আমি নিজেও যে পুরোপুরি শিখেছি, তা বলতে পারি না। তবে এই প্রকৃতিকে বোঝার নিরন্তন চেষ্টা থেকে কখনই যেন বিরত না হই।"

রাঢ়বঙ্গের লোক উৎসব-ভাদু ও করম পরব

মনীষা পলমল

ভরা ভাদরের আকাশে কৃষ্ণ মেঘ দোলে। রাঢ় বঙ্গের কৃষিজীবীদের অন্তরে জাগে উৎসবের-পরবের আনন্দ। শস্য উৎপাদনের আকাঙ্খা ও আশায় শুরু হয় ভাদু পরবের। যদিও তা স্মরণ উৎসব তবুও আন্তরিক কামনায় এই মাটির মানুষদের পরাণ কথা ফুটে ওঠে ভাদু গানে। রাঢ়বঙ্গের অন্যতম লোকউৎসব ভাদু পরব। সারা ভাদ্র মাস জুড়েই চলে এই লোক উৎসব। ভাদু উৎসব কিভাবে শুরু হয়েছে সে নিয়ে অনেক জনশ্রুতি আছে। শোনা যায় যে পুরুলিয়ার লারা গ্রামের মোড়ল ভাদ্র মাসে ধান ক্ষেতের আলে এক কন্যা সন্তানকে কুড়িয়ে পান। সেই অনাবৃষ্টির বছরে ওই "মাটির কন্যাকে" ঘরে আনা মাত্রই আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামে! কন্যার নাম রাখা হয় ভদ্রাবতী! এই রূপে গুণে অতুলনীয় কন্যার কথা রাজা নীলমনি সিং দেও-র কানে পৌঁছালে তিনি একে দত্তক নিতে চান। ষোড়শী ভদ্রাবতী ভালোবেসেছিল গ্রামের কবিরাজের ছেলে অঞ্জনকে। রাজা সব জানতে পেরে অঞ্জনকে বন্দি করে। ভদ্রাবতী ওই কয়েদখানার চারপাশে করুণ সুরে গান গেয়ে ঘুরতে থাকে। সেই গানে রাজার মন গলে। অঞ্জনকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু ভদ্রাবতীর আর কোনো খোঁজ মেলেনি। কেউ বলে নদীতে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন কেউবা বলে মাটির কন্যা মিশে গেছে মাটিতে। সেই শোক স্মরণেই শুরু হয় ভাদু পরবের।

আবার অনেকে বলেন প্রায় ২০০ বছর আগের কথা। পুরুলিয়ার কাশীপুরের পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিং দেও। তার কন্যা ভদ্রাবতী। রাজকন্যার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু বিবাহ করতে আসার পথে ডাকাতদল বরসহ বরযাত্রীদের হত্যা করে। এই আঘাতের ভদ্রাবতী আত্মঘাতী হন। রাজা নীলমণি সিং দেও মেয়ের স্মৃতিকে স্মরণীয় রাখতে ভাদু গানের প্রচলন করেন। কিছু সরকারি নথিতে ঘটনাটির উল্লেখ মেলে।

বীরভূমবাসীরা মনে করেন ভদ্রাবতী আসলে হেতমপুরের রাজকন্যা। তাঁর সাথে বর্ধমানের রাজপুত্রের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। ইলামবাজারের কাছে চৌপারির শালবনে ডাকাতের আক্রমণে মৃত্যু হয় রাজপুত্রের। ভদ্রাবতী সহমরণে যান রাজপুত্রের সাথে। সেই থেকেই মানভূম অঞ্চলে শুরু হয় ভাদু পরবের।

পয়লা ভাদ্র কুমারী মেয়েরা বাড়ির কুলুঙ্গিতে একটি মাটির পাত্রে ফুল রেখে অথবা পাত্রের ওপরে গোবর দিয়ে তার মধ্যে ধান ছড়িয়ে ভাদু প্রতিষ্ঠা করেন। সেদিন থেকেই শুরু হয় সমবেত ভাদু গান। এই গান রাঢ়বঙ্গের কৃষিজীবী মানুষের মুখের কথা। তাই লৌকিকতা ও সামাজিকতায় আচ্ছন্ন থাকে পদগুলি। মহিলাদের সুখ-দুঃখের বর্ণনা উঠে আস গানগুলিতে। পাঁচালী সুরে গাওয়া গানগুলি গ্রামীণ মানুষের সমাজচেতনা প্রতিবাদ বর্ণিত হয়। ভাদ্র সংক্রান্তির ৭ দিন আগে ঘরে আনা হয় ভাদুর মূর্তি— পদ্মাসনা বা ময়ূর বা হাঁস বাহনা। মূর্তির গায়ের রং হলুদ, হাতে আলপনা। ভাদ্র সংক্রান্তির আগের রাতে হয় ভাদু জাগরণ। রঙিন কাপড় বা কাগজের ঘরে মূর্তি স্থাপন করা হয়। নানা উপাচার সাজিয়ে চলে পূজোর আয়োজন। মূর্তির সামনে সাজিয়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন স্থানীয় মিষ্টি। তার

সাথে চলতে থাকে ভাদু গান। এই ভোগের বিশেষ মিষ্টি হল জিলিপি। ভাদু বরণের অঙ্গ এই জিলিপি। ভাদ্রসংক্রান্তির সকাল বা বিকেলে মহিলারা দলবদ্ধভাবে ভাদু মনি কে মাথায় নিয়ে সারা গ্রাম পরিক্রমা করেন। তারপর বরণ করে নদীতে বা পুকুরে বিসর্জন দেন। এই ভাদু বরণ কে স্থানীয় ভাষায় "ভাদু চুমানো" বলে। এই পরবে নেই কোন পুরোহিত, মন্ত্র, উপবাস, আচার বা প্রাতিষ্ঠানিকতা। আছে শুধু গান যা কৃষিজীবী সমাজের অন্তরের কথা–

"ভাদু কে আস্যেছে লিতে মহুলবনীর চিনিবাস
যদি ভাদু যাব বল আমরা লিব বনবাস।।"

কিংবা–

"যাচ্ছ ভাদু যাওগো
পিছন ফিরে চাও গো
সখীরা সব দাঁড়ায় আছে
পদধূলি দাও গো।"

ভাদু বিসর্জনের ঘাটে চলে গানের প্রতিযোগিতা। ভাদু গানে সমসাময়িক বিষয় রাজনীতি সামাজিক ঘটনা বর্ণিত হয়। প্রান্তিক কৃষিজীবী আকাঙ্খা খুবই সামান্য–

"ভাদুর লাচে ঘুঙ্গুর দে মা
মাচান ভরে ডিংলাঝিঙা
নিমক মরিচ মাড়ে ভাতে
মাদলে বোল ঘিজাং ঘিনা।"

বিশ্বকর্মা পূজার আগের দিন হয় ভাদুবরণ। থালা ভরা মিষ্টির বিকল্প হিসাবে বিরাট বড় জাম্বো জিলিপি সাজিয়ে দেওয়া হয় ভাদুর সামনে। প্রান্তিক কৃষিজীবী সমাজের আর্থিক দৈন্য কে সুন্দরভাবে বিকল্প জিলিপির মিষ্টতায় ঢেকে দেওয়া হয়। এই জিলিপি ভোগ দেওয়ার সামর্থ্য সব কৃষিজীবীর আছে। এই নিয়ে সুন্দর লোক সাহিত্য আছে। বাঁকুড়ার ছাতনার কেঞ্জাকুডায় শুরু হয় বিরাট জিলিপি বানানো।—

"অবাক দেখেশুনে
কেঞ্জাকুডায় অশোক দত্তের দোকানে
বড় বড় জিলিপি গুলা সওয়া কেজি ওজনে
আবার খাজা গুলা এক ফুট করে দেখে এলাম নয়নে–"।

একইভাবে পুরুলিয়ায় বানানো হয় জাম্বো জিলিপি। এছাড়াও গজা, খাজা, লবঙ্গ লতিকা–যা এই সীমান্ত বাংলার খুবই আদরের মিষ্টান্ন।

প্রচলিত কিংবদন্তী অনুযায়ী ভাদুর জন্ম ও মৃত্যু ভাদ্র মাসে। তাই এ মাসে হিন্দু মেয়ের বিয়ে দিতে নেই। ভাদ্র সংক্রান্তির বিকেল–আকাশে কালো মেঘ–রাঢ় বঙ্গের কৃষিবীবীদের মনের আকাশেও মেঘের ছায়া–ভাদু মনিকে যে বিসর্জন দিতে হবে –

"আমার বড় মনের বাসনা
ভাদুধনকে জলে দিব না।"

গানে গানে ভাদু মনি কে বিদায় জানায় প্রান্তিক বাংলার কৃষিজীবীরা। সমাপ্তি ঘটে একমাস ব্যাপী ভাদু পরবের।

করম : প্রতিবছর ভাদ্র মাসের শুক্ল একাদশী তিথিতে করম উৎসব পালিত হয়। এটি একটি আরণ্যক কৃষি ভিত্তিক লোক উৎসব। জঙ্গলমহলের ৩৮টি বিভিন্ন

জনজাতি এই উৎসব পালন করে।

ভাদ্র মাসের শুক্ল একাদশী তিথিতে এই উৎসব পালিত হয়। এর সাত/পাঁচ/তিন দিন আগে মেয়েরা ভোর বেলায় শালের দাঁতন কাটি ভেঙে নদি বা পুকুরে স্নান করে বাঁশ দিয়ে বোনা ছোট টুপা (টকা-চারকোনা ঝুড়ি) ও ডালায় বালি ভরতি করেন। তারপর গ্রামের প্রান্তে ডালাগুলিকে রেখে জাওয়া গান গাইতে গাইতে ওই ডালগুলিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করেন। এরপর তাতে তেল ও হলুদ দিয়ে মটর, মুগ, বুট (ছোলা) জইনার ও কুথ্থির বীজ মাখানো হয়। অবিবাহিত মেয়েরা স্নান করে ভিজে কাপড়ে ছোট শালপাতার থালায় বীজ গুলিকে বুনে দেন ও তাতে সিঁদুর ও কাজলের তিনটি দাগ টানা হয়। একে "বাগাল জাওয়া" বলা হয়। এরপর ডালা ও টুপাতে বীজ বোনা হয়। প্রত্যেকের জাওয়া চিহ্নিত করার জন্য কাশ কাঠি পুঁতে দেওয়া হয়। একে "জাওয়া পাতা" বলে। যে ডালায় একাধিক বীজ পোঁতা হয় তাকে "সাঙ্গী জাওয়া ডালা" ও যে ডালায় একটিমাত্র বীজ পোঁতা হয় তাকে "একাঙ্গি জাওয়া ডাল" বলে। যে সমস্ত কুমারী মেয়েরা এই কাজ করেন তাদের "জাওয়ার মা" বলা হয়। "বাগাল জাওয়া" গুলিকে লুকিয়ে রেখে টুপা ও ডালার জাওয়াগুলিকে নিয়ে তারা গ্রামে ফিরে আসে।

দিনের স্নান সেরে পাঁচটি ঝিঙ্গা পাতা উল্টো করে বিছিয়ে প্রতিটি পাতায় একটি করে দাঁতন কাঠি রাখা হয়। পরদিন গোবর দিয়ে পরিষ্কার করে নিকিয়ে আল্পনা দেওয়া হয় ও দেওয়ালে সিঁদুরের দাগ দিয়ে কাজলের ফোঁটা দেওয়া হয়। পুরুষেরা শাল গাছের ডাল বা ছাতা ডাল সংগ্রহ করে আনেন। গ্রামের বয়স্কদের নির্দিষ্ট করে দেওয়া স্থানে দুটি করম ডাল এনে পুঁতে রাখা হয় যা সন্ধ্যার পরে করম ঠাকুর বা করম গোঁলায় এবং ধরম ঠাকুর হিসেবে পূজিত হন। কুমারী মেয়েরা সারা দিন উপোস করে সন্ধ্যার পর থালায় ফুল ফল সহকারে নৈবেদ্য সাজিয়ে এই স্থানে পূজা করেন। এরপর সারারাত ধরে নাচ-গান চলে। পরদিন সকালে মেয়েরা জাওয়া থেকে অঙ্কুরিত বীজগুলি উপড়ে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। এই বীজগুলি বাড়ির বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেন। এরপর করমডালটিকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। পূজার পর মেয়েরা পরপস্পরকে "করমডোর" বা রাখী পরিয়ে দেন। এই "করম সখী"রা কর্মস্থলে একে অপরকে রক্ষা করে। জঙ্গলে পাখির ডাকের নকলে "করমড্যের" ডেকে বিপদ জানায়।

করম উৎসবের সময় সমস্ত রাত ধরে সূর্যোদয় পর্যন্ত সম্মিলিতভাবে "ভাদুরিয়া ঝুমুর গান" ও যৌথ নাচ পরিবেশিত হয়। এই নাচ শুধুমাত্র অবিবাহিত ও প্রথম বছরের নব বিবাহিতা মেয়েরাই অংশগ্রহণ করতে পারেন। অর্ধবৃত্তাকারে হাত ধরাধরি করে এক পা এগিয়ে পিছিয়ে জাওয়াডালিগুলিকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে

ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরে ঘুরে নাচ করে। একজন উচ্চস্বরে গান শুরু করার পর নৃত্য শিল্পীরা গান শুরু করে ধীরে ধীরে সুর নামিয়ে আনেন। একই কথা বারে বারে গাওয়া হয় ধ্রুবপদ এর মত।

মেয়েদের পরনে লুঙ্গি গামছা বা শাড়ি, রুপার গহনা ও মাথায় ফুল। এই নাচে গৃহকাজ ও কৃষিকাজ ফুটিয়ে তোলা হয়। করম উৎসবের প্রধান আকর্ষণ এই করমগীত বা জাওয়া গীত ও নৃত্য। শক্তি যৌবন ও সমৃদ্ধির প্রতীক এই করম পরব জঙ্গলমহলের খুবই লোকপ্রিয় আরণ্যক কৃষিভিত্তিক লোক উৎসব, প্রকৃতি ও মানব সমাজের ভালোবাসার বন্ধনের উদাহরণ এই লোক উৎসব।

তথ্যসূত্র :

লোকভাষ, বর্তমান পত্রিকা, গুগ্‌ল।

‘বাবরশা’একটি ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি: একটি সামাজিক-ঐতিহাসিক অধ্যয়ন

ডঃ শান্তনু পান্ডা

মুঘল আমলের মিষ্টি সুস্বাদু খাবার যা বিপুল পরিমাণ মানুষের হৃদয় দখল করে আছে তা এখনও বৃদ্ধির পথ খুঁজে চলেছে। মেদনীপুরের ক্ষীরপাইয়ের বাবরশা তার মিষ্টি এবং আকৃতির জন্য বিখ্যাত। এটি মুখে গলে যায় এবং এর মধ্যে ঘি ডুবিয়ে দিলে এটি আরও সুস্বাদু হয়।

উৎস এবং ইতিহাস:

একজন বিখ্যাত মুঘল সম্রাট এবং একজন ব্রিটিশ অফিসারের সাথে যুক্ত একটি মিষ্টি কল্পনা করুন। হ্যাঁ, বিখ্যাত বাবরসা, মেদিনীপুরের একটি ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি যা মিষ্টির দোকান থেকে দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, এর দুই শতাব্দীরও বেশি ইতিহাস রয়েছে বলে মনে করা হয়।

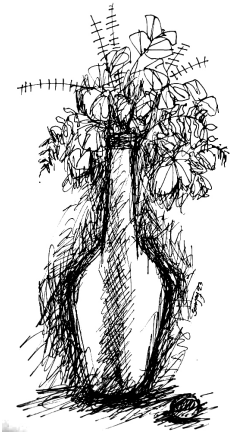

এটা বিশ্বাস করা হয় ১৭৪০-১৭৫০ সালের মাঝামাঝি সময়ে, ক্ষীরপাই শহরটি মারাঠা বর্গিরা বেশ কয়েকবার আক্রমণ করেছিল। হামলা থেকে বাঁচতে এলাকা ছাড়তে শুরু করে বাসিন্দারা। এই সময়ে, এডওয়ার্ড বাবরাশ, স্থানীয় লুণ্ঠনকারীদের পরাজিত করতে সাহায্য করেন। বাবরসা নামে এক স্থানীয় ব্যবসায়ী এডওয়ার্ডের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে তাকে এই বিশেষ মিষ্টি উপহার দেন। অন্যান্য সূত্রে জানা যায়, এই মিষ্টিটি দিল্লিতে সম্রাট বাবরকে দেওয়া হয়েছিল। তখন থেকেই এর নাম হয় বাবরসা।

এইভাবে মিষ্টি প্রায় ২৫০ বছরের পুরনো। ১৭৫০

সালের আগে এই মিষ্টির উৎপত্তি ছিল ক্ষীরপাই নামক প্রাচীন মেদিনীপুর শহরে। মিষ্টি দেখতে অনেকটা অমৃতির মতো এবং এটি গরম ঘি, ময়দা এবং মধুর মিশ্রণ। বিখ্যাত বাবরসা অবশ্যই গুড়ের শরবত বা এক বাটি মধু বা রাবড়ির সাথে উপভোগ করতে হবে। কিছু দোকানে এই পুরানো মিষ্টি তৈরি করা হয় কারণ এটি কারুকাজ করা ব্যয়বহুল।

এখন নৈরাজ্যের সময়ে যুদ্ধের নায়কের সময়; কিন্তু রয়্যালটি সম্পূর্ণভাবে দূরে যাবে না। পশ্চিম মেদিনীপুরের ক্ষীরপাই গ্রামে বাবর্ষের বাড়ি। একটি কিংবদন্তি বলে যে এটি মুঘল সম্রাট বাবরের পছন্দের কারণে এর নামটি পেয়েছে। কিন্তু সেটা কিংবদন্তি; সম্ভবত তিনি একই রকম এবং পুরানো রাজস্থানী রূপের স্বাদ পেয়েছেন: ঘেওয়ার। বাবরশা এবং ঘেওয়ার মিষ্টি তৈরি এবং আকারে একই রকম, পার্থক্য হল বাবরশা সাদা এবং ঘেওয়ার বাদামী।

বাংলায় বর্গী আক্রমণের সময় ইতিহাসে এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্ষীরপাইয়ের বাসিন্দারা স্থানীয় সাহেব এডওয়ার্ড বাবরশা (বারবোসা), সম্ভবত একজন পর্তুগিজ বা ব্রিটিশের কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন। ক্ষীরপাইয়ের অধীনে কাশিপুর গ্রাম লুণ্ঠন করতে আসা বর্গী স্কাউটদের তিনি পরাজিত করেন। পরাণ আতা নামে এক ময়রা তার নামে একটি মিষ্টি প্রস্তুত করে তাকে সম্মান জানায়। মিষ্টি আজ একটি বিরল এবং কদাচিৎ এমনকি ক্ষীরপাইতে পাওয়া যায়।

কিংবদন্তি আছে যে মুঘল সম্রাট বাবর শাহ এই পথ দিয়ে ক্ষীরপাইতে এসেছিলেন এবং এই সুস্বাদু খাবার খেয়েছিলেন, তাই এটির নাম। সম্রাট প্রায় ১৫২৬-৩০ খ্রিস্টাব্দে পরিদর্শন করেছিলেন বলে জানা যায়।

দ্বিতীয়ত, বাবুর্শা তার নিজের স্রষ্টা বা মিষ্টান্ন বাবু/বাবু সাহার কাছ থেকে এর নাম লাভ করে এবং এইভাবে বাবুর্শা বা বাবর্শা নামে পরিচিতি লাভ করে। সাহা উপাধির ধারকদের মিষ্টান্ন, মোদক এবং মিষ্টির সাথে একটি সম্পর্ক রয়েছে।

বাবর্ষের বিবর্তনের তৃতীয় সম্ভাবনা খুঁজে পাওয়া যায় অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইতে উল্লেখ আছে যেখানে তিনি মনে করেন ৭০/৭৫ বছর আগে একজন বিখ্যাত মিষ্টান্নশিল্পী আশু ময়রা এবং পরাণ ময়রা এই বিশেষত্ব তৈরি করেছিলেন। যদি আমরা এই জল্পনা বিবেচনা করি, তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে এই মিষ্টির বয়স একশ বছর বা তারও বেশি হতে পারে।

চতুর্থ যে তত্ত্বটি বলা হচ্ছে তা প্রায়শই ইংরেজ সাহেব লর্ড এডওয়ার্ড বাবরের সাথে যুক্ত। কথিত আছে যে তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষীরপাই আক্রমণ করার সময় বর্গিদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিলেন। চতুর্থ তত্ত্ব অনুসারে, বর্গিরা ১৭৪২-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। কিন্তু এর বিপরীতে আপত্তি আছে যদি আমরা বাসিন্দা এডওয়ার্ড বাবরের মিথ, পরাণ আতা সম্পর্কে বিবেচনা করি- এই অনুষঙ্গগুলি একই যুগে সম্মিলিতভাবে স্থাপন করা ব্যর্থ হয়।

বাবরশা ঘাটাল এর কথাতে এর উল্লেখ খুঁজে পেয়েছেন যেখানে স্যার এডওয়ার্ড বাবুর এবং মিষ্টান্নকারী পরাণ আটা এই মিষ্টির সাথে এর বিবর্তন সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্বের সাথে যুক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি নির্দিষ্ট মিষ্টি কিন্তু অসংখ্য তত্ত্ব যা আমাদের আজ অবধি বিস্মিত করে রাখে। এই মিষ্টির নামটি এর উত্তরাধিকার কতটা সমৃদ্ধ হতে পারে সে সম্পর্কে

প্রচুর পরিমাণে বলে।

শিল্পকলার ক্ষেত্রে গন্ধবণিকদের আধিপত্য থাকতে পারে (বানিয়া গন্ধ বণিকদের উত্তর পূর্ব ভারতের ব্যবসায়ী বলা হয়; তাদের প্রধান পেশা ব্যবসা, মূলত মশলা, ধূপ ও সুগন্ধি বিক্রেতা) কিন্তু রাজত্ব মোদকদের সাথেই ছিল। প্রায় ১৫০ বছর আগে। কিন্তু বাবু সাহা যদি এই মিষ্টান্ন তৈরির পিছনে মিষ্টান্নকারী হতেন তবে মিষ্টির বয়স ১৫০ বছর হতে পারে।

'আমার যদি দেখা হয় নাই'-এর লেখাগুলো বিবেচনা করি, পরাণ ময়রা হয়তো প্রায় ১০০ বছর আগে মিষ্টান্নের কারিগর ছিলেন। অন্যদিকে, আমরা যদি ঘাটাল এর কথার লেখাটি বিবেচনা করি এবং বরগি আক্রমণের সময় পোরান ময়রার সাথে সম্পর্কিত করার চেষ্টা করি তবে তিনি প্রায় ২৪০ বছর আগে বা তারও আগে মিষ্টান্নকারী ছিলেন। এবং যদি আমরা পরাণ ময়রা এবং বাবরশাকে আন্তঃসম্পর্ক করি তবে ঘাটাল এর কথা বাবরষার উল্লেখ অনুসারে ২৪০ বছর আগেও বিদ্যমান থাকতে পারে। এর সাথে যোগ করে, ক্ষীরপাইয়ের বাসিন্দা এডওয়ার্ড বাবরের ইতিহাস উল্লেখ করার প্রস্তাবটি সম্ভাব্য প্রমাণের সাপেক্ষে। আমরা যদি মেদিনীপুরের ইতিহাসের গভীরে খনন করি তবে আমরা তরুণদেব ভট্টাচার্যের মেদিনীপুরে উল্লিখিত একজন এডওয়ার্ডের সন্ধান পাই। তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন দুর্ভিক্ষের দুই বছর পর পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন গভর্নর ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। সন্ন্যাসী/ফকির বিদ্রোহও একই সময়ে ঘটেছিল। সন্ন্যাসী গোষ্ঠী বাংলার উত্তরাঞ্চল লুণ্ঠন করে এবং তারা পুরী যাওয়ার পথে মেদিনীপুরে থামে। তাদের লুণ্ঠন সেখানেও থামেনি এবং তারা মেদিনীপুরকে সুস্পষ্টভাবে শোষণ করেছিল। ১৭৭৩ সালে, ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডস এবং তার সৈন্যরা আক্রমণের পাল্টা জবাব দেয় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সন্ন্যাসীদের দ্বারা পরাভূত হয়। এডওয়ার্ড বাবর বা এডওয়ার্ডস প্রায় একই যুগে সহাবস্থান বলে মনে হয়। জটিল গিঁট যা এডওয়ার্ড/এডওয়ার্ডসকে আটকে রাখে যদি সমাধান করা হয় তাহলে বাবরশার উত্তরাধিকারের উপর কিছু আলোকপাত করতে পারে। এইভাবে আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি যে বাবরশা একটি সমৃদ্ধ অতীত এবং এক শতাব্দী প্রাচীন মিষ্টি।

ক্ষীরপাই এবং এর আশেপাশে মিষ্টান্নের দোকানে বাবরশা এখনও পুরানো। এটি ঘাটাল, খড়ার, কেশপুর, ঝাঁকরা, মাদপুর বা স্থানীয় কিছু উৎসব ও মেলাতেও বিক্রি হয়। এই মিষ্টির পেছনের মিষ্টান্নকারীরা মূলত ক্ষীরপাইয়ের স্থানীয় বাসিন্দা। কারিগররা এখন অর্ডার এবং চুক্তি গ্রহণ করে তাদের অর্থ উপার্জন করে। বর্তমানে শ্রী শঙ্কর সাহা [৫০], শ্রীশক্তিপদ দাস [৫০], শ্রীবিক্রম শীল [৪৬] প্রধান মিষ্টি প্রস্তুতকারকদের মধ্যে রয়েছেন।

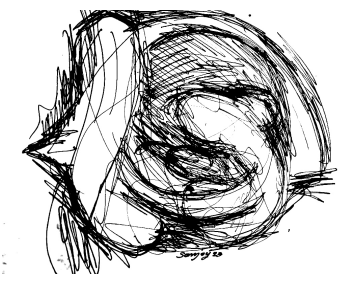

প্রবীণ শিল্পীদের অনেকেই মারা গেছেন। বাবরনা বিক্রেতা ও কারিগরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: সর্বশ্রী দিলীপ বৈরাগী, দ্বিজেন বৈরাগী, শঙ্কর বৈরাগী, সুকুমার বসু, লক্ষ্মীকান্ত শাসমল, সুবল চন্দ্র মোদক প্রমুখ।

বর্তমানে ক্ষীরপাইয়ের এই দক্ষ কারিগরের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। বরং গন্ধ্য বণিক বংশের কারিগরের সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে।

এই বিশিষ্ট শিল্পের উৎপত্তির সঙ্গে ক্ষীরপাইয়ের একটি কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে। ক্ষীরপাই ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার একটি মহকুমা শহর ছিল। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে, পরে, ক্ষীরপাই মেদিনীপুরের সীমানায় আসে। পরে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে, ক্ষীরপাই একটি পৌর শহরে রূপান্তরিত হয়। O'Malley-এর গেজেটিয়ারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে যে কীভাবে ক্ষীরপাই শহরটি অন্যান্য ব্যবসা, তাঁত শিল্পের মতো ব্যবসা, অন্যান্য ব্যবসার জন্য বিখ্যাত ছিল। ডাচ-ফরাসি ইংরেজি বণিকরা লাভজনক ব্যবসার জন্য এখানে ভিড় করত। একসময় এই ক্ষীরপাই শহরটি ছিল ব্যবসায়িক বিষয়ের কেন্দ্রস্থল যেখানে লোকজন যাতায়াত করত। এই নতুন মিষ্টান্ন বাবরশা জন্মানোর কারণ বা প্রধান কারণ হল ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য, নগদ প্রবাহ এবং প্রচুর অর্থ লেনদেন। এছাড়াও, এই মিষ্টি তৈরির কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত- দুধ, ঘি ইত্যাদি সেই সময়ে প্রচুর পরিমাণে ছিল এবং সেই সাথে এই কাঁচামালের দামও এখনকার তুলনায় যুক্তিসঙ্গত ছিল। উল্লেখ করা যোগ্য আরেকটি উদাহরণ হল যে এই মিষ্টি মাংসটি নিছক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তৈরি হয়েছিল।

লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্য এমন একটি জিনিস যা বাবরশার মতো প্রাচীন, ঐতিহাসিক মিষ্টির মধ্যে বেশ দৃশ্যমান। প্রথমত, এই মিষ্টি বিতরণ ক্ষীরপাই এবং এর আশেপাশে সীমাবদ্ধ। যদিও পরে নগরায়নের কারণে বাবরশা বিতরণ সম্ভব হয়। বাবরশা এমন কিছু যার উপস্থিতি ক্ষীরপাই শহরের মুকুটে হীরার মতো জ্বলজ্বল করে। দ্বিতীয়ত, এই মিষ্টির নামকরণের পিছনে পূর্বোক্ত পৌরাণিক কাহিনীগুলি আমরা ইতিমধ্যেই আলোচিত। তৃতীয়ত, বাবরষার ছাঁচ স্পষ্টভাবে লোকশিল্পের অন্তর্গত। চতুর্থত, মিষ্টান্নের রূপের সামগ্রিক উপস্থাপনা লোকশিল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়। পঞ্চমত, এই শিল্পে কোন ধ্রুপদী আনুষ্ঠানিকতা নেই এবং সর্বোপরি এই শিল্পের কারিগর ও ব্যবসায়ীরা বংশগতভাবে এর প্রবণতা ও উত্তরাধিকারকে এগিয়ে রেখেছেন।

বাবরশা বিতরণ না হওয়ার অন্যতম কারণ এই মিষ্টির ভঙ্গুর গঠন। মেদিনীপুরের গায়নাবড়ির মতো এই সুন্দরভাবে তৈরি মিষ্টিটি যাতে প্রক্রিয়ায় ভেঙে না পড়ে এবং এই মিষ্টি কীভাবে পরিবহন করা যায় সে সম্পর্কে বিভিন্ন জল্পনা ও পরামর্শ অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

শঙ্কর বৈরাগী একটি প্রতিবেদনে বলেছেন যে তিনি ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে 'রাজ্য লোকসংস্কৃতি উৎসব'-এ অংশগ্রহণ করেছিলেন যেখানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় বাবরশাকে প্রচার ও প্রসার করেছিলেন। প্রায় ১০ বছর আগে লোককাহিনী উৎসবে বাবরশা যেমন বিক্রি হয়েছিল, তেমনই এই বিশেষভাবে তৈরি মিষ্টির প্রতি প্রচুর লোক আগ্রহ নিয়েছিল। তার দৃঢ় বিশ্বাস, এ দিন ফোন এলেও অন্যান্য মিষ্টান্ন, বিক্রেতারা এবং তিনি এ ধরনের মেলায় যাবেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, একবার ভালোভাবে তৈরি বাবরশাকে কেউ খেয়ে ফেললে, এই ঐতিহাসিক ও আকর্ষণীয় মিষ্টির স্বতন্ত্রতা ও সৌন্দর্যে তিনি বিস্মিত ও মুগ্ধ হতে বাধ্য।

ক্ষীরপাই পৌরসভার ডেইরি থেকে কোটেশন —

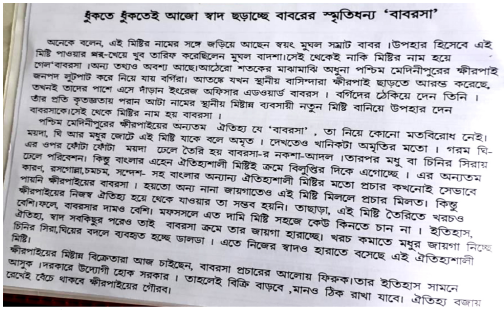

ধুঁকতে ধুঁকতেই আজো স্বাদ ছড়াচ্ছে বাবরের স্মৃতিধন্য 'বাবরসা'

অনেকে বলেন, এই মিষ্টির নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন স্বয়ং মুঘল সম্রাট বাবর ।উপহার হিসেবে এই মিষ্টি পাওয়ার পর-খেয়ে খুব তারিফ করেছিলেন মুঘল বাদশা।সেই থেকেই নাকি মিষ্টির নাম হয়ে গেল'বাবরসা ।অন্য তথ্যও অবশ্য আছে।আঠেরো শতকের মাঝামাঝি অধুনা পশ্চিম মেদিনীপুরের ক্ষীরপাই জনপদ লুটপাট করে নিয়ে যায় বর্গিরা। আতঙ্কে যখন স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষীরপাই ছাড়তে আরম্ভ করেছে, তখনই তাদের পাশে এসে দাঁড়ান ইংরেজ অফিসার এডওয়ার্ড বাবরস । বর্গিদের ঠেকিয়ে দেন তিনি । তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরান আটা নামের স্থানীয় মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী নতুন মিষ্টি বানিয়ে উপহার দেন বাবরসাকে।সেই থেকে মিষ্টির নাম হয় বাবরসা ।

পশ্চিম মেদিনীপুরের ক্ষীরপাইয়ের অন্যতম ঐতিহ্য যে 'বাবরসা' , তা নিয়ে কোনো মতবিরোধ নেই। ময়দা, ঘি আর মধুর জোটে এই মিষ্টি যাকে বলে অমৃত । দেখতেও খানিকটা অমৃতির মতো । গরম ঘি-এর ওপর ফোঁটা ফোঁটা ময়দা ঢেলে তৈরি হয় বাবরসা-র নকশা-আদল ।তারপর মধু বা চিনির সিরায় ঢেলে পরিবেশন। কিন্তু বাংলার এহেন ঐতিহ্যশালী মিষ্টিই ক্রমে বিলুপ্তির দিকে এগোচ্ছে । এর অন্যতম কারণ, রসগোল্লা,চমচম, সন্দেশ- সহ বাংলার অন্যান্য ঐতিহ্যশালী মিষ্টির মতো প্রচার কখনোই সেভাবে পায়নি ক্ষীরপাইয়ের বাবরসা । হয়তো অন্য নানা জায়গাতেও এই মিষ্টি মিললে প্রচার মিলত। কিন্তু ক্ষীরপাইয়ের নিজস্ব ঐতিহ্য হয়ে থেকে যাওয়ার তা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, এই মিষ্টি তৈরিতে খরচও বেশি।ফলে, বাবরসার দামও বেশি। মফসসলে এত দামি মিষ্টি সহজে কেউ কিনতে চান না । ইতিহাস, ঐতিহ্য, স্বাদ সবকিছুর পরেও তাই বাবরসা ক্রমে তার জায়গা হারাচ্ছে। খরচ কমাতে মধুর জায়গা নিচ্ছে চিনির সিরা,ঘিয়ের বদলে ব্যবহৃত হচ্ছে ডালডা । এতে নিজের স্বাদও হারাতে বসেছে এই ঐতিহ্যশালী মিষ্টি।

ক্ষীরপাইয়ের মিষ্টান্ন বিক্রেতারা আজ চাইছেন, বাবরসা প্রচারের আলোয় ফিরুক।তার ইতিহাস সামনে আসুক ।দরকারে উদ্যোগী হোক সরকার । তাহলেই বিক্রি বাড়বে ,মানও ঠিক রাখা যাবে। ঐতিহ্য বজায় রেখেই বেঁচে থাকবে ক্ষীরপাইয়ের গৌরব।

বাবরশা তৈরির প্রক্রিয়া :

১) এক কেজি ময়দা সাথে, যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ ঘি (৬০০ গ্রাম) যোগ করা হয় যাতে মিশ্রণটি নরম হয়। এখানে ঘি প্রচলিত সফটনারের বিকল্প হিসেবে কাজ করছে এবং মিশ্রণটি পর্যাপ্তভাবে ম্যানুয়ালি মাখানো হয়।

২) এর সাথে জল যোগ করা হয়। জলের পরিমাণ মিষ্টান্নকারীর দক্ষতার উপর নির্ভর করে।
মিশ্রণে জল এমনভাবে যোগ করা হয় যাতে একটি পাতলা মিশ্রণ পাওয়া যায়। এই মিশ্রণ প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত, ঘি যুক্ত একটি ধাতব কড়াই একই সাথে গরম করা হয়।

৩) এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত ছাঁচগুলি সন্দেশে ব্যবহৃত ছাঁচগুলির মতো নয়, ছাঁচগুলি ফুটন্ত ঘি এর উপরে কড়াইতে এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে ছাঁচগুলি গরম ঘিতে ডুবে যায়। বাবরশাসগুলি যে ছাঁচে স্থাপন করা হয় তার আকার ধারণ করে।

৪) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, পিতলের বাটিটি পাতলা মিশ্রণটি তুলে নেয় এবং বাটিটি কৌশলে এমনভাবে ধরে থাকে যাতে তর্জনীটি বাটির সামনের দিকে কাত হয়। মিশ্রণটি তারপর তর্জনীর ডগা দিয়ে ফুটন্ত ঘি দিয়ে ছাঁচে ঢেলে দেওয়া হয়। অনেকে মিশ্রণটি ঢালার জন্য ছোট ছিদ্রযুক্ত বাটিও ব্যবহার করেন। ছাঁচে পড়ে থাকা ফোঁটাগুলি আকার এবং আয়তনে বৃদ্ধি পায়।

৫) দক্ষ কারিগররা ফোঁটাগুলি এমনভাবে ফেলে যে প্রান্তগুলি পাতলা হয়ে যায় এবং মাঝখানের অংশটি ছিদ্রযুক্ত হয়। এছাড়াও, নিশ্চিত করুন যে প্রান্ত এবং কেন্দ্রের মধ্যবর্তী অংশটি আরও ঘন হয়ে উঠেছে। ঠিকমতো ভাজা হয়ে গেলে অর্থাৎ বাদামি হয়ে গেলে একটি তারের চালনি দিয়ে তুলে একটি বড় প্লেটে একের পর এক সাজানো হয়।

৬) এখানে উল্লেখ্য যে মিষ্টান্ন তৈরিতে আগে লোহার ছাঁচ বা শেকল ব্যবহার করা হতো, এখন মাটির ছাঁচ ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও, ভাজার সাথে সাথে এটি চিনির সিরাপে ডুবানো হয় না। যখন পরিবেশন করা হয় তখন এটি চিনির সিরাপে ডুবানো হয়, তবে ডুবানোর ফলে বেশি রস লাগে, তাই মিষ্টান্নটি একটি প্লেটে রাখা হয় এবং সিরাপটি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। জুস করার জন্য কাঠের পরিবর্তে এখন স্টিলের স্প্যাটুলা ব্যবহার করা হচ্ছে। চিনির রসের কথা বললে এর রস বেশ ঘন।

৭) এটি ঘন, রসগোল্লায় যে রস ব্যবহার করা হয় তা শরবতের মতো পাতলা নয়। এটি যতটা সম্ভব কম জল দিয়ে ঘন করা হয়। এটি দেখতে ঠিক মধু বা নোলেন গুড়ের মতো। রস কয়েকদিন রাখতে চাইলে মাঝেমধ্যে গরম করতে হয়। মজার ব্যাপার হল বাবরশায় গরম রস রাখলে তা সঙ্গে সঙ্গে গলে যাবে, তাই সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হলেই রস ব্যবহার করতে হবে।

আলাদার অনন্যতা:

মুখ গলে যাওয়া, ভঙ্গুর, বাবরশা হল মিহি গমের ময়দার মিশ্রণ, অত্যন্ত ঘন চিনির সিরাপে ডুবানো ঘি। আকারটি ৩ ইঞ্চি থেকে একটি সুশৃঙ্খল বড় ডিশের আকারে বাড়ানো যেতে পারে যা এক ফুট বা তার বেশি। ক্রেতাদের কাছে সাধারণত তিন ইঞ্চি মাপের বাবরশাসই সবচেয়ে জনপ্রিয় বা সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়। উৎসব বা মেলায় বিক্রির জন্য বা মাঝে মাঝে বিক্রির জন্য তৈরি করা হয় বড়গুলো।

একটি সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া, এই মিষ্টি তৈরির মিষ্টান্নকারীদের খুবই দক্ষ এবং খুব ধৈর্যশীল হতে হয়। এক কেজি ময়দা দিয়ে বাবরশা তৈরি করতে ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা সময় লাগে যা তৈরির জন্য প্রচুর মানুষের দক্ষতা ও ধৈর্যের প্রয়োজন হয় কারণ আকৃতি পাওয়া কঠিন।

ক্ষেত্র পরিদর্শনের সময় জানা গেল মিঃ শঙ্কর বৈরাগী বলেছিলেন যে, এই বিশেষ মিষ্টির নাম বাবরশা যেহেতু মুঘল সম্রাট বাবর ক্ষীরপাইয়ের কাশীপুরে গিয়েছিলেন এবং তিনি পরাণ ময়রার কাছ থেকে এই খাবারটি খেয়েছিলেন এবং জনাব শঙ্কর বৈরাগী তা শুনেছিলেন তার বাবা এবং দাদার কাছ থেকে। তিনি আরও বলেন, সম্রাট এই মিষ্টির অনন্য স্বাদে খুশি হয়ে এর নাম দিয়েছেন বাবরশা। পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে বাবরশাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করা হয়, যদিও এটি এখন সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে পরিচিত। এটি ময়দা, মধু এবং চিনি দিয়ে প্রস্তুত একটি শুকনো খাবার। এটি চিনি-ভিত্তিক ঘন সিরাপে সিদ্ধ করা হয়। সাধারণভাবে, খাবার ঠান্ডা পরিবেশন করা ভাল, তবে সামান্য তাপ প্রায়ই গ্রহণযোগ্য। তবে, পাওনা বেশ আনন্দদায়ক হবে। দুপুরের খাবার বা রাতের খাবারের মেনুতে বাঙালির অতিথিরা সত্যিই অবাক হবেন। এটি বাংলার সেরা মিষ্টি। অতীতে বাংলা পয়লা বৈশাখে বাবরশা দিত, একটি বাংলা ক্যালেন্ডারের ছুটি। বাবরশার একটি স্বতন্ত্র গন্ধ, টেক্সচার এবং মুখের অনুভূতি রয়েছে। স্বাদ, একটি নমনীয় মুখ-অনুভূতি এবং ঘ্রাণ সহ এর অদ্ভুত এবং সহজাত অর্গানলেপটিক গুণাবলী এটিকে সারা বিশ্বের মানুষের সম্মান এবং পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেছে।

মানুষের ক্ষমতা :

মিষ্টির স্বতন্ত্রতা প্রস্তুতির প্রতিটি পর্যায়ে মানুষের দক্ষতার ফল। তাজা জমিন সৃষ্টি মানুষের প্রতিভার ছাপ দেখায়। ছাঁচের টেক্সচার অনুসারে বিভিন্ন চাপ ব্যবহার করে দক্ষ হাত দ্বারা এই মিষ্টিগুলি তৈরি করা হয়। এখানে, উপাদানগুলি তাপ এবং বাইরের যান্ত্রিক শক্তির সাথে মিশে এমন কিছু তৈরি করে যা আমাদের বোঝার ক্ষমতাকে অস্বীকার করে। এভাবেই চূড়ান্ত সৃষ্টিকে বলা হয় আমাদের নিজস্ব বাবরশা। পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে মিষ্টতা এবং সিরাপী টেক্সচার কীভাবে ভারসাম্যপূর্ণ থাকে তার কারণে এটি মুখে জল আসে। প্রধান ড্র হল এর স্বতন্ত্র ফর্ম এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া। এই মিষ্টির সামগ্রিক গঠন উন্নত করতে মধু এবং

রাবড়ির মতো বিভিন্ন উপাদানের সাথে একত্রিত করা যেতে পারে। একটি অর্কেস্ট্রায় একজন কন্ডাক্টর হিসাবে, কারিগর তার ইতিহাস সংরক্ষণ করার সাথে সাথে এই পারফরম্যান্সটিকে একটি সফল শেষের দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম।

সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবন :

সুন্দরভাবে সাজিয়ে বাবরশা সেলের সূক্ষ্ম উপস্থাপনা শৈলীতে লোকসংস্কৃতির ছাপ ছিল। উপস্থাপনের এই শৈলী এবং সমৃদ্ধ সংস্কৃতি প্রায় দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। বাবরশাকে বিক্রির জন্য মাটির কলকারখানায় সাজানো হতো এবং শরবত বয়ামে রাখা হতো। এখন সেই ধরনের মালসা আর বিশেষ নেই। তার বদলে আজকাল কাগজ ও পলিথিনের প্যাকেট ব্যবহার করা হয়। মিষ্টান্ন শিল্পে এরকম অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল গাওয়া ঘির পরিবর্তে ডালডা ব্যবহার, লোহার ছাঁচের পরিবর্তে মাটির ছাঁচ ইত্যাদি। এই ছাঁচগুলি ক্ষীরপাইয়ের বাজারে সহজলভ্য ছিল কিন্তু এখন আর জড়িত নয়।

২৩ বছর আগে ২৬ তারিখ ১৯৯৯ সালের একটি দিন ছিল বৃহস্পতিবার এবং এই দিনটি ছিল যখন ক্ষীরপাইয়ের বাজার বা হাট একটি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে আয়োজন করা হয়েছিল তবে এটি খুব বিরল যে কেউ প্রতিটি দোকানে একটি ছাঁচ খুঁজে পায়, ছাঁচগুলি বিশেষ করে একটিতে পাওয়া যায়। বা সর্বাধিক দুটি দোকান। শঙ্কর পাল, একজন মধ্যবয়সী দক্ষ কারিগরকে এখনও ছাঁচ তৈরি করতে বলা হয়েছিল এবং কলকাতার লোকেরা এখনও ইতিহাসের স্মৃতি এবং মিষ্টির সৌন্দর্যের জন্য এই বিশেষভাবে তৈরি করা ছাঁচগুলির সন্ধানে যায়।

উপসংহার :

নিবন্ধটি মূলত এই সত্যটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে যে একসময়ের বিখ্যাত বাবর্শা যা রাজ্য ও দেশের কোণে কোণে পৌঁছেছিল তা এখন বিলুপ্তির পথে। কাঁচামালের মূল্যস্ফীতি, মিষ্টির বিক্রি কমে যাওয়া এবং এর ফলে নগণ্য মুনাফা বা কখনও কখনও কিছুই না হওয়ায় কারিগর, মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা ব্যাপক আর্থিক সমস্যায় পড়েছেন।

মিষ্টান্নকারীরা ক্রমহ্রাসমান ব্যবসা এবং এই বিশেষত্ব সম্পর্কে কম প্রচার সম্পর্কে অভিযোগ করছেন বলে মনে হচ্ছে। অন্যরা এই ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়েছে এবং অন্য পেশা গ্রহণ করেছে যেখানে তারা কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারে। বাবরশা ভৌগোলিক নির্দেশনা পেলে, বাবরশা নির্মাতা তাদের জীবিকা টিকিয়ে রাখতে উপকৃত হবেন। সরকার WBNUJS-এর মাধ্যমে ভৌগোলিক সূচক দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে।

রেফারেন্স :

১. শ্যামল বেরা, "লোকসংস্কৃতি গবেশনা ভলিউম ১২ নং ২ ১৯৯৯", বাংলার মিস্তান্না: বাবরষা, পৃষ্ঠা নম্বর- (৩৪২-৩৪৮) ।
২. প্রণব রায়,"বাংলার খাওয়ার", জুলাই ১৯৯৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা (১১০-১১৩)।
৩. বিখ্যাত বাঙালি মিষ্টি এবং তাদের আকর্ষণীয় গল্প, ৩ জুলাই, ২০২১ (https://thebengalitoday.com/2021/07/famous-bengali-sweets.html)
৪. Potpuri, https://www.ambujanectia.com/ wp-content/uploads 2022/03/Por-Purri-on-Sweets-Of-Bengal-Cover-With-pages-08-04-21.pdf

পুরাভূমি ঝাড়গ্রামের লোক উৎসব : "টুসু উৎসব"

হরিপদ ঘোষ

পৃথিবীর অন্যতম পুরাভূমি- ঝাড়গ্রাম জেলার মাটি মানবসভ্যতার আঁতুড়ঘরের মাটি। আদিমানবের পদচিহ্ন শোভিত পুরাভূমি ঝাড়গ্রামের বিনপুর থানার কংসাবতী ও তারাফেনী নদীর সঙ্গম স্থল 'সিজুয়া' নামক স্থানে প্রাপ্ত খ্রী:পূ: ৮০০০ বছরের প্রাচীন 'জীবাশ্ম'; যা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম জীবাশ্ম। সেই অরণ্যময় ঝাড়গ্রামের পুরাভূমিতে বাঁশপাহাড়ী থেকে হাতিবাড়ি; লালগড় থেকে সাঁকরাইল, নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে এখন যারা বসবাস করেন তাঁরা সেই আদিমানবদের বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার বহন করেন। হাজার হাজার বছরের চলমান ধারার প্রবাহে এখানে বহু বিচিত্র জাতি-সত্তার ধারাবাহিক সংঘাত-সমন্বয় মিলন-মিশ্রণের যে সংশ্লেষণ ঘটে চলেছে- তারই পরিচয় বিধৃত রয়েছে পুরাভূমি ঝাড়গ্রামের পরব-পার্বন, উৎসব-মেলার সুমধুর শিল্প-সুষমায়।

লোকসংস্কৃতির এক সমৃদ্ধশালী পীঠভূমি ভারতের পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গ তথা সপ্তভূম খণ্ড বা সাতভূম (শিলদা)- যার বহুল পরিচিতি 'বঙ্গীয় ঝাড়খণ্ড' রূপে- তার অন্যতম কেন্দ্রভূমি বর্তমানে ঝাড়গ্রাম জেলা তথা বেলপাহাড়ী অঞ্চল। দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী লোকসমাজই এখানের সংস্কৃতির বাহক ও ধারক। এই অঞ্চলের জনপ্রিয় লোকপ্রিয় সমৃদ্ধ সংগীত- লোক সঙ্গীত- 'টুসুগান'।

ঝাড়গ্রাম তথা জঙ্গলমহলের ধর্মীয় আবরণের বাইরে উৎসবের সবটুকু আনন্দ সমাজে বসবাসকারী সকল ধর্ম-জাতি-সম্প্রদায়ের মানুষ প্রাণভরে উপভোগ করে। লোকউৎসবের এই নিগূঢ় তথ্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে একটি স্থানীয় গানে -

জগৎ ঘুরি দেখনু মুই নানা রঙের গাইরে
নানা রঙের গাই।
সবু দুধের একই রঙ সাদা ছাড়া নাইরে
সাদা ছাড়া নাই।।

সহজ কথা, সহজ ভাবের গান; কিন্তু অসাধারণ উপলব্ধি— ঝাড়গ্রাম পুরাভূমি তথা জঙ্গলমহলের উৎসব-বার্তা। জাতি-বর্ণ, উচ্চ-নীচ-ধর্ম ভেদাভেদহীন - 'মিলন মেলা'-ই সেই উৎসবের অঞ্চল। তাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অংশ গ্রহণই লোক উৎসবের মূল বৈশিষ্ট্য।

'সময় চলিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়'- কিন্তু পুরাভূমি ঝাড়গ্রামের লোক উৎসব তার নিজস্ব ধরণকে ধারণ করে, 'কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল' হয়ে আজও আপন গতিতে আপনি বিকশিত। ঝাড়গ্রামের মানুষ, মানুষের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস, ঝাড়গ্রামের পুরাতত্ত্ব ও পুরাভূমির ইতিহাস জানতে হলে- এই পরব-পার্বন; উৎসব-মেলায় এসে একাত্ম হয়ে হারিয়ে যেতে হবে; হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে জানতে হলে, হৃদয়কে খুঁজতে হলে সুনিপুণ তুলির রেখায় আঁকতে হবে লোক উৎসবের শত শত স্থিরচিত্রের এল্‌বাম।

পুরাভূমি ঝাড়গ্রামের তথা জঙ্গলমহলের বাংলা ভাষাভাষী লোকসমাজের সব থেকে দীর্ঘ সময় বিস্তৃত এবং ঐতিহ্যময়-জাঁকজমক পূর্ণ লোক উৎসব- 'টুসু উৎসব'। লোকসংস্কৃতির অন্যতম সম্পদ বা বলা ভালো পুরাভূমি ঝাড়গ্রামের

লোক-সংস্কৃতির প্রধান সম্পদ 'টুসু উৎসব'। ঝাড়গ্রামের লোকসংস্কৃতিকে জানতে হলে প্রথমেই জানতে হবে তার সংস্কৃতি ও তাৎপর্যকে। সংস্কৃতির বিজ্ঞান সম্মত সংজ্ঞা দিয়েছেন হারসকোভিটস্ঃ "Culture is the man-made part of the environment." মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশের অঙ্গই হল 'সংস্কৃতি'। টুসু হল পুরাভূমি ঝাড়গ্রামের সংস্কৃতির লৌকিক শস্যদেবী। প্রধানতঃ অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির পর ১লা পৌষ প্রথম টুসু পাতা হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা চিঁড়ে ভাজা, চালভাজা, কুর্থি ভাজা, ধানের খই গুড় ভোগ হিসেবে টুসুকে দেওয়া হয়। কুলুঙ্গিতে ফুল (গাঁদা) দিয়ে টুসুর পূজা করা হয়। পাড়ার এক জায়গায় বসে মেয়েরা টুসুকে নিয়ে এসে গান গায়। পৌষ সংক্রান্তির দিন এই 'ভাসান উৎসব'-ই 'টুসু উৎসব' বা 'টুসু পরব'। তবে টুসুর গানে সাদৃশ্য থাকলেও অনুষ্ঠান ও উপচারে অঞ্চল বিশেষে পার্থক্য লক্ষণীয়। যেমন বর্ধমান, মানভূম, মল্লভূম অঞ্চলে ঘরের কুলুঙ্গিতে একটি মাটির সরার মধ্যে কতকগুলি গোবরের নাড়ুর উপর পিটুলীগোলা ছড়িয়ে দিয়ে তার উপরে গাঁদা, সরষে প্রভৃতি মরসুমি ফুল দেওয়া হয়। কোন কোন অঞ্চলে টুসুর ঘট পাতা হয়। যত ব্রতচারিণী তত ঘট। কোন জায়গায় একটি ছোট কুণ্ডের মধ্যে দেওয়া হয় গোবর। বাঁকুড়ার খাতড়া, রাণীবাঁধ অঞ্চলে শালপাতার ঠোঙায় ২০-৩০ টি শাল দাঁতন আর ফুল দিয়ে টুসু সাজানো হয়। ধান চাল পরিমাপের কাঠের পাত্র (পাই, কণা)-কে টুসুর প্রতীক হিসেবে পূজা করা হয়। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর অঞ্চলে টুসু পূজিতা হন মাটির আলোখেলায়। আবার বাঁকুড়ার কোন কোন অঞ্চলে মাটির মালসাকে সাদা রং করে লাল-সবুজের ফোঁটা দিয়ে নবান্নের তুষ ভর্তি করে গাঁদা-সরষে ফুল দিয়ে পূজা করা হয়। কোথাও গোলাকার মাটির বেদী তৈরী করে 'কুচফল' দিয়ে সাজিয়ে টুসু পূজো করে। দক্ষিণ-পশ্চিম মানভূম, ধলভূম, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ার পরকুল, বেলপাহাড়ী, লালগড়, গোপীবল্লভপুর অঞ্চলে বিশেষ করে ঝাড়গ্রাম জেলার ও পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে মূর্তিপূজার প্রাধান্য।

টুসু পরবে কুমারী মেয়েদের প্রাধান্য হলেও; নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা-শিশু-কিশোর-কিশোরী যুবক/যুবতী ৮ থেকে ৮০ সকলেরই সানন্দ অংশগ্রহণ। টুসু পূজায় পুরোহিত কুমারী মেয়েরাই। এটি হল এই পরবের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। 'টুসুমণি' বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন নামে পূজিতা। ধলভূমে - 'টুসু', বাঁকুড়ায় টুষটুষলা বা তুষু; মানভূম ঝাড়গ্রামে 'টুসু' নামে সমাদৃত। তাই 'টুসু' একাধারে লোকায়ত সমাজ, অষ্ট্রিক এবং হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সম্মিলিত রূপ'। ড. সুহৃদ কুমার ভৌমিকের মতে- "টুসু হল একটি সংকর ধারণা; যা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, মাহাত (কুর্মী) সম্প্রদায় ও কোল গোষ্ঠীর নানা উপাদান নিয়ে প্রস্তুত।" প্রকৃতির দিক থেকে এটি- "Harvest festival thanks giving service for harvest." (সনৎ কুমার মিত্র- টুসুগানে সমাজ মনস্কতা - পৃ. ১১৫)

ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে টুসুর প্রচারভূমি অঞ্চলের

লোকায়ত এবং অষ্ট্রিক সমাজের মেয়েলি বিবাহ-গীতের রীতি ও সুর সহযোগেই 'টুসু আরাধনা'। তাই এগুলিতে দেবী আরাধনার কোনো কথা নেই, নেই দেব-দেবীর বন্দনা গীত; আছে প্রাত্যহিক জীবন-অভিজ্ঞতা; এর জন্য পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের ঝাড়গ্রামের লোকসমাজ বেছে নেয় পৌষ মাসটিকে; যখন নতুন ফসলে পূর্ণ গোলা; ধান কাটা; ধান ঝাড়া হয়ে যাওয়ার উদ্বেগ মুক্তির পর মানুষের মনে আনন্দ: অবকাশ; অর্থের সংস্থান। তাই টুসু ব্রত- প্লাবিত সমাজ ও শস্য কেটে ঘরে তোলার পর আনন্দ উৎসব পালনের জন্য নির্বাচিত করে নেয় পৌষমাসের মকর সংক্রান্তির দিনটিকে। শাক্তপদাবলীর 'আগমণী-বিজয়া'-র গানগুলিতে যেমন দেবী জগৎ জননী উমাকে বাঙালীঘরের কন্যারূপে আপন করে নেওয়া হয়েছে; তেমনি টুসুও বাঙালীর লোকগৃহে কন্যা রূপেই সমাদৃতা। তাই টুসুকে বন্দনাও করা হয় ঘরের আদরের দুলালী রূপে- কন্যারূপে

"পোষমাসেতে টুসু তুইললম, চন্দন কাঠের চৌদলে।
যদি টুসু দয়া কর, রাইখব সনার মন্দিরে।।" (স্বরচিত- টুসু গান)

আর একটি গানে বাৎসল্যভাবের পরিচয় পাই —

"কার বাড়িতে গেছলে টুসু, কে করে তুমার সেবা।
পায়ে তুমার রক্ত চন্দন গলেতে ফুলের মালা।।"
"সুবল কার অবনি।
হেলে দুইলে আইস্‌চে গো টুসুমণি
সুকল কার অবনি।।"

যেহেতু টুসু পূজার নির্দিষ্ট কোনো মন্ত্র নেই; তাই পুরোহিতেরও প্রয়োজন নেই। গানের মাধ্যমেই তার আবাহন- আরাধনা-বিসর্জন। ঝাড়গ্রামের বাংলা ভাষাভাষী লোক-গোষ্ঠীর ঘরে ঘরে চলে টুসু-আগমনীর প্রাক আয়োজন- অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি (ছোটমকর) থেকে পৌষ সংক্রান্তি (বড়মকর) পর্যন্ত। তারই ফলশ্রুতিতে এই দীর্ঘ সময় ঝাড়গ্রামের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয় টুসু গানের তালে তালে মাদলের মাদকতাময় সুমধুর সুরের মূর্ছনা ও জীবনের জলছবি টুসু গানের কথায়। টুসু-গানের সুর ধীর লয়ের কাহারবা তাল- ৮ মাত্রা বাজনার বোল, ধা-ধিন-ধিন-ধা / না-তিন-তিন-তা। কিছু গানের সুরে বৈষ্ণবকীর্তন সুরের মিশ্রণের প্রভাব লক্ষণীয়। এই গানগুলি পৌরাণিক কাহিনীকে কেন্দ্র করে- স্বরচিত গান

রামায়ণ - অরণ্যকাণ্ড

"পঞ্চবটীর পাতরকুটীরে
রাবণ হরিল গো সীতারে।
মায়াবী মারীচ দেখ সুবর্ণ মৃগের রূপ ধরে।
স্বর্ণমৃগে ধরে দাও সীতা বলে রামেরে।।
ভিখারীর বেশ ধরে হরিল গো সীতারে।
পঞ্চবটীর পাতার কুটিরে।।"

(সীতাহরণ)।।

মহাভারত- (ভীষ্মপর্ব)- স্বরচিত টুসু গান —

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে।

সপ্তরথী ঘিরিল যে অভিরে।
শকুনির পরামর্শে চক্রব্যূহ রচনা করে।
চক্রব্যূহে প্রবেশ করে বাহির হতে না পারে।
অভিমন্যু পড়িল যে সমরে।
কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে।
মহাভারত- ভীষ্মপর্ব- (অভিমন্যু বধ)

আর এক ধরনের সুর আছে চটুল ছন্দের, দ্রুতলয়ের তাল দাদরা- ৩/৬ মাত্রার এক- ধা ধিন্ না / তা তিন্ না।

পুরাভূমি লোকসংস্কৃতির পীঠস্থান ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে টুসু পুজোর তিনটি রসপর্যায়। (১) টুসুর বরণ 'বোধন' (২) মকর সংক্রান্তির পর্ব রাত্রিতে - 'জাগরণ'- (৩) পরের দিনে পুকুর / দীঘি / নদীতে বিসর্জন। বিসর্জনের সময় ব্রতচারিণীদের কণ্ঠে বেজে উঠে 'বিসর্জনের বাজনা' স্বরূপ বিরহের করুণ আর্তি—

"তিরিশ দিন রাখিলাম মাগো
তিরিশটি ফুল দিয়ে গো।।
আর রাখিতে পারিনি গো।
মকর হইল বাদি গো।।
টুসু যাবে ইবছরের মতন।
তোমরা হের সবে চাঁদ বদন।।"

- অবশ্য সঙ্গে থাকে দেবদেবীর বিসর্জনের - "আসছে বছর আবার হবে"- এর মতোই গভীর আশ্বাসবাণী-

"টুসু যাও মা জলে
আইসছে বছর আইন্‌ব গো টহোবরে (সাড়ম্বরে)।।"

- এই টুসুপরব (মকরপরব) উপলক্ষে টুসু ভাসানের দিন; তারপরও কিছুদিন (৩-৮ দিন) ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে মেলা-পার্বন বসে। যেমন- গোপীবল্লভপুর- ১-২ ব্লকে, সাঁকরাইল ব্লকের রগড়া অঞ্চলে টুসু ভাসানের দিন ভোরবেলা 'মকর স্নান' করে কিশোর-বালক-যুবকেরা সুবর্ণরেখানদীর তীরে 'মকর কুড়িয়া' জ্বালায়। 'মকর কুড়িয়া' বেলপাহাড়ী, লালগড়, জাম্বনী ব্লকেও জ্বালানো সহ বোমা -বাজি পোড়ানোর রেওয়াজ আছে। বাঙালীর দুর্গাপূজার মতো 'মকর পরব'কে ঝাড়গ্রামে 'জাতীয় উৎসবের' মর্যাদা দিয়ে স্থানীয় বিদ্যালয়-কলেজগুলিতে ৩ দিন ছুটি ঘোষণা করা হয়। শিক্ষকমশাইরা ছড়া কেটে ছাত্রদের বলেন — "চাঁউড়ি বাঁউড়ি-মকর / এখাইন-ঘেঘাইন সাঁই-সুঁই / তারপর দিন আসবি তুঁই।"

কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ, মহাভারতের পৌরাণিক কাহিনী, জনজাতির সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সহ, জঙ্গলমহলে রেল লাইন স্থাপন, নীলচাষ খেলা-ধূলা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, পোশাক-পরিচ্ছদ সবই অনায়াসে আশ্রয় পায় টুসুগানে। উগ্র সাজসজ্জা দেখে গ্রাম্য লোক যুবতীর প্রতিক্রিয়া –

"হিপি কাটিন চুল রাইখেছে।
চোখেতে চশমা পরা।।

হিপি রাইখে যতই শঁক দেখাও।
ও তোর হিপির ভিতর ছারপকা।।"

'গৌরীদান' প্রথা প্রসঙ্গে মেয়েটি তীব্র অভিমান করে বলে -

"ছোট ছিলম ভাল ছিলম।
ছিলম মায়ের দুলালি।।
ছোট বিঁহা দিলে মা কেনে।
আমি ঝাঁপ দিব দইরার মাঝে।।"

প্রাচীনপন্থী বৃদ্ধস্বামী - যুবতী স্ত্রীর শহুরে সাজপোশাক। যুবতী স্ত্রী বলে- বৃদ্ধ স্বামীকে -

"পইরব বুড়া বিলাতি শাড়ি।
ও তোর কি ধারি গো কি ধারি।।
বিকে দিব গো ঘর বাড়ি।
পইরব বুড়া বিলাতি শাড়ি।।"

টুসুগানে নাট্যধর্মী অসংলগ্ন চিত্র ধরা পড়ে-

"বড় বড় সিপাই গুলি।
কেমন সুন্দর সাইজেছে।।
হাঁটুগাইড়ে বন্দুক চালায়।
বড় পাহাড় ভাইঙ্গেছে।।
খেজুর গাছে মেজুর বইসেছে।
মেজুর খেইদ না মধু আছে।।"

এখানে হঠাৎ ভূমিকা ছাড়াই শুরু হচ্ছে নাটকীয়ভাবে গানটি কতকগুলি অসংলগ্ন চিত্র দিয়ে— পাহাড় ভেঙে উঠে আসছে বন্দুকধারী সিপাই; খেজুর গাছে মেজুর (ময়ূর) বসেছে; ময়ূরটি মধু খাচ্ছে।

পুরাভূমি ঝাড়গ্রামের শীতের আকাশ-বাতাস-মাঠ-ঘাট-নদী-নালা সবুজ ঘাসের রুক্ষ শুষ্ক শূন্যতাকে এক সময় কলমুখরিত করে তুলত যে টুসু-সংগীত-প্রবাহ আজ তা বিলুপ্তির পথে। যদিও অধুনা সরকারী প্রচেষ্টায় গ্রামাঞ্চলের লোক সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নানা উৎসব-মেলা, লোকশিল্পীদের সাম্মানিক ভাতা, লোকশিল্পীদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। কিছু লোকশিল্পী উন্নত প্রযুক্তির বাদ্যযন্ত্র সহযোগে লোককণ্ঠজাত গানগুলিকে শিক্ষিত মুন্সীয়ানায় শহরের সুসজ্জিত মঞ্চে পরিবেশন করছেন। সেগুলির মধ্যে টুসু গানের মৌলিকতা। মাধুর্য্য লালিত্য নেই, আছে শহুরে ভাব। আধুনিক সভ্যতার আগ্রাসনে বিলুপ্ত টুসুগানগুলির স্মৃতিচিহ্নকে সুদূর ভবিষ্যতে হয়ত এই নব প্রজন্মের নবীন শিল্পীদের পরিবেশনাতেই খুঁজে পেতে হবে। যাই হোক- যতদিন চন্দ্রসূর্য থাকবে মানুষ থাকবে- লোকসাহিত্যের অন্যতম সম্পদ টুসুগানগুলি লোকজীবনের মনের আকাশে ধ্রুবতারার মতো জ্বলজ্বল করবে।

ঋণস্বীকার :

লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা- ছন্দা ঘোষাল।

কবিতার দেশে

লজ্জা

মেঘদূত অঙ্কন

বৃক্ষের সাথে নিজের তুলনা করতে
এখন লজ্জা পাই

আমি বুঝিনা মহীরুহের শরীরী বন্দিশ
আমি বুঝিনা তরুলতার বাঙ্ময় ভাষালিপি
আমার জানা নেই অভিমানী অরণ্যের বিরহগাথা

আমি বৃক্ষ হতে চেয়েছি বটে,
তবে আমাকে গ্রাস করেছে দাবানলের আতঙ্ক

সবুজ থেকে সবুজতর হতে গেলে
হতে হয় প্রত্যয়ী, হতে হয় মৃত্যুকল্প চুপ
হতে হয় চেতনাসঞ্চারী।

আমি মগ্ন মোহ-বাসনার আত্মরতিতে,
কুঠার হাতে আমি যেন এক
ছলনাপ্রবণ খলের বিজ্ঞাপন

শুধু মনে হয়,
আমি আজ কিঞ্চিৎ মানুষ হয়ে উঠেছি
কিন্তু কুলীন কল্পতরু হতে পারিনি।

দিনান্তের প্রার্থনা

ছন্দা ঘোষাল

১

হে আসন্ন নীলাভ সন্ধ্যা
তোমাকে জানাই নমস্কার।
দিনের চতুর কোলাহল
মৌন হোক তোমার সাধনায়।
তোমার সুশ্রুষার আঁচল
ব্যাপ্ত করো বিশ্বচরাচরে–
গভীর গভীর শান্তি পাক
কাপট্যক্লিষ্ট ব্যথাহত জীবন।

২

ঈশা বাস্য মিদং সর্ব?

ভোরের ক্যানভাসে স্থির চিত্রপট.....
ঘুম ভেঙে জেগে উঠি
চোখে তবু স্বপ্নের আবেশ-
কখন কোথায় পাবো
অন্ধকার অতিক্রামী–
রবিকরোজ্জ্বল দেশ!

মুক্তির জন্য
অনিমেষ সিংহ

গান বাজছে রাধাকৃষ্ণ, কৃষ্ণরাধা....।
এবছর হরিনাম বেড়েছে কয়েগুণ।
মুক্তিকামী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে।
মাইক বাজছে ধর্ম থেকে ধর্মে, মাইক বাজছে আবেগে সুতীব্র;

এ মাইক টপকে যাচ্ছে, মাইলফলক।
পাড়ায় পাড়ায়, এ নিয়ে চর্চা-কার শব্দ কতো তীব্র,
কার হরিনাম ছুঁতে পারে কতগুলো হৃদয়ের মাঠ-

এ নিয়ে প্রতিযোগিতা, গ্রীষ্মের দিনরাত।

মুক্তি চাইছে কতো লোক–
কৃষ্ণের কাছে এসেছে মাফিয়া, এসেছে ধর্ষক-খুনি, কৃষ্ণের কাছে এসেছে সুদখোর-
পাপীতাপী সব যাবে বৈকুন্ঠে হে-
হরিনাম বেড়েছে কয়েকগুণ।
রবীন্দ্রনাথ, তুমি ক্লাবের ভিতরে থেকো-
বাইরে সুতীক্ষ্ণ রোদ
বাইরে মুনাফাখোর।

গোধূলি
শোভা চন্দ

সেদিন যে তীর আচমকা গেছে ছুড়ে
কত-কত রাত ঘুম উপোস থাকার পর
উপলব্ধি হলো, সে কি বিষম ক্ষত!
অজান্তেই শরতের শিউলির মতো
টুপটাপ ঝরে নরম কান্না
চোখ মেলে দেখিনি, বুঝিনি
এদিকে হৃদয় পুড়ে জর্জরিত...

যা গেছে তা যাক.....
নতুন ভোরের ছোঁয়া লেগে যে কুড়ি ফোটে
তোমার ছোঁয়ায় সেভাবে জেগে ওঠা
বিশ্বাসের মাপ কতখানি জানিনা
তবে সুন্দর ঘন অনুভূতি আছে
আছে সুঘ্রাণ.....

সময় লিখবে ভবিষ্যতের স্বরলিপি

আজ থেকে গোধূলির সব রঙ হোক
শুধু তোমার আমার.....

অন্যকথা

চয়ন রায়

কথা হয়েছিল বাড়ীটি সারাতে হবে
তবুও রক্ষা পায়নি
সব সবটাই ধূসর, বৃদ্ধ
খসেছে বালি খসেছে ইট
খসেছে ঝোলা-বারান্দা।

বটবৃক্ষ শিকড় ঝুড়ি ডাল বিস্তার করে
আর মাঝে মধ্যেই কাটা পড়ে

মনের চোখে অন্যকথা

তবুও বাড়ীর প্রশ্রয়ে বট
শিকড়ে শিকড়ে বেধে রাখে শেষটুকু
শিকড়ে শিকড়ে বেধে রাখে কাঠের সিঁড়ি।
বট চেনে আলো বাতাস ঝড়কে
বট জানে অন্দরের ফসকানো সময়কে

যেখানে মহাযাত্রী অপেক্ষা করে আছে

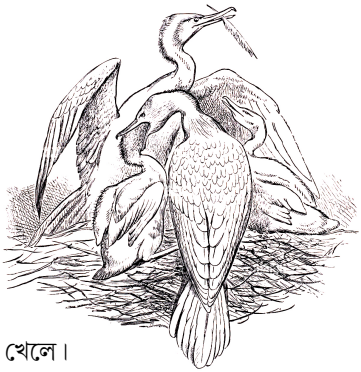

দাগ ১০০

দুঃখানন্দ মণ্ডল

স্নানঘরে চান গান
তুমি ভিজে যাচ্ছো সাওয়ারের জলে
শিলাবতীর জলে পানকৌড়িটি জল চৈচৈ খেলে।

তুমি তোমাকে দেখো ভিজে যাওয়া শরীরে
জল গায়ে কি যেন ভাবনা আঁকো চার দেওয়ালে মাঝে।

গুনগুন ভেজা শরীরের গান
ঠোঁট স্পর্শ করেছে অলীক অনুভূতি
স্তনের উপর নির্জন যৌবনের দাগ
ক্যানভাসে কে যেন এঁকে চলে বর্ণময় সমাহার।

উপল আশা

জয়দেব সিংহ রায়

গৃহবন্দী অমলের অক্সিজেন ছিল-
দইওয়ালা আর চিলের ডানা থেকে ঝরে পড়া
ওজনের লাং, বুং আসমানী বুদবুদ।
শোভাবাজার রাজবাড়ীর পরীরা জ্যান্ত হয়ে উঠত
ঘুঁঘুর ও ফিটন গাড়ীর শব্দে;
জুঁই মালার বারুদ গন্ধ অমলের কাছে অলীক আলাদিন।

শৈশবে অমলের মতো আমরাও
চিলের ডানায় শঙ্খ, চক্র খুঁজে পেতাম
রাক্ষসী-চোখ ও সুগন্ধী কান্নার পুটুস ছুঁড়ে দিতাম
ওদের ডানার মিশরীয় রহস্যমাখা জ্যামিতিক সিন্দুকে

এখন কেউ নেই, না দইওয়ালা না চিল
তবু চৌষট্টির দুপুর ফাল্ ফাল্ হয়,
শকুনের কর্কশ ক্রমেল কান্নায়।
বাইরে তবু কিছুই দেখিনি কোনদিন,
বৃষ্টির নাতি বৃষ্টির মতোই বলে-
পাথর বসছে গো তোমার ভাইয়ের ঘরে
মরু-মার্বেল আর টাইলস কাটছে বহুদিন।

সবুজ শুকিয়ে যায়, গঙ্গাও মজে যায় ক্রমে।
অসুস্থ রোগীর গাড়ী শুধু বৃথাই চক্কর কাটে
হেথায় হোথায়;
সাইরেন তীব্র থেকে তীব্রতর, পর্ণমোচন কাল শুরু;
যদিও 'শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা'!

ও পাষাণ নদীদের গান নিয়ে
তুমি কি উপল হবে না কোনদিন?
অথবা বিটোফেন-বীণা।

পালক

খুকু ভূঞ্যা

মানুষটার ওপর মনে মনে ভীষণ রাগ হয়
ইচ্ছে করে রঞ্জন রশ্মি পাঠিয়ে তুলে আনি তার বিষাক্ত হৃদয়ের ছবি
এবং ঝুড়ি ভরে সাজিয়ে তাকে বলি এই তোমার আসবাব
এত হত্যা লুণ্ঠন কূটকাচালি নিয়ে ঘুমোতে পারো

কিছুই বলি না
ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে যাব কেন
জানি সে মন্থরা হয়ে ভেঙে দিচ্ছে পৃথিবীর ছাদ
রাবণ হয়ে সীতা নিয়ে পালায়

দুঃশাসন হয়ে দ্রৌপদীর–
বেশি আওয়াজ দিলে
ভাতে ছাই আর বেড়ায় আগুন
তুমি ধূর্ত হও
কাউকে বলব না
আমি ঋষি নই, সংসারী

বোবা দেওয়াল

বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়

ওই বাড়িটির থেকে উঁকি দিচ্ছে নোনা লাগা ইট
বিকেলের তলানি আলো
ম্লান চোখ ছাদের কিনারে এসে ঢেলে দিচ্ছে
এ দিনের সমস্ত সঞ্চয়

স্যাঁতসেঁতে ভিজে গন্ধ লাফ দিচ্ছে রোদ্দুরের গায়
এ ঘর ও ঘর থেকে নিরুদ্দেশ চিৎপুরি ঢঙের পোশাক

ভেটকি ফ্রাই কিংবা রুইয়ের কালিয়া
বাতাসে তেমন গন্ধ আজ আর নেই.....

বোবা দেওয়ালের গায়ে শুধু ঝুলে আছে দীর্ঘশ্বাস
গুহাচিত্র অতীতের জমজমাট স্মৃতি।

সময়ের মগ্নতা
কৌশিক বর্মন

ছাতিমের ফুল হয়ে ঝরে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা
ভেসে আসছে মাটির সোঁদা গন্ধ
গাছের শরীর বেয়ে জল
পাতার শরীর জুড়ে জল ঝম্‌ঝম্‌ ঝম্‌ঝম্‌
গাছেরাও ময়ূর হয়েছে আজ।

আমি বৃষ্টির ভাষা পড়ি গাছের ভাষা পড়ি
ময়ূরের ভাষা পড়ি
পড়তে পড়তে সময় গড়ায় যত
ততটাই মগ্নতায় ডুবে-
গাছ হই ময়ূর হই বৃষ্টি হই
ছাতিমের ফুল হয়ে ঝরে ঝরে পড়ি...

জলোচ্ছ্বাস
স্বপন কুমার দে

যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালে কেন?
এখনো তো অনেকটা পথ বাকি,
কায়াহীন অনুভূতির এক জগৎ।
স্বপ্ন মায়াময়! টেনে নিয়ে যায়।
আরও বহু পথ, আরও বহু পথ....
ছাদহীন আকাশের তলায়।

তুমি তো পাওনি কোনো দাম,
রাজার আতিথ্য বা প্রজার অধিকার।
পেছনে রয়েছে যা, তাও তোমার নয়।
তবে কেন পিছুটান
কেন এ অন্তর্বেদনা?
স্থায়িত্ব অনিশ্চিত।
বরং কষ্টের শেষে আছে স্বপ্নের দেশ।
রোদ ঝলমলে নির্মেঘ আকাশ।

স্বপ্নেরা বেঁচে থাকুক বাঁচার আবেগে।
তুচ্ছতার ঘেরাটোপ আর নয়।
তোমার আকাশ তোমার চেনা
যেখানে নেই অন্যের জুলুম
পরদাসের কলঙ্ক ঘুঁচে যাক প্রতিজ্ঞায়।

ভালবাসা
মানসরঞ্জন বিশ্বাস

ভালবাসা বদলে যায়
ঠিকানা থাকে না ঘরবাড়ির
দিনান্তে সন্ধ্যা নামে
খোঁজ নেয় নিজস্ব নারীর

পশ্চিম দিগন্তে মেঘ
জমে ওঠে আমাদের ঘিরে
সকল কাজের শেষে
মিশে যাই জনতার ভিড়ে।

প্রথম পদ্য
শ্রীতনু চৌধুরী

মুখ তোলো রাই
আমি চুম্বন করব।
নদীর ঘাটের কাছে
খাতা ও কলম এসে গেছে-
একটি মণিতে
কত পদ্য লেখা হবে।
হাতে হাত রাখো
পার হব অচেনা নদী
তারপর স্বর্গ সিঁড়ির মত চড়াই
শক্ত করে ধরো
একটি অমরাবতী রচনা করতে হবে,
হৃদয়ের উত্থাল ঢেউয়ে লুকানো
মুক্তো প্রবল থেকে
খুঁজে আনতে হবে বৈদূর্য।
মাথা রাখো বুকে
তারপর শান্ত নদীর উপর
তুলে দেওয়া যাবে না'হয় পাল
ওপারে স্বর্ণ সম্ভাবনা আছে।

আমার বাড়ানো হাতে
একটি ভরসা ধরা দিল
আমার ঊষর ওষ্ঠে
একটি তৃষ্ণা ধরা দিল
আমার প্রসারিত বক্ষে
প্রজন্ম প্রতীক্ষার একটি ফল্গু ধরা দিল।
অবশেষে
তোমার গহন চোখে
নিজের প্রতিবিম্ব দেখে
নদীর ঘাটের কাছে
একটি মহাকাব্য রচিত হল।

সোনার রেখা
কৃষ্ণা চক্রবর্তী

তোর ওই বর্ষা শরীর,
ভরা জলে,
এঁকেবেঁকে,
চলা,
ছন্দের তালে লাফিয়ে মাথা,
উঠিয়ে দেখিস,
সূর্যিমামার,
ঢলা।

তোর ওই স্বর্ণ শরীর,
রূপের ছটা,
আলতো করে,
ছোঁয়া,
স্বর্ণালী মেঘ দিচ্ছে ধরা,
তীরের ধারে,
সবুজের গা,
ধোয়া

চোখ খুললে তোকেই দেখি,
সুবর্ণ রেখা,
মিষ্টি ভারি,
নাম,
তির তিরিয়ে এঁকে বেঁকে,
চলতে থাকিস,
একটু খানি,
থাম।

অনেক কথা জমিয়ে রাখা,
আসন পেতে,
বসতে দেবো,
শোন,
ভালো বেসে একটু হেসে,
হালকা করি,
তোর আমার
মন।

আশ্বিন

শঙ্খশুভ্র পাত্র

এখনই কি 'খনা' সাজে? টোটকা, তাবিজ?
লিপ্তপাদ-তাম্রলিপ্ত সব আজ একাকার!
বিস্ময়চিহ্নের দিকে নিত্যাশীর্বাদ ঝরে পড়ে।
রাত্রি আলো। ১:৪১। তুমি: আমি মধ্যে চতুর্বেদ।
আমি সামান্য মানুষ। 'চতুর্বর্গ' বেরিয়ে যেই
বর্গভীমা মন্দিরে সাষ্টাঙ্গ প্রণামে মাতি তৎক্ষণাৎ ক্ষপণক...
বিক্রমাদিত্যের সভাকক্ষে বাস্তবিক তুলোধনা।
এই আশ্বিন এল বলে...

চিত্রনাট্য

বিরূপাক্ষ পণ্ডা

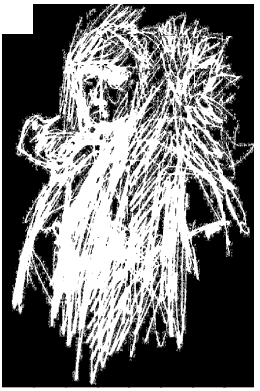

ছাইমাখা মন শোনে মেঘ জমানো কথা
অজানার খিদে বাড়ায় দূর সমুদ্র ঢেউ
এবং বীজের বীজ খায় আত্মগ্লানির পোকা-মাকড়।

ভালো কথা আর নয় বলা
বরং পালহীন নৌকার হাল ধরা ভালো
সবই স্বপ্নমায়ায় উথাল-পাথাল এবং
মেঘবালিকার শূন্যতা
সবই বিষাদ সিন্ধু দেশ এবং
জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখের চিত্রনাট্য।

কি জানি কি ভেবে

ঐন্দ্রিলা মুখোপাধ্যায়

বৃষ্টির স্বপ্ন ছুঁয়ে ছুঁয়ে বৃষ্টি হতে চাওয়া
মেয়েটাকে তুমি বলতে পারো না
জল বাঁধো— জল!
আলোর গল্প বলতে বলতে,
সূর্য হতে চাওয়া ছেলেটাকেও কি তুমি বলতে পারো
আলোর নিচে অন্ধকার?
তবু অলীক একটা স্বপ্ন
রাত্রির সমস্ত অন্ধকার মুছে

সকালের সূর্যটাকে যখন কুর্ণিশ জানাবে,
দেখবে হাতের মুঠোটা তোমার ফাঁকা নয়।
একলা পৃথিবীর একটা কিনারে দাঁড়িয়েও
নিজেকে তোমার ক্লান্ত মনে হবে না।
তখন আমার মধ্যে আমি হয়ে থাকা
অস্তিত্বটাকে ছেড়ে দিতে পারলেই
তোমার মধ্যের তুমিটাকে
খুব সহজে আপন করে নেওয়া যাবে।
আসলে পৃথিবীর সবচেয়ে কোণঠাসা মানুষটাকে
কোনদিন একটা খোলা আকাশ উপহার দিয়ে দেখ,
তারও পাখি হতে সাধ হবেই।
তাই জীবনের সমস্ত বাঁধন খুলে এগিয়ে যেতে চাইলে,
কোনদিন হয়তো পেতে পারো উন্মুক্ত পথের হদিস!
অতঃকিম, এখন দুরন্ত মেঘলা রাত,
আর বৃষ্টি মুখর আকাশে স্বপ্নে স্বপ্নে ছুঁয়ে যাই,
তোমার আমার মাঝের দীর্ঘ অপেক্ষাকে।
ভালোবাসায় ভরিয়ে দিই নীরব চাওয়া-পাওয়া
আচ্ছা, দরজায় কে কড়া নাড়ছে?
ভাবতে বসি আমি।
তাকিয়ে দেখি মনের ভেতর জানলা খোলা—
জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে আছ তুমি।

সব প্রেমেই বসন্ত

বনশ্রী রায় দাস

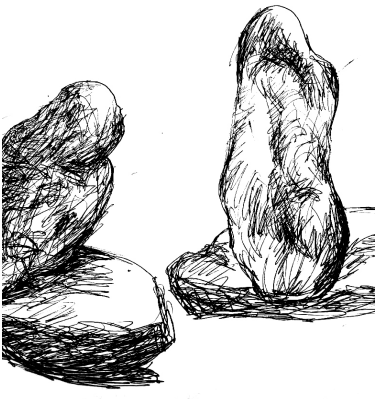

যতবার হাতছানি দিয়েছে জলঙ্গি
হৃদি অতলে প্রেমিক সিন্থেসাইজার

মোড়েরমাথা হয়ে হল্লাপাড়া টপকে
খুঁজে নিয়েছি নির্জন তমোঘ্ন তোকে
খসে পড়ছে উড়ন্ত শালিখের পালক

সোনাঝুরি টান পায়রা উড়িয়ে দিলে
ছুট্টে পালিয়ে যাবো পলাশ মন্ডপে
সাঁতার আঁকবো ঠোঁটের উপত্যকায়

রোদ-বর্ণ ভাষা প্রেম শরীরে জড়িয়ে
একসাথে ডুবে যাবো দুধসরোবরে

মায়ের বিছানার নদী
শিখা মল্লিক

মায়ের বিছানার নদী
জলে ধুয়ে রৌদ্রে শুকাই।
শুকাতে শুকাতে সন্ধে হয়ে যায়।
আবার সকালের অপেক্ষায় থাকি
আবার রোদের অপেক্ষায়।

মাকে রোদে রাখা যায় না আজকাল।
রোদকে যদি ঘরে আনা যেত।
রোদ, তুমি তো দেওয়াল ফাটিয়ে
ঘরে ঢুকে যেতে পারো, ঘরে সবকিছু
এখন মচমচে দরকার, তারপর চলে যেতে
উজানের দিনে।

মা ভালো থাকলে বলতে হত না।
নিজেই ছুটে ছুটে নিয়ে আসত রোদ।
আমাদের কত রোদ এনে দিত!

শেষের খেয়া
জয়ন্ত কুমার মল্লিক

'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' জানি
জীবন শেষে মৃত্যুরই হাতছানি।
মৃত্যু এসে জীবনে নাড়বে কড়া
বলা যাবে না- একটুখানি দাঁড়া।

ভালো-মন্দ সুজন গরিব ধনী
সকলেই মৃত্যু ভয় কে মানি
জন্ম থেকে এগিয়ে চলা পথে
শেষে যেতে হবে, চড়ে মৃত্যুর রথে।

চলে যেতে হবে, ভাবতে পারেনা মন
থাকার বাসনা, হৃদয়ে অনুক্ষণ
জন্ম যেমন আমাদের হাতে নয়
মৃত্যুকেও স্বাগত জানাতে হয়।

তবুও জীবন ভরিয়ে তুলতে চাই
রূপে রঙে রসে গন্ধে বর্ণে ভাই
তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে যাই
যেন মৃত্যুকেও জানাবো গুডবাই।

পৃথিবীতে তবু দেহখানি থাকে পড়ে
পঞ্চভূতে বিলীন হওয়ার তরে
মৃত্যু তোমার হাতটা ধরে হাঁটতে চাই-
মৃত্যু তোমার ভয়কে ভালবাসতে চাই।

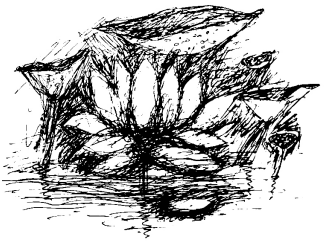

বাল্মীকি

অরুণ ভট্টাচার্য

আলাদিনের কোন আশ্চর্য প্রদীপ নেই আমার,
নেই কোন অলৌকিক আলো
তোমারও নিশ্চয়ই নেই হ্যামলিনের বাঁশি-
কোন স্বর্গীয় সুর
এসো তাই বুকের বারুদ সব ফেলে
এসো পায়ে পায়ে বিশুদ্ধ জঙ্গলে।

রত্নাকর যেদিন বুঝেছিল ঠিক
ঠিক ঠিক কথাগুলো
সেদিনই প্রতিটি গ্রামে-গ্রাম সংসদে
জেগে উঠেছিল ঢিবি-বল্মীকের স্তূপ,
তপস্যায় বসে গেল যারা গেরুয়া বসন পরে
তবুও তো বাল্মিকী হলো না সবাই

বিশুদ্ধ জঙ্গলে এসো
এসো আজ সত্যযুগ ভাগ করে খাই।

দিনমানে দিনমণি

সৌমেন্দ্র নাথ মাহাত

শান্ত পল্লীতে সভ্যতা রয়েছে থমকে-
আকাশ বাতাস মাটি, উত্তপ্ত তপন।
আত্মা বিরাজে সেথায় পড়ে থাকে মন।
শুদ্ধ বায়ু বহে যায় দমকে দমকে।।

আচমকা ওঠে ঝড় বিজলী চমকে,
পত্রের মর্মর ধ্বনি তোলে শালবন,
প্রকৃতির সাহচর্যে, বাঁচি প্রাণপণ।
জীর্ণ শাখা ভেঙে পড়ে, ভাঙে নিয়মকে।।

শিক্ষা স্বাস্থ্য দূরে তবু, রয়েছে সংস্কার।
কৃত্রিম চাকচিক্যের নেইকো বাহার।।

ছেড়ে ছেড়ে গেছে যারা তাকায়নি ফিরে,
সুখে থাক তারা সব বাতানুকূলিত।
নিষ্প্রদীপে কাটে মোর, বিশুদ্ধ সমীরে।
দিনমানে দিনমণি হয় না স্তিমিত।।

সু আর কু
সনৎ কুমার দাস

দলাদলির দাবানলে সু আর কু
ক্রমশ দাহ্য পদার্থের মতই
চোখের অন্তরালে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।
ছাই উস্কে দিয়ে সন্ধান চালালেও,
নব কলেবরে শূণ্যতাই গ্রাস করে
জানা যাচ্ছেনা দহিত ছাই থেকে
দাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব।

রেষারেষির মেরুকরণের খেলায়
সু আর কু এর অবস্থান
উত্তর বা দক্ষিন অনুমেয় নয়
ঈর্ষার কুয়াশায় দ্রুত
দৃষ্টিলোকের অতলতলে তলিয়ে যাচ্ছে
দীগন্তহীন সমুদ্রকে হার মানিয়ে।

অনিয়ন্ত্রিত অসীমের পথে গতিশীল
সু আর কু উভয়েই উচ্চাশার দাবিদার
তবে পৃথিবী গোলকের মতই
জনমতের প্রতিবন্ধকতা সরলেই
সংঘর্ষের চরম দামামা বাজবে।

একটি অন্ধকার দৃশ্য
অরুণাভ বীর

সভ্যতার আড়ালে নিস্পন্দ জীবন খুঁজে চলেছে চির আনন্দের দিন
মুক্তির ব্যথায় শিকলের শব্দের হোক বিসর্জন
পরাধীনতার ছন্দের ছলনাতে আজ জটিল গহ্বরের নিঃশ্বাস
আত্মিক দুঃখের গভীর মায়ায় জেগে ওঠে অতল স্মৃতির স্পর্শ
উদ্ভাসিত সমাজের আলো চায় পূর্ণ জয়ের স্বাধীনতার ধূলো।

ভালোবাসি
সুমিত্রা সাউ গিরি

ভালোবাসি বললেই কি ভালোবাসা যায়
নাকি ভালোবাসা পাওয়া যায়!
ভালোবেসে ভালোবাসলেই ভালোবাসা হয়
ভালোবাসা আসে, ভালোবাসা বাঁচে।

গোলাপ ছড়িয়ে সোহাগ মানেই কি ভালোবাসা
ভাতের গন্ধে লড়াইয়ের ঘামে ভালোবাসা হাসে
আদর সোহাগ এমনিতেই কাছে আসে।

ভালোবাসারও তারতম্য রয়েছে
ব্যক্তি বিশেষে তার রূপ,রং,আধার
গুনাগুন ভিন্নতর।
ভালোবাসা সে তো অনুভবমাত্র
হারাতে গিয়ে অনেক কষ্ট।

আর কষ্ট সে তো ব্যক্তিগত
সার্বভৌম সুখ তবুও বাঁচে
মাটির বুকেও ক্ষত
তবুও মাটি ভেজে
শ্রাবণকে ভালোবেসেই।

ভালোবাসা থাকে
থেকেই যায়
মাটির মতোই
রোদে বন্যায়।

সতর্ক সিন্দুক
কমলেশ নন্দ

দিতে পারার মতো অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ
কোনো কিছুই নেই
সবই গচ্ছিত আছে রাত্রির সতর্ক সিন্দুকে!

একক কোনো অসহায় নির্জলা দুপুরে
বড্ড একাকী মনে হয়।
দরজায় টোকা দিয়ে ক্ষুব্ধ বাতাস বলে
ওঠো, আমিও রাত্রির বাড়ি যাবো
খুলে দেখবো সিন্দুকের মরচে পড়া ডালা।

সে আমার পাশেই ছিল
দুপুর গড়িয়ে রাত্রি,
কথোপকথন আর শলা-পরামর্শ
দীর্ঘ এক যাত্রাপথের কাহিনি।
সিন্দুকের ডালায় তখন তীব্র আর্তনাদ!
ঠিক তখনই—
ছায়াপথ ধরে ঘুম এল।
ঘুম।

জেগে থাকার জন্য চাই
অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ।
ঘুমোতে চাইলে?
উত্তরের তোয়াক্কা না করেই বিশৃঙ্খলা,
আরো একটা দুপুরের দীর্ঘ অপেক্ষা।

ছোটগল্প

কুসুম

জয়ন্ত দাস

দিন-রাত্রি কুসুমের কথা ভাবছে অহিত্র। কুসুম! কুসুম! কুসুম! সে পরস্ত্রী একথা তার মন মেনে নিতে চায় না। সে কারণে নিজেকে সংযত রাখতেও পারে না অহিত্র।

ঝাড়গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে শীত ও বসন্ত- এই দুটো ঋতু কুসুম থাকে। বাদবাকী সময় দুর্গাপুরে কর্তব্যরত স্বামীর কাছে থাকে। কুসুমের বয়েস পঁয়তাল্লিশ কি ছেচল্লিশ হবে। দেখলে মনে হয় ত্রিশ-বত্রিশের মতো। ঘন কালো মাথার চুল। খোলা থাকলে নিতম্ব ছুঁয়ে যায়। প্রশস্থ ও মসৃণ কপাল। উড়ন্তপাখির ডানার মতো ভ্রূ-যুগল তাকে অধিকতর সুন্দরী করে তুলেছে। অহিত্র কিন্তু কুসুমের বেশী প্রশংসা করে তার টিকালো নাকের গড়ন আর গোলাপ পাপড়ির মতো অধরের জন্য।

কুসুমের দুটি মেয়ে। একটি ছেলে। ওরা বরাবরই দুর্গাপুরে থাকে। ঝাড়গ্রামে আসতে চায় না। কুসুমও নিয়ে আসে না। পড়াশুনার বিন্দু-বিসর্গ ক্ষতি হোক ছেলে-মেয়ের-কুসুম চায় না।

এবারও শীত, বসন্ত দুটো ঋতু ঝাড়গ্রামে কাটিয়ে সুকুম তার স্বামীর কাছে চলে গেছে।

কুসুমের শ্বশুরবাড়ির বগলেই অহিত্রের বাড়ি। অহিত্র ক্লাস ট্যুয়েলভ এর ছাত্র। বয়েস উনিশ কি কুড়ি হবে। কুসুমের অর্ধেকের কম। তা সত্ত্বেও অহিত্র তাকে ভালোবেসেছে।

প্রত্যেক বৎসর কটা মাস ঝাড়গ্রামে থাকে কুসুম। সে সময়ে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা অহিত্রের সঙ্গে দেখা হয় কুসুমের। অহিত্রের কি না ভালো লাগে কুসুমকে দেখলে! ভালোবাসা এমনিই ....।

ক্লাস এইট থেকে নির্দিষ্ট সময়ে টানা পাঁচ বৎসর কুসুমকে দেখতে দেখতে তার ছবি অহিত্রের মনে গেঁথে গেছে। কুসুম পরিযায়ী পাখির মতো। আসে সিজন অনুযায়ী; আর উড়ে যায় দুরান্তে। তাই তার প্রতি ভালোবাসার টান ছেদহীনভাবে অহিত্র অনুভব করে। অহিত্র কিন্তু ভালোবাসার কথা সরাসরি কুসুমকে কোনদিন বলেনি। কি করে বলবে-, বয়েসের তফাৎ যে অনেক বেশী। তফাৎটা তেমনি পরিণত মনের কাছে কচি-কাঁচা মনেরও। তাই স্কুল যাওয়া-আসার পথে, অন্যত্র, কোথাও কুসুমকে দেখলে অহিত্র কুঁকড়ে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ও দীর্ঘায়িত হওয়ার সাথে সাথে কেঁপে উঠে বুকের ভেতরটা।

অহিত্রের আড়ষ্টতা লক্ষ্য করে কুসুম শুধু হেসেছে। একদিন হাসতে হাসতে অহিত্রের পিঠে হাত রেখে বলেছিল— বোকা ছেলে। পড়াশুনায় মন দাও। ... সব হবে!

পাঁচ-পাঁচটা বৎসর অহিত্র অপেক্ষার প্রহর গুনেছে। প্রহর গুনেছে কুসুমকে পাওয়ার জন্য। ছটপটিয়ে মরেছে। কিন্তু আর যে অপেক্ষা করতে পারছে না। 'সব হবে' কথাটার মধ্যে এতো চার্ম!... অহিত্র ভাবে কুসুম সাড়া দিয়েছে। তাই

তার বুকে অপেক্ষার উদ্বেলিত ঢেউগুলি পাড়ে আঘাত হানার আগেই অনেকটা নম্র হয়ে গেছে। কিন্তু আর কতদিন অপেক্ষা করবে অহিত্র। অহিত্রের ধৈর্যের বাঁধটা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

একদিন যথার্থই সে পাড়ি দিল দুর্গাপুরের উদ্দেশ্যে। যে ভাবে হোক দেখা করতে হবে কুসুমের সংগে। কুসুম ছেচল্লিশ! তিন তিনটে ছেলে-মেয়ের মা! নাহ! কুসুম দিঘিজলে ফোটা পদ্মফুল। মনোরমা! তার ডাগর কালো চোখের ভাষা ভালোবাসা বোঝে।

বিকেল চারটে নাগাদ দুর্গাপুর মেইন বাস স্ট্যাণ্ড থেকে টাউন বাস ধরে "বি-ফোর সেক্টরে" অহিত্র পৌঁছে গেল। বাস থেকে যখন নামে তখন মুসল ধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে একের পর এক কোয়ার্টারের নেম প্লেট আর নাম্বারে চোখ রেখে রেখে অবশেষে একশ-সাত নাম্বার সে খুঁজে পেল। ... কোয়ার্টার নয়- এটা যেন কুসুমের ঘর। এতো সুন্দর! ... এখানে কুসুমকে পাওয়া যাবে। অহিত্রের বুকের ভেতরটা এক অভিনব উছল প্রেম-রসে দ্রবীভূত হয়ে গেল। কিন্তু কিভাবে যে নিজেকে উপস্থিত করবে কুসুমের ডাগর স্ফারিত চোখ আর উন্নত বুকের মুখামুখি।

অহিত্র বাউণ্ডারী গেটের ছিটকিনি খুলে ভেতরে গেল। বারান্দা ওয়ালের আটচল্লিশ বাই আটচল্লিশ ইঞ্চি জানালার নীলরঙা পর্দা ঠেলে কুসুম বাইরে চোখ রেখে যেন কিছু দেখছে। কি দেখছে? এই ভরা শ্রাবণে ঝরঝরিয়ে মাঠে ও পিচে মোড়া রাস্তাটায় আছড়ে পড়া বৃষ্টির সৌন্দর্য!

কুসুম অহিত্রকে দেখে বিস্ময়াভূত হয়ে পড়েনি। সে জানে ওর আসাটাই স্বাভাবিক। কুসুম মনে মনে খুশী হল- ঠিক অহিত্র যেমন খুশী হয় তাকে দেখলে— তেমনি।

দরজা খুলে বেরিয়ে এলো কুসুম! খুশির রেশটুকু চেপে রেখে বলল- অহি! কখন বেরিয়েছিলে? ভিজে একাকার হয়ে গেছ! এসো- ভেতরে এসো!

কুসুম তাকে নিজের রুমে নিয়ে গেল। আলমারির তাক থেকে টাওয়েল বের করে দিতে দিতে, কতকটা কর্তৃত্বের সুরে বলল- নাও- টাওয়েলটা নাও। এটা নূতন। ভালো করে মাথাটা ঝেড়ে নাও। পাতলুন রেখে গেলাম। পাল্টে নিও।

অহিত্র সুবোধ ছেলেটির মতো বলল- ব্যাগে আমার সব আছে। পাতলুন লাগবে না।

কি খাবে? ভাত খেয়েছ? না! এই অবেলায় ভাত নয়। কিখাবে? কথাগুলি এক নিশ্বাসে কুসুম বলে গেল।

শুধু চা হলে হবে- অহিত্রের উত্তর।

কুসুম কিছু না বলে হেঁসেলে গেল। অহির জন্য চা তৈরী করতে হবে।... বেচারা ভিজে গেছে। কতদূর থেকে ছুটে এসেছে কুসুমের জন্য। কুসুমকে এতো ভালোবাসে সে। পাঁচ বৎসর ধরে ভালোবেসে আসছে। আহারে! অহি! আমার

অহি! আমার ছোট বন্ধু! আমার ছোট নাগর! নাগরই বটে। কুসুম মনে মনে হাসল।

ভেজা পাঞ্জাবি আর চুড়িদার ছাড়তে ছাড়তে অহিত্র ভাবল- কুসুম কোনদিন তাকে নাম ধরে ডেকেছে বলে মনে হয় না। আজ তার মুখে 'অহি' ডাক শুনে, অহিত্রের খুব ভালো লাগল। নাম ধরে ডাকার মধ্যে আত্মিয়তা আছে। কাছে টানে। যদি একবার কুসুম বলে সেও ডাকতে পারত! তার খুব ক্লোজ হয়ে- বাঁ-হাতে খাঁজকাটা কোমর জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ রেখে বলতে পারত কুসুম! কুসুম সোনা! বলতে পারছে না। কেন পারবে না- তা সে নিজেও জানে না। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করে!

ততক্ষণে ট্রেতে- তৈরী করা পাউরুটির টোস্ট সংগে এক কাপ চা এনে টি-পয়ে রেখেছে কুসুম। অহিত্রের দিকে ছুরির ফলার মতো দৃষ্টি হেনে বলল- এমব্রডারির কাজ করা পাঞ্জাবি আর চুড়িদারে কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে। না-খেয়ে নাও! সেই কতক্ষণে খেয়ে বেরিয়েছিলে।

ফাইবারের চেয়ারটায় বসার পর, হুইল লাগানো টি-পয়টা কাছে টেনে নিল অহিত্র। অহিত্র খেতে খেতে ঘরের চতুর্দিক নিরীক্ষণ করছে বুঝতে পেরে কুসুম আপনা থেকেই বলল- রুমগুলো খুব ছোট। এই রুমের পরেই আর একটা রুম। দেওয়াল বরাবর দরজাটি দু'টো রুমের সংযোগ রক্ষা করে চলেছে। ওপাশের রুমের সংগে এটাচ কিচেন এবং টয়লেট। পেছনে একফালি ফাঁকা জায়গা। সামনের ল'নে ....।

হাঁ তাতো দেখলাম। সার সার বেলফুল আর রজনীগন্ধা বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে দুর্বল শরীরে যেন ব্যর্থ অপেক্ষায় নেতিয়ে পড়েছে।

- ভয় মেশা লজ্জা ও নিজের আড়ষ্টতা কাটানোর জন্য অতিরঞ্জিত করে অহিত্র বলে ফেলল।

কুসুম তার অবস্থাটা বুঝতে পারছে। বয়েস কম হলে যা হয়। না চিবোতে পারছে। না গিলতে।

কুসুম অহিত্রের কথা শুনে মৃদু হেসে বলল- আমাদের ছোট পরিবারে ড্রইংরুম সমেত এই দুটো রুমই যথেষ্ট। ছেলে-মেয়েদের জন্য একটা। একটা আমার আর অংশুমালির। ছেলেরা এখন অবশ্য এখানে নেই। বাইরে পড়াশুনা করছে।

জিজ্ঞাসু চোখ তুলে অহিত্র বলল- আর অংশুবাবু? তাঁকে তো দেখছি না? আপিস থেকে ফিরতে দেরি হয় তাঁর?

কুসুম বলল তিনি এখন এখানে নেই। আপিস তাঁকে রাজস্থান পাঠিয়েছে। আজই সকালে গেছে। পনের দিনের জন্য। তোমার কোন অসুবিধে হবে না। একটু থেমে কুসুম বলল- পেপার পড়তে থাক ততক্ষণ। রাত হলো। রান্না করতে হবে। তুমি কি খাবে...?

অহিত্র বলল- ভাত, রুটি। আমার সবকিছুতেই অভ্যাস আছে। যা পাকাবে-তাই খাব।

কুসুম আর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকেনি। হেঁসেলে চলে এল। কিন্তু বুক দুরদুর করছে কেন? একটা সুন্দর অস্থিরতা তার মনকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে কেন? বিন্দু বিন্দু ঘামে ভিজে যাচ্ছে কপাল। বগলে ব্লাউজের অংশটুকু ভিজে যাচ্ছে।...

রান্নাঘর সংলগ্ন রুমে দ্রুত পায়ে চলে এল সে। জানালার পর্দা সরিয়ে দেখল- শ্রাবণের এই একটানা ছাড়াছাড়া বর্ষার সান্ধ্যমুহূর্তে ল'নের সব রজনীগন্ধা ঘোরতর ফুটে আছে। পূবালি নরম হাওয়ায় তার সুবাস রাত্রিব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে ঘরের ভেতরে। কোনে কোনে। সে গন্ধে বিভোর হয়ে, শেষ রাত্রিতে ভেজা বাতাসের চুম্বনে চুম্বনে ঘুমিয়ে পড়বে আলুথালু কুসুম। ক্লান্ত শুশুকের মতো খোলা ঠোঁটে ঘুমিয়ে পড়বে ডানা ছড়িয়ে ...।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে বিছানায় যেতে অহিত্রের প্রায় সাড়ে দশটা হয়ে গেল। কুসুম তার ঘরে বিছানা বিছিয়ে দিল। নীলরঙা চাদর। নীল কভারে মোড়া বালিশ। নীল রঙের ডাবল খাটের মশারি!

কুসুম খাটের চারিধার ঘুরে ঘুরে মশারি প্রান্তটুকু সযত্নে গুঁজে গুঁজে দিল বিছানার নীচে। নিখুঁত গৃহিণীর মতো। তারপর লাইট অফ করে বলল- অহি! দরজা ভেজিয়ে গেলাম। দরকারে ডেকো- কেমন!

অহিত্র শুয়ে শুয়ে সাত পাঁচ ভাবতে লাগল। কুসুম ভালো। সুন্দর স্বভাবের। পাঁচ বৎসর ধরে সে তার রূপ দেখে আসছে। আজ তার সুন্দর স্বভাবেরও পরিচয় পেল। ছেচল্লিশ বৎসরের নীলাঞ্জনা কুসুম। নম্রপয়োধরা! নিতম্বভারা! একাই সংগে মাতৃত্ব ও সখিত্বের মিশ্রণে ভরপুর দুটি চোখ, মুখের আদল-অহিত্রের কামনা মেশানো যৌবনের, আর বিশৃঙ্খল ভয়ের অনুভব যেন শাসিয়ে দিচ্ছে- উঁহু, দুষ্টমি নয়- দুষ্টুমি করলে কানমোলা খাবে।

অহিত্র বুঝতে পারে যে কুসুমের রূপ তাকে বিব্রত করে তুলেছে পাঁচ বৎসর ধরে একটানা। ঘুম কেড়ে নিয়েছে তার দেহ সৌষ্ঠব। তার উপচে পড়া লাবণ্য। তার মোহময় বাচনভঙ্গির আকর্ষণ। .... প্রতিটি কাজের ভেতরে সে তাকে দেখে। তার নিশ্চুপ উপস্থিতি অনুভব করে। সে তাকে পেতে চায়। পাওয়ার স্বপ্ন তাকে মাতিয়ে রাখে।

সেই যে সেই হোলি উৎসবের দিনটা। অহিত্র ভুলতে পারবে না। আভির নিয়ে কুসুমের শ্বশুর-শাশুড়িমাকে প্রণাম করতে গিয়ে পাশের রুমে দেখল কুসুম বসে আছে চেয়ারে। জঙ্ঘার খানিকটা কাপড় সরে গেছে অসাবধান বশতঃ। অহিত্র তা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এতো সুন্দর উরু! পুষ্ট! মসৃণ! রসাল। এরই নাম বুঝি রম্ভারু! আহ! অহিত্র সেদিন সিঁড়ি সংলগ্ন দেওয়ালের কাছে থাকা আলনা থেকে তার লাল রঙের ব্লাউজটা হাতিয়ে চম্পট দিয়েছিল। তার গন্ধ শুঁকেছে সে। কুসুমের স্তনের মাদকতা মেশান গন্ধ। শরীরি গন্ধ ব্লাউজের ভাঁজে ভাঁজে।

অহিত্র ঘুমানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুম এলনা চোখের পাতায়। স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনা ও অস্থিরতার চাপ চোখের পাতা থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছে অহিত্রের। সে বিছানা থেকে উঠে টয়লেট সংলগ্ন বেশিনে চোখ-মুখ ভালো করে ধুয়ে নিল। টেবিলে থাকা বোতলের জল প্রায় অর্ধেকটা ঢকঢক করে গিলে ফেলল। তারপর লাইট অফ করে পুনরায় বিছানায় গেল। কোন চিন্তার অধরিক প্রভাবে সে এখন ভেসে যাবে না। সে চিন্তাশূন্য হয়ে ঘুমাতে চায়।

চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকার পর অহিত্র ঘুমিয়ে পড়ল। আর এক অদ্ভুত মোহগ্রস্ত স্বপ্নে সে স্পষ্ট দেখতে পেল- কুসুম সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা

হয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। স্তনভারে শোভিত তার বমনীয় বুক। কাঁধের দুই দিকে ছড়িয়ে আছে কালো মসৃণ চুল। অষ্টপুট ভেদ করে রক্তবর্ণ জিহ্বা লকলক করছে। কুসুম আরো তার দিকে এগিয়ে এল। ... নিজের বাম স্তনের কাছে তুলে ধরল একটা তীক্ষ্ণ ধারালো সূঁচ। এবং সে সূঁচটা খপ করে চুচুকের নীচে বিনা দ্বিধায় ঢুকিয়ে দিয়ে বের করে আনল। ঝরঝর করে রক্ত গড়িয়ে পড়ল সেখান থেকে। সে রক্ত করপুটে ধরে অহিত্রের চোখে, মুখে, বুকে, সারা শরীরে মাখিয়ে দিতে লাগল কুসুম। অহিত্র বাধা দিল না। অসাড় হয়ে শুয়ে থাকল। রক্তমাখা কুসুমের করভ কি মোলায়েম আর সুন্দর। এবার কুসুম খানিকটা নুয়ে তার মুখ, অহিত্রের মুখের কাছে নিয়ে গেল। কাঁধ থেকে কুসুমের ঘন কালো চুলের রাশ অহিত্রের মুখের দুই পার্শ্বে ছড়িয়ে পড়ল। ঠিক এই মুহূর্তে কুসুমের ঠোঁট নেমে এসে অহির অধর চেপে ধরল ভীষণভাবে ধারালো দাঁতে। ... তীব্র দংশনের যন্ত্রনায় চিৎকার করে অহিত্রের ঘুম ভেঙে গেল।

অহিত্র খাট থেকে নেমে লাইট অন করে দেখল-

- না! কুসুম রুমটার কোথাও নেই। কুসুম আসেনি। সে স্বপ্ন দেখেছে মাত্র। দীর্ঘশ্বাসের একটা কালো ছায়া যেন ঘিরে ধরেছে অহিত্রের শূন্যময় মনের সবগুলো দিক। নিজেকে দুর্বল ভাবছে অহিত্র।

কিন্তু কুসুম তার অহিকে কাছে ডেকে নিলনা কেন! অহি সম্পর্কে কুসুম এতোটাই নির্লিপ্ত! এতটাই উদাসীন! পাঁচ বৎসর ধরে গভীর সাধনার নৈবেদ্য সে কি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে পারত না? কুসুম ভালোবাসার মন বুঝে না। কুসুম স্বার্থপর! নিষ্ঠুর! অহিত্র একথাও ভাবল- কায়মনবাক্যে কুসুমের চিন্তায় নিজেকে সমর্পণ করা মুর্খের মতো ভুল হয়ে গেছে। ভুল হয়েছে কুসুমের ভালোবাসার মিথ্যা স্বপ্নের স্রোতে দুর্গাপুরে আসা। ঐশ্বর্যাশালিনী কুসুমের সংগে তার বিস্তর ফারাক। তার কাছে দাঁড়ালে অহিত্রকে খুব নীচ মনে হচ্ছে। খুব বেহায়া মনে হচ্ছে। আবার তীব্র দুঃখ ও ক্ষোভে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছে। সে ঝাড়গ্রামে ফিরে গেলে সুযোগ বুঝে বন্ধুদের কাছে। পাড়ার ঘরে ঘরে, রটিয়ে দেবে তার ছিনানির কথা। তার চরিত্রহীনতার কথা। দুর্গাপুরে তার রাতের পর রাত...। এভাবেই তো সে এতো ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স করেছে। শরীরটা মুড়ে নিয়েছে সোনার অলংকারে। অংশুবাবু ভোগাস! স্ক্রেন। নাম কা ওয়াস্তে স্বামী।

অহিত্রের কামনা মেশা ভালোবাসার আক্রোশ তাকে ভেজানো দরজার দিকে ঠেলে নিয়ে গেল। অহিত্রের বুক টিপ্‌টিপ্ করছে। দুটো পা কেঁপে কেঁপে উঠছে। চোখের গভীর জ্বালা অনুভব করছে। সর্বোপরি নিজের হীনমন্যতাজনিত যন্ত্রণার বিশৃঙ্খলায় তাড়িত হয়ে ভেজানো দরজা কম্পিত হাতে খুলে ফেলল।

নিশ্চুপ বিস্ফারিত চোখে অহিত্র চেয়ে দেখল নীলরঙ লাইটের নরম আলোয় ভরে আছে কুসুমের ঘর। মশারি টাঙানো খাটে কুসুম চিৎ শোয়া ঘুমিয়ে আছে। জঙ্ঘা থেকে সরে গেছে খানিকটা কাপড়। অনাবৃত স্তনদ্বয় লাল শালুকের মতো উর্দ্ধমুখী হয়ে ফুটে আছে তাড়িত অপেক্ষায়।

রাজ বৃক্ষ

বলরাম নন্দী

বিদ্যালয়ের প্রধান ফটক ঢোকার আগে এক প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ, শাখা প্রশাখা সমৃদ্ধ বয়সের ভারে একটু কাবু তবুও প্রকাণ্ড বলে দেওয়াই শ্রেয়। অনেক সময়েই স্কুলের গেটে ঢোকার অসুবিধার জন্য ডালপালা ছেঁটে দেওয়া হয় তবুও বট বৃক্ষের বিশেষ ক্ষতি বা ক্ষত হয় না, সে অক্ষত অমর।

বট বৃক্ষ সেই স্কুল প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই এখানে আছে। জন্ম রহস্য তার জানা নেই, তবে জ্ঞান হবার পর থেকেই বুঝতে পেরেছে এক বিশাল মাঠের একপাশে রাস্তার ধারে তার স্থান হয়েছিল। স্কুল প্রতিষ্ঠার তোড় জোড় সে স্বচক্ষে দেখেছে। তৎকালীন পরাধীন ভারতবর্ষের সময়ের ঘটনা। স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীনচেতা মানুষগুলোর কি অসম্ভব প্রয়াস, প্রাণবন্ত প্রস্তুতি অসাধারন উদ্যম। বট সবই লক্ষ্য করেছে। আজ সেইসব ইতিহাস সময়ের স্রোতে মলিন, ক'জনই বা মনে রেখেছে।

স্কুলের প্রতিষ্ঠার জীবিত সাক্ষী কেবলমাত্র বর্তমানের বৃদ্ধ বট। সময়ের সাথে সাথে স্কুলের পরিকাঠামোর হাজার পরিবর্তন, বিবর্তন, মেরামত, সবই তার দেখা। কত শিক্ষক, শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের অবাধ আনাগোনাতে স্কুল সমৃদ্ধ হয়েছে, কত জ্ঞানী গুণী মানুষের গুরুকুল এই বিদ্যালয়। স্কুলটার পাশে থাকতে থাকতে কবে যে স্কুলটা তার এতো আপন, কাছের হয়ে গেছে বুঝতেই পারে নি।

স্কুলের শতবর্ষ উদ্‌যাপন আর কয়েকদিন পর স্কুলে সাজো সাজো রব। স্কুলের প্রাচীর, স্কুল বিল্ডিং, স্কুল ক্যাম্পাস ঢেলে সাজানোর উদ্দেশ্যে উদ্যোগ লক্ষ্য করার মতো। কোথাও বিল্ডিং রং হচ্ছে, কোথাও নূতন বাগান বানানোর ব্যস্ততা কোথাও ঠুকঠাক শব্দে মেরামতির কাজ চলছে। সবাই যে যার মতো করে দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত। অনেক প্রাক্তন কৃতি প্রতিষ্ঠিত ছাত্র ছাত্রীদের সমাগম হবে, তার ই মহাযজ্ঞের প্রস্তুতি চলছে। স্কুলের প্রাচীরে সামাজিক সচেতনতার অনেক কথা ছবিসহ ঝকঝক করছে, নুতন রঙের গন্ধ এখনও বাতাসে মেলায়নি।

স্কুলের গেটে ঢুকতেই লেখা 'একটি গাছ একটি প্রাণ' এরপর একটি বটগাছের ছবি। দেওয়ালের লেখাটা দেখে প্রবীণ বট ভেবেছিল " যাক স্কুল তাকে নিয়ে ভেবেছে, আপন করে নিয়েছে। একরাশ আনন্দ, উচ্ছ্বাস নিয়ে তার সাম্রাজ্যে থাকা সকলকে বলেছে "দেখো, ওরা আমার কথা ভেবেছে। আমাকে নিয়ে লিখেছে আমাকে কদর করেছে, এঁকেছে।।

কোটরে থাকা টিয়া, মগডালে থাকা সোনাবৌ, শালিক, বুলবুলি সবাইকে বলেছে। সবাই এক

বাক্যে একসাথে বলেছে "আপনি আমাদের আশ্রয়দাতা, রাজা, আপনার সম্মানে আমরা গর্বিত, উচ্ছ্বসিত। প্রকাণ্ড রাজার ও কথাগুলো শুনে মন পুলকিত হয়, আনন্দে আবেগে নিজে আত্মহারা হয়।

কিন্তু হায় বিধির বিধান বটের জন্য বোধহয় বিকল্প কিছু ভেবেছিল, সমস্ত গর্ব অহংকার যেন দুচারজন লোকের কয়েকটা কথাতে বৃদ্ধ মন একেবারে ভেঙে চুরমার করে দেয় একবারে কাচের ঘরে বিস্ফোরণের মতোই।

মন বিষাদময় বাতাসের ছন্দে ও চুপচাপ শাখা প্রশাখা স্পন্দনহীন। পাখির কলতানে কলরবে উচ্ছ্বাসহীন নীরব, বৃদ্ধ রাজার এই রুপ আশ্রিত প্রজাদের পছন্দ হয়নি। সোনাবৌ,টিয়া,শালিক আর বুলবুলিরা সিদ্ধান্ত নেয়, রাজামশাই এর মনের খবর তাদের নিতেই হবে।

সবাই একসাথে রাজা বটের কাছে এলো, কিন্তু সোনাবৌ জিজ্ঞেস করল, - "মহারাজ,আপনি উদাস কেন? আপনি বলুন কি সমস্যা হয়েছে? আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। মহারাজ খুব দুঃখের সাথে বললেন,

"তোমাদের রাজা আর বেশিদিন নেই, তোমরা নিজেদের আশ্রয় অন্য কোথাও খুঁজে নাও। স্কুলের একশো বছর উদযাপন এর আগেই ওরা আমাকে কেটে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দু চারজন এসে দেখে ও গেছে। তোমরা দুঃখ করো না, আমি আমার ভবিষ্যত সময়ের ওপর ই অর্পণ করেছি। তোমরা এখন এসো, আমার খুব ক্লান্ত লাগছে।"

সবাই বিষন্ন মনে বটের সাম্রাজ্যের যে যার ঘরে ফিরে গেল। নুতন রাজা নুতন রাজ্য নুতন প্রতিবেশী খোঁজার চিন্তা আর পুরাতন রাজার ভালোবাসা, পুরাতন সাথীদের হারানোর আশঙ্কাতে সকলেই চিন্তিত। সারারাত কেউ ঘুমাতে পারল না। পাখিদের কিচিরমিচির শব্দে পথের পথিকগণ কিছু একটা সমস্যা আন্দাজ করল।

সোনাবৌ বিলুপ্তপ্রায়,দুজনেই থাকে একটা বাসাতে আর অন্যদের কথা সে বিশেষ জানে না, চোরা শিকারীদের সবসময়ই নজর থাকে তার ওপর, ছোট্ট বাচ্চাটার কথা ভেবেই মনটা অস্থির হয়ে যায়। আদৌ কি পারবে প্রাণের শিশুকে রক্ষা করতে, মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে যায়।

দশ বারো জন টিয়া এই গাছটাতে থাকে, কোটরে চারটে খুব ছোট ছোট বাচ্চা রয়েছে, এখনও উড়ে যাবার মতো হয়নি।

কিভাবে রক্ষা করবে, সারারাত ভেবে ও স্থির করতে পারল না।

এরকম চার পাঁচ দিন চলার পর দুটো বুলবুলি বিকেল বেলাতে বলল "স্কুল কতৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বটবৃক্ষ কে স্কুলের শতবর্ষ উদযাপন এর পর কাটা হবে। ওরা স্কুলের মিটিং এ কথাটা শুনেছে। বট ও একটু স্বস্তি পেল তার আয়ু আর কয়েকদিন বাড়বে ভেবে। বেশ একটা দুঃখের মাঝে ও একটু স্বস্তি।

স্কুলের শতবর্ষ উদযাপন এর দিন উপস্থিত, অনেক গণ্য মান্য মানুষের আগমনে আকাশ বাতাস মুখরিত, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, গবেষক, পরিবেশবিদ, পক্ষীবিশারদ সকলেই উপস্থিত। সকলেই স্কুলের অতীত কথা, বর্তমানে স্কুল কতটা প্রাসঙ্গিক, ভবিষ্যতে স্কুলের পঠনপাঠনকে কিভাবে সমৃদ্ধ করা হবে সেই সব কথা বলল। স্কুলের ছাত্র ছাত্রী সহ অতিথি শিল্পীদের অনুষ্ঠান

উপস্থিত সকলকে অনেক অনেক আনন্দ দেয়। সেইদিন টিয়া,সোনাবৌ, বুলবুলি, শালিক সবাই একসাথে মাঠের স্টেজের সামনে আগত অতিথিদের নাগালের বাইরে, কিন্তু নজরের মধ্যেই এদিক ওদিক করতে লাগল, আবার কখনও বটের গাছে উড়ে বসল।

এই দৃশ্য অনেকের নজর এড়াল কিন্তু পরিবেশবিদ, আর পক্ষী বিশারদ এর নজর এড়াল না। স্টেজে উঠে তারা ঘোষণা করল, আমাদের পরিবেশ, গাছ গাছড়া, পশু পাখিদের রক্ষা করার দায়িত্ব "আমাদের এই প্রাচীন গাছটা আমাদের ছোট বেলার অনেক দুষ্টুমির সাক্ষী, অনেক পাখিদের আস্তানা, ওটা আমাদের স্কুলের ঐতিহ্য হয়ে থাক।

স্কুল কর্তৃপক্ষ মেনে নিল বট থাকুক, বটের আশ্রিত পাখিরা ও থাকুক। স্কুলের শতবর্ষের সাক্ষী আর ঐতিহ্য হয়ে। বটের সাম্রাজ্য আর সোনাবৌ টিয়া বুলবুলির মতো প্রজারা নিজ মহিমায় স্কুলের কাছের বটগাছে আনন্দে আত্মহারা হয়ে থাকার সিদ্ধান্তে অনড় রইল।। (সমস্ত চরিত্র ও ঘটনা কাল্পনিক)

হরিমতী

দিব্যায়ন দাশ

রথের মেলা হইতে ফিরিয়া সদর দরজা পেরাতে না পেরাতেই বিনয়ের দজ্জাল গৃহিণী হরিমতী পাড়া কাঁপাইয়া চিলচিৎকার জুড়িয়া দিলো,-'দু পয়সার মুরোদ নেই যে পূজো-আচ্চার দিনে একটা নতুন কাপড় গায়ে দিই, ওদিকে শখ করে উনি রথ দেখতে গেচলেন। বলি রথ দেখে কোন বিশ্বজয় কল্লে শুনি? তারথেকে তো একটা খেলনা কিম্বা পাঁপড় ভাজার দোকান দিতে পারতে, দুটো টাকাও আসতো আর রথ দেখার শখটাও মিটতো!' একনাগাড়ে এতগুলি কথা বলিয়া এবং অনবরত নিজের কপালের দোষ দিইতে দিইতে হরিমতী অবশেষে একটু হাঁফাইয়া পড়িলে, বিনয় ধীরপদক্ষেপে জুতো খুলিয়া পা ধুইয়া ঘরে প্রবেশ করিলো। সে জানে এখানে কথা বলিতে যাওয়া মূর্খামির নামান্তর মাত্র। কারণ তাহাতে তেলে বেগুন পড়িবার মতো কোন্দল ক্রমাগত বাড়িয়া উঠিয়া এমন জটিল আকার ধারণ করিবে যে তাহার পক্ষে আর সামাল দেওয়া সম্ভব হইবে না। শেষপর্যন্ত স্ত্রী'র অনশন সত্যাগ্রহের জ্বালায় তাহারও দিন কতক কপালে হরিমটর জুটিবে। তাহার চাইতে মৌনব্রত ঢের ভালো!

তা এমন ঘটনা বিনয়ের সংসারে ইতিপূর্বেও বহুবার ঘটিয়াছে বলা ভালো নিত্যদিনই প্রায় ঘটিয়া থাকে। বিবাহের পর প্রথম প্রথম অবশ্য হরিমতী ঝামেলা বাধাইলে বিনয় পুরুষোচিত ভঙ্গিতেই প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলো। কিন্তু অল্পদিনেই সে বুঝিতে পারে যে এই কুঁদুলে বিদ্যায় তাহার স্ত্রী ঢের বেশি ডিগ্রী অর্জন করিয়াছে। কাজেই তাহার সাথে ঝগড়া করিতে যাওয়া নিজের পায়ে কুড়ুল মারারই সমতুল। একে তো ইহাতে হরিমতী ভীষণ রাগিয়া গিয়া বাসন-পত্র ছুঁড়িয়া সম্পদের ধ্বংস সাধন করিয়া থাকে এবং তারপরেও মাথা ঠান্ডা না হইলে অনশন সত্যাগ্রহে বসিয়া বিনয়ের পেটের দেবতাকে বিস্তর কষ্ট দিয়া তবেই শান্ত

হয়। তাই আজকাল বিনয় সাধ করিয়া হরিমতীকে ঘাঁটাইতে যায় না। মূলত নীরবতা অস্ত্রেই যুদ্ধ শান্তি চুক্তিতে পর্যবসিত হয়।

সে যাই হোক এইরকম করিয়াই বিগত বারো বৎসর ধরিয়া চলিতেছে বিনয়ের সুখের সংসার। পেশায় রঙ মিস্ত্রী বিনয় ইতিমধ্যে খুব ভালো করিয়াই বুঝিয়া ফেলিয়াছে অর্থই পৃথিবীর যাবতীয় সুখ-শান্তির মূল এবং তাহার কোনো বিকল্প নাই। একথা বলাই বাহুল্য যে তাহার আর্থিক দৈন্যই হরিমতীর যাবতীয় অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দু। পাড়ার লোকেরা বিনয়ের গৃহিণীর দজ্জালপনায় অতিষ্ঠ হইলেও হরিমতীকে সরাসরি কিছু বলিতে সাহস পায়না। তবে গোপনে বিনয়ের হিম্মৎ-এর প্রশংসা না করিয়াও তাহারা পারেনা। বস্তুত এহেন দজ্জাল বউ লইয়া ঘর করিতে যে কতখানি বুকের পাটা লাগে তাহা ইতিমধ্যে যাহারা সেইরূপ গৃহিণী পাইয়াছেন তাহারা সহজেই বুঝিবেন এবং যাহাদের তাহা জোটে নাই তাহাদের কথা বলিয়াও কাজ নাই।

তবে বিনয়ের বউ দজ্জাল হইলেও গুণী মানুষ। সেলাই-ফোঁড়াই, রান্নাবান্না, বিচিত্র রকমের কেশবিন্যাস ইত্যাদি বিষয়ে পাড়ায় তাহার জুড়ি মেলা ভার। ছেলেবেলায় তাহার মা তাহাকে যে অনেক কিছুই মেয়েলী গুণের শিক্ষা দান করিয়া গিয়াছিলো তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু চাঁদের মধ্যে যেমন কলঙ্ক থাকে সেইরূপ হরিমতীর অজস্র গুণের মধ্যে তাহার ঝগড়ুটে স্বভাবটিই বেশি করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে বরাবরই। কাজেই পাড়ার লোকেরা বিনয়ের সাথে কমবেশি কথাবার্তা বলিলেও হরিমতীর ধারেকাছে সহজে ঘেঁসে না। তবে পাড়ার মেয়ে বৌদের, হরিমতীর ধারেকাছে না ঘেঁসিবার আরোও একটি গূহ্য কারণ রহিয়াছে। সেটি হইলো বিনয়ের গৃহিণীর এত্যাবধি কোনো সন্তান জন্মায় নাই।

আজ যথারীতি গৃহিণীর গালমন্দ হজম করিয়া চুপচাপ বিনয় ঘরে প্রবেশ করে। এমনিতেই ভরা বর্ষার দিন, এসময়টা কেহই ঘরবাড়ি রঙ করায় না। ফলে বিনয়ের মতো রঙ মিস্ত্রীর পক্ষে এ সময়টা নিতান্তই টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়া চালাইতে হয়। বৎসর ভর তিল তিল করিয়া জমাইয়া তুলা সীমিত সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে হাত পড়ে। তাহার উপর আবার গৃহিনীর কাছে আর্থিক দৈন্য লইয়া নিত্যদিন মুখ ঝামটা খাইলে আর কয়জন পুরুষেরই বা মন মেজাজ ভালো থাকে!

দিনকতক ঘরে বসিয়া থাকিতে থাকিতে অবশেষে বিরক্তি লাগিলে, বিনয় মন ভালো করিবার উদ্দেশ্যে রথযাত্রার দিন বিকেলে বৃষ্টি একটু ধরিলে রথের মেলায় গিয়াছিলো। হরিমতীকেও যে যাইবার জন্য সাধে নাই তাহা নহে, কিন্তু নতুন কাপড় না থাকায় সে পত্রপাঠ উক্ত প্রস্তাব নাকচ করিয়া দেয়! অগত্যা বিনয়কে একলাই যাইতে হইয়াছিলো। তবে আসিবার সময় দশ টাকার জিলিপি তাহার স্ত্রী'র মন ভালো করিবার জন্য কিনিয়া আনিয়াছিলো। ভাবে নাই বচ্ছরকার দিনে ঘরে ঢুকিয়াই হরিমতীকে এইরূপে দেখিতে হইবে! সুতরাং জিলিপির প্যাকেটটি রান্নাঘরের একটি পেরেকে ঝুলাইয়া রাখিয়া সে আপনার ঘরে গিয়া তক্তোপোশের উপর শুইয়া পড়ে। আসলে মেলা থেকে ফিরিয়া শরীরটা আজ তাহার তেমন ভালো লাগিতেছিলো না। হঠাৎ বুকের বাম দিকটায় তাহার তীব্র মোচড় দিয়া উঠিলে সে অস্ফুট স্বরে কাউকে ডাকিতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারেনা! আস্তে আস্তে তাহার চোখের পাতাগুলিও বুজিয়া আসিতে চায় যেন! তারপর নিজের অজান্তেই অনন্ত সুপ্তির জগতে পাড়ি দেয় বিনয়। চোখের কোন

বাহিয়া দু ফোঁটা জল গড়াইয়া বিছানায় আসিয়া পড়ে!

বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া তখনও হরিমতী কপালে করাঘাতের সহযোগে আপন ভাগ্যের দোষ দিয়া যাইতেছে অনবরত!

পরদিন সকাল থেকে বাহিরে অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়িয়া পড়িয়া হরিমতীর উঠোনটিকে জলমগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে, দু একটি ব্যাঙ থেকে থেকেই লাফাইয়া ঘরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু ঝাঁটা বালতি লইয়া গজগজ করিতে করিতে আজ আর তাহাকে উঠানে বাহির হইতে দেখা যায় নাই। হঠাৎ প্রাত্যহিক নিয়মে কি যেন একটা গোলমাল হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বাড়িটিকে অনাবশ্যক পরিমাণে শান্ত দেখিয়া কয়েকটি কাক ও শালিক কার্নিশে বসিয়া ভিজা ডানা ঝাপটাইতে থাকে।

শ্মশান থেকে যখন দাহকার্য সমাপন করিয়া শ্মশানযাত্রীরা ফিরিয়া আসিলো তখনও ক্রমাগত বৃষ্টি পড়িতেছে। বিনয়ের সদ্য বিধবা ঝগড়ুটে গৃহিণী প্রস্থরমূর্তিবৎ চুপচাপ চৌকাঠে বসিয়া আছে আর তাহাকে ঘিরিয়া গ্রামেরই কিছু মেয়ে-বৌ তখনও চাপা স্বরে কাঁদিয়া তাহাকে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতেছে।

ঘন্টাখানেক পর অবশেষে বারো বছরের শাঁখা-সিঁদুরের বন্ধন হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া হরিমতী পুকুর ঘাট হইতে ঘরে ফিরিয়া আসে। এত্যাবধি সে একটুও চোখের জল ফেলে নাই কিন্তু প্রতিবেশীরা চলিয়া গেলে, অন্ধকার ঘরে ঠায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ হরিমতীর বুকখানি খুব ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতে থাকে। একসময় আষাঢ়ের ধারার মতো তাহার চোখ হইতে অবিশ্রাম নোনাজলের স্রোত গাল বাহিয়া বুকে আসিয়া পড়ে। আর কি একটা যন্ত্রনায় যেন সে ছুটিয়া গিয়া তক্তোপোশের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মাথায় করাঘাতের পর করাঘাত করিয়া বলিতে থাকে- 'ওগো আমার শুধু রাগটাই দেখলে....! কুঁদুলে স্বভাবটাই চিরকাল মনে রাখলে...! ওগো এই হরিমতী যে তোমাকে ভালোবাসিয়াছিলো সেটা কখনো দেখলে না...? ও গো এতই যদি দোষের দোষী ছিলুম তবে আমি আগে গেলুম না কেন...?' বাহিরের অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দে তাহার কান্না ভেজা কন্ঠের বিলাপ আজ কোথায় যেন মিলাইয়া গেলো!

এতদিন পরে সহসা হরিমতী উপলব্ধি করিলো তাহার ঔদ্ধত্যের কেন্দ্রটি কত ঠুনকো কত ভঙ্গুর ছিলো। মাত্র এক মুহূর্তেই তাহার যাবতীয় সুখ-দুঃখের, অভাব-অভিযোগের কেন্দ্র থেকে বিধাতা কত সহজেই যেন তাহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলো আস্তাকুঁড়ে। জীবিতাবস্থায় হরিমতী যাহার সুখের কারণ কখনো হইয়া উঠিতে পারে নাই, বলা ভালো চেষ্টাই করে নাই! আজ সেই তাহার জন্যই হৃদয় থেকে এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করিতে থাকে!

বিধাতা যেন অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহার হৃদয় লক্ষ্য করিয়া বাণ মারিলেন। আর সেই বাণ যেন সহসা হরিমতীর ঔদ্ধত্বের মেরুদন্ডটিকে ভাঙিয়া দিয়া বর্ষার দমকা বাতাসের মতো উড়িয়া চলিয়া গেলো এক নিমেষে। কিন্তু যাইবার সময় যাহা লইয়া গেলো তাহার মূল্য পৃথিবীর অগাধ সম্পদ দিয়াও কখনো মিটানো যাইবে না!

নাঃ! আজকাল হরিমতীকে আর দজ্জাল বলা চলেনা। বরং তাহার মতো শান্ত প্রকৃতির মানুষ তাহাদের পাড়ায় কমই দেখা মিলে।

অদিনের সিন্দুক

ভগীরথ মিশ্র

রাতের খাবারে পায়েস দেখে প্রিয়ব্রতর ঠোঁট অজান্তে ভেঙে গেল। ভুরুসঙ্গমের মাটি এবড়োখেবড়ো। শান্তার চোখ এড়ালো না সেটা। একটুক্ষণ দাড়িয়ে থেকে ধীরপায়ে রান্নাঘরে চলে গেল সে।

শান্তা জানে, প্রিয়ব্রত আজ পায়েস ছোঁবে না। কিন্তু কারণটা শান্তার জানা নেই। এই বারো বছরেও জানা গেল না। শান্তা যখন বিয়ের কনেটি, তখনই প্রিয়ব্রতের মা চিবুক ছুঁয়ে বলেছিলেন, শিবের মতো বর পেয়েছ মা; ওকে নিয়ে তোমার কোনও ঝক্কিই পোহাতে হবে না। মাঝেমাঝে দুধ-নারকোল দিয়ে পায়েস বানিয়ে দিও, শিব তোমার ওতেই বারো আনা বশ। পায়েসকে মায়ের অধিক ভালোবাসে।

প্রিয়ব্রতও পরে বলেছিল কথাটা। পায়েস আমার কাছে এক অর্থে দর্শন। তাই, মন যখন ভীষণ ভালো থাকে, পায়েস খেতে ইচ্ছে করে। আবার যখন তীব্র বিষাদে থাকি, তখনও পায়েস চায় মন।

কিন্তু আশ্চর্য, ঐ পায়েস খাওয়াতে গিয়েই বহুবার প্রিয়ব্রতর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে শান্তার। অনেক সাধ করে, সারা দুপুর না ঘুমিয়ে শান্তা হয়তো পায়েস রাঁধলো পরিপাটি করে। দুধ, নারকোল, চিনি, কিসমিস, ছোট এলাচের গুঁড়ো, এবং তার সঙ্গে প্রিয়ব্রত বলে, দুনিয়ার তাবৎ অসাধারণ শিল্পসৃষ্টির পেছনে ব্যাকরণ বাদেও থাকে স্রষ্টার বুকের ভেতরের খানিকটে নরম মৃত্তিকা। প্রিয়ব্রত অফিস থেকে ফিরে এলে শান্তা তার দিকে পায়েসের বাটিটি এগিয়ে দিল প্রগাঢ় মমতায়। কিন্তু পায়েস দেখামাত্রই ঠোঁট বেঁকে গেল প্রিয়ব্রতর। নাক-ভুরু কুঁচকে উঠলো। যেন তার সর্বাঙ্গ জুড়ে সেই মুহূর্তে তীব্র বিবমিষার অনুভূতি। অথচ প্রিয় বস্তু পেলে এমন সর্বাঙ্গ দিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করবার সঠিক কারণটা আজ অবধি শান্তার অজানা। একেবারে বুদ্ধির অগম্য। অনেকবার অনেকভাবে প্রিয়ব্রতর অমন ভাবান্তরের কারণ বোঝবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে শান্তা। প্রিয়ব্রত কিছু কিছু কারণও দেখিয়েছে। কিন্তু ওর যুক্তিগুলো শান্তার মগজে ঠিকমতো ঢোকে নি। ইদানিং শান্তার মনে বিশ্বাস জন্মেছে, প্রিয়ব্রতর বুকের মধ্যে এমন একটা অচিন রাজা রয়েছে, যা ওর একান্ত নিজস্ব এবং এযাবৎকাল শান্তার অনাবিষ্কৃত। কোনও কিছু আবিষ্কার করতে না পারার মধ্যে এক ধরনের অন্তর্দাহী যন্ত্রণা থাকে। থাকে দুর্বোধ্যতাজনিত ভয়। সেই যন্ত্রণায় ইদানিং পুড়তে থাকে শান্তা। সিঁটিয়ে থাকে ভয়ে। তার মধ্যে তিলিতিল জন্ম নিচ্ছে এক

ধরনের অসহিষ্ণুতা। জেদ।

শান্তা ভ্রূকুটি করে তাকালো প্রিয়ব্রতর দিকে। আড়াল থেকে লক্ষ্য করতে লাগলো প্রিয়ব্রত পায়েসটা খায় কিনা। একটা অসংগঠিত যুদ্ধ বহুকাল নিঃশব্দে বুকের মধ্যে বয়ে বেড়াচ্ছে শান্তা। তাকে আজ সংগঠিত করবার ইচ্ছে জাগে মনে। কেন জানি অনেক দিন ধরেই শান্তার মনে হচ্ছিল, যে-কোনও কারণেই হোক না কেন প্রিয়ব্রতর মনে এক ধরনের বিতৃষ্ণা রয়েছে শান্তাকে নিয়ে। এক ধরনের অরুচি। মাঝেমাঝেই কথাবার্তায়, আচার-আচরণে সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। শান্তার প্রতি মাঝেমাঝেই বড় বিরূপ আর নির্দয় হয়ে ওঠে প্রিয়ব্রত।

এই তো সেদিন, শান্তার জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রিয়ব্রত নিজেই পছন্দ করে একখানা শাড়ি কিনলো শান্তা শাড়িখানা পরতেই একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো, কিন্তু পরের রোববার সিনেমা যাবার সময় যখন ঐ শাড়িখানা ফের পরলো, তখন যেন প্রিয়ব্রত একেবারেই অন্য মানুষ। চোখমুখ কুঁচকে বললো, রোজ রোজ এক শাড়ি পর কেন? তোমার আর শাড়ি নেই?

আহত শান্তা জবাব দিল, এ'তো তোমারই দেওয়া সেই জন্মদিনের শাড়িটা।

প্রিয়ব্রত ততোধিক খর গলায় বললো, রোজ রোজ তোমার জন্মদিন নয়।

প্রিয়ব্রতর গলার স্বর একেবারেই অচেনা লাগে শান্তার কানে। ওই মুহূর্তে প্রিয়ব্রত যেন রক্তমাংসের নয়, খটখটে একটা কাঠের মানুষ। রবীন্দ্রসংগীত সুন্দর গায় শান্তা। প্রিয়ব্রতও রবীন্দ্রসংগীত ভীষণ ভালোবাসে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান যেন তার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে মিশে গিয়েছে। শান্তাকে দেখতে গিয়ে কেবল একটা প্রশ্নই শুধিয়েছিল প্রিয়ব্রত, রবীন্দ্রনাথের ঐ গানটা গাইতে পারেন? শান্তা সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়ে দিয়েছিল গানটা। শুনতে শুনতে প্রিয়ব্রতর সারা মুখে বিশ্বজয়ীর হাসি। সঙ্গে সঙ্গে বিয়েতে মত দিয়েছিল সে। অথচ, মাসটাক আগে, যখন গানটা গুনগুনিয়ে গাইছিল শান্তা, আচমকা বেজায় ক্ষেপে গেল প্রিয়ব্রত।

বললো, সারাক্ষণ ফাটা রেকর্ডের মতো একই গান গাও কেন? অন্য গান জানো না? মেয়েরা বড্ড স্টিরিওটাইপ।

প্রথম প্রথম ব্যাপারগুলোকে খামখেয়ালিপনা আর ছেলেমানুষি বলে উড়িয়ে দিত শান্তা। কিন্তু মানুষের সহ্যেরও তো সীমা আছে। তার ওপর শান্তার দিনকয়েক মনটা খুব খারাপ। তার কারণও প্রিয়ব্রত।

সমুদ্র চিরকালই প্রিয়ব্রতর স্বপ্নের জায়গা। শান্তারও। সমুদ্রের তীরে যাবার কথায় দুজনেরই প্রাণ নেচে ওঠে। সমুদ্রের কাছে পৌঁছলে মনের তাবৎ বিষাদ যেন ঝড়ো হাওয়ার মতো উড়িয়ে নিয়ে যায়। সমুদ্র মানুষকে অ্যাতো ভুলিয়ে দেবার মন্ত্র জানে! অ্যাতো দুলিয়ে দিতে জানে! একটা বিষয়ে তাই প্রিয়ব্রত আর শান্তা স্থায়ীভাবে একমত। এই পৃথিবীতে কেবল সমুদ্রের কাছেই নতজানু হওয়া চলে। সুযোগ পেলেই তাই সমুদ্রের কাছে যাওয়ার জন্য আকুলিবিকুলি করে দুজনেই।

প্রিয়ব্রতর, সঠিক অর্থে কোনও আশ্রয় নেই। ওপার-বাংলা থেকে জনস্রোতে ভাসতে ভাসতে এককালে এদেশে এসেছিল সে বাবা-মায়ের সঙ্গে। তারপর, ভাড়াবাড়িতে তিলতিল করে অ্যাদ্দিন কেটেছে। বাবা-মা গত হয়েছেন পরপর। এখনও প্রিয়ব্রত ভাড়াবাড়িরই বাসিন্দা। এবার একটা বাড়ি করা প্রয়োজন।

কোথাও একটুখানি থিতু হওয়া দরকার। একটা স্থায়ী ঠিকানা চাই মানুষের। প্রিয়ব্রতর বুকের আর্তিটা শান্তার অজানা নেই। তাই নিয়ে তার খুশিরও অন্ত নেই। নিজস্ব একখানা ছিমছাম বাড়ি, মেয়েদের স্বপ্নের ভেতরে, রক্তের মধ্যে থাকে। স্বপ্নটা যদি পুরুষের মধ্যেও চারিয়ে যায়, তার চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কিছুই নেই। ইদানিং, মাঝেমাঝেই, বাড়ি বানানোর ব্যাপারটা প্রিয়ব্রত আর একটি অন্যতম প্রিয় বিষয়।

শান্তা বলে, আমাদের যখন কোথাও বিশেষ শেকড় নেই, আমরা তবে আমাদের এক্কেবারে মনের মতো জায়গায় বাড়ি বানাতে পারি।

প্রিয়ব্রতরও তাতে দ্বিমত নেই। কিন্তু সেই মনের মতো জায়গাটি তো নির্বাচন করতে হবে। এই মুহূর্তে বাড়ি বানানো না গেলেও একটি জমি অন্তত কিনে ফেলা উচিৎ এখনই। মফস্বল শহরেও হু-হু করে দাম বাড়ছে জমির।

শান্তা বলে, এসো, আমরা সমুদ্রের তীরে বাড়ি বানাই।

কথাটা প্রিয়ব্রতকে অল্প কাঁপিয়ে দেয়। সমুদ্রের তীরে বাড়ি! তার মানে, আজীবনকাল, দিনরাত, দণ্ডেদণ্ডে, পলে পলে সমুদ্রের সঙ্গে নিরঙ্কুশ বসবাস,... সহবাস! নীরবতাটা ভাঙতে চায় না প্রিয়ব্রত। শান্তার কথার জবাবটা দেওয়া হয়ে ওঠে না সেই কারণেই।

ইদানিং শান্তার ভাবনায় সিঁধেল চোরের মতো নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছে একটি বাড়ি। সমুদ্রের ঢেউয়ের মুখোমুখি নিজের একটি বাড়ি। শান্তা যাকে পায় তাকেই বলে, দিন না ভাই, সমুদ্রের ধারে এক চিলতে জমি জোগাড় করে। ছোট্ট এক টুকরো জমি। দু'তিন কাঠা।

দিন তিন-চার আগে, প্রিয়ব্রত অফিস থেকে ফিরতেই একেবারে গেটের কাছে ছুটে গেল শান্ত। উত্তেজিত গলায় বললো, দারুণ খবর!!

-কি ?

-মিল গয়া।

প্রিয়ব্রত হকচকিয়ে যায়। শান্তা ধানবাদের মেয়ে। বেজায় খুশি হলে হিন্দি আওড়ায়।

-কী হলো কি ? লটারির ফার্স্ট প্রাইজ পেলে নাকি ?

-তার চেয়েও বেশি। শান্তা রঙের টেক্কা দিয়ে তুরুপ করবার ভঙ্গিতে একখানা চিঠি সপাটে আছড়ে মারলো প্রিয়ব্রতের হাতে।

চিঠিখানা খুলে পড়লো প্রিয়ব্রত। শান্তার মামাতো দাদা বিকাশ লিখেছে। ওর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কিছুটা জমি বিক্রি আছে দীঘাতে। সমুদ্রের একেবারে কাছে। বিকাশদা কাঠাচারেক জমি আগলে রেখেছে শান্তাদের জন্য। খুব তাড়াতাড়ি কোলকাতায় গিয়ে বায়না দিয়ে আসতে হবে।

শান্তার চোখেমুখে অস্থিরতা। বললো, চল, আজ রাতের ট্রেনেই চলে যাই।

-ধুশ। এক ফুৎকারে শান্তার প্রস্তাবটা উড়িয়ে দেয় প্রিয়ব্রত,... আজ রাতে কী করে যাবো ?

-তবে কাল সকালের ট্রেনেই চল।

-আর অফিস ?

-কাল দিনটা ছুটি নিয়ে নাও। বলতে গিয়ে শান্তা ঈষৎ বিরক্ত।

-তা হয় না। কাল কতকগুলো জরুরি কাজ রয়েছে।

শান্তা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে প্রিয়ব্রতর মুখের দিকে, এর চেয়েও অফিসের কাজটা জরুরি হলো তোমার কাছে? এর চেয়ে আর কিছু জরুরি হতে পারে!

প্রিয়ব্রত জবাব দেয় না। নিঃশব্দে জুতোর ফিতে খুলতে থাকে।

সেদিন সারা সন্ধ্যে প্রিয়ব্রতকে একতিল রেহাই দেয় নি শান্তা। উঠতে বসতে অবিশ্রাম জেরা। অনুযোগ। অভিমান। অবশেষে নির্বাক যুদ্ধ ঘোষণা।

অবশেষে রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে, আধো অন্ধকারে মনের কথাটি খুলে বলে প্রিয়ব্রত, দীঘায় বাড়ী বানানোর আদৌ ইচ্ছে নেই আমার।

-সে কি! নিজের কানকেও বিশ্বাস হয় না বুঝি শান্তার। অবাক হয়ে শুধোয়, কোথায় তবে বাড়ী বানাতে চাও তুমি?

-অন্য কোথাও। খুব নিচু গলায়, প্রায় নিজেকে শোনানোর মতো করে বলে প্রিয়ব্রত, সমুদ্রের ধারে ছাড়া আর যে কোনও জায়গায়।

বিভ্রান্ত শান্তা একসময় নিদারুণ ক্ষোভে ফেটে পড়ে, তোমার যা খুশি কর তুমি। তোমার মতিগতি কিছুই বুঝি নে আমি। তুমি যে কী চাও, কী বোঝ..... আমার আর একদম ভালো লাগছে না।

একসময় নিজের সিদ্ধান্তের গায়ে এক পলেস্তারা জেদ চাপিয়ে শান্তা বলে, শোন, আমিও তোমার সাফ বলে দিচ্ছি, হয় দীঘায়, নয় কোথাও নয়।

শান্তার ভেতরের আগুনটার আঁচ প্রিয়ব্রতের কাছ অবধি পৌঁছে যায় এক লহমায়। তার দু'চোখে নেমে আসে সীমাহীন বিষাদ। শুধু অসহায় চোখে শান্তার দিকে চেয়ে থাকে সে। কথা বলে না।

সেই থেকে ঠাণ্ডা লড়াইটা চলছিল।

ধীরে ধীরে অবশ্য এই ক'দিনে রাগটা পাতলা হয়ে এসেছে শান্তার মনে। অভিমানের ফিনফিনে ওড়নাটাও উড়ে গেছে। আহা, মানুষটা তো ভালোই। শান্তাকে ভালোবাসেও পাগলের মতো। শুধু ঐ মাঝেমাঝে কী এক রহস্যময় কারণে কিছু কিছু বিপরীত আচরণ করে বসে। শান্তা তার কূলকিনারা পায় না বলেই ক্ষেপে যায়।

হঠাৎ আজ খুব ইচ্ছে হলো শান্তার। পায়েস খাওয়াবে প্রিয়ব্রতকে। আসলে, উত্তপ্ত আকাশে মেঘ জমতেই চারপাশে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে শান্তার মনে। সে এখন মনে মনে সন্ধি চায়। শ্বেত পতাকার বদলে একবাটি দুধ-নারকোলের পায়েস। প্রিয়ব্রতর কাছে যা কিনা মায়ের মতো। সারা দুপুর বহু মেহনত করে তাই পায়েস বানিয়েছে শান্তা। কিন্তু পায়েসের

বাটিটা দেখামাত্র প্রিয়ব্রতের যে এমন প্রতিক্রিয়া হবে, সেটা কল্পনায়ও আসে নি তার।

রান্নাঘরের দরজায় গা এলিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে প্রিয়ব্রতর খাওয়া দেখছিল শান্তা। প্রিয়ব্রত পায়েসের দিকে তাকাচ্ছেই না। দেখতে দেখতে একতাল কান্না মোচড় দিয়ে উঠতে লাগলো শান্তার বুক ঠেলে।

একসময় ঢকঢক করে গ্লাসের জলটুকু শেষ করলো প্রিয়ব্রত। শান্তা যেন এই মুহূর্তটির অপেক্ষায় ছিল। বললো, পায়েসটা খেলে না যে?

-খেতে ইচ্ছে করছে না— খুবই ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল প্রিয়ব্রত।

-পায়েস খেতে তোমার ইচ্ছে করছে না? শান্তার দু'চোখ জ্বলে উঠলো।

প্রিয়রত বুঝি এতক্ষণ আপ্রাণ প্রয়াসে শান্ত রেখেছিল নিজেকে। অকস্মাৎ নিজের ওপর সব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললো সে।

খুব খর গলায় বলে উঠলো, না, করছে না। বলেই আচমকা পায়েসের বাটিটাকে এক ঝটকায় ফেলে পাশটিতে দাঁড়িয়ে শান্তাকে অনেকক্ষণ দেখলো প্রিয়ব্রত। একসময় আলতো হাতে ছুঁলো ওর পিঠ। মৃদু কম্পন উঠলো শান্তার সারা শরীরে।

শান্তার পাশটিতে নিঃশব্দে বসলো প্রিয়ব্রত। পরম স্নেহে পিঠে হাত বুলোতে লাগলো নীরবে। আত্মস্থ গলায় বললো, রোজ রোজ আমায় পায়েস খাইও না শান্তা। জন্মদিনের শাড়িও রোজ রোজ পরো না। সমুদ্রের ধারে চিরকালের ঘর বানানোর স্বপ্নও দেখো না।

ভাসমান

ঋতশ্রী মান্না

রোদ পড়ে আসা একচিলতে দাওয়া- পড়ে আছে ধুলোমলিন, বিষণ্ণ একতারাটি--মোহন বৈরাগী ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার আগের রাতে, শেষবার বেজেছিল সে।

মেঠোসুরের মত সহজ চলন নিয়ে, পুরনো চালে লতিয়ে উঠেছে মাধবীলতা- সরু পথ বেয়ে এগিয়ে গেলে বাঁশঝাড়, পুকুর-বাঁশের ছায়া ঝুঁকে রয়েছে জলে- নিশ্চল শ্যাওলা জমেছে ঘাটের ভাঙা সিঁড়িদের গায়ে...

দাওয়ার সামনে একফালি উঠোন... বিবর্ণ ঘাস। ওরা সবুজ কথার যুগ পেরিয়ে এসেছে বহুকাল। এসব ঘাসের গায়ে, স্বপ্নের মত নরম বেগুনি ঘাসফুল ফুটেছিল, সেও কতকাল আগে। একটি জন্ম পার করে খসে গেছে তারা। এই পুষ্পহীন বাদামী নির্জনতায় সুরের আহরণ নেই- কিছুদূরে একটা কাঠগোলাপের গাছ, একটাও পাতা নেই তার- দূরে কেবল একটি কমলা গোধূলি ফুটে আছে।

এমন অসহনীয় নগ্নতার সামনে দাঁড়ালে কেবলই শ্মশানচিত্র মনে পড়ে আমার। চিতাকাঠ, ঘি-মাখানো মৃতদেহের নগ্নতা ছুঁয়ে নেচে নেচে উঠছে তীব্র

আগুনশিখা- আসন্ন সূর্যাস্তের মত রং তার।

এমনই একটা কমলারঙা গোধূলিতে ফুলি স্বেচ্ছায় মরে গিয়েছিল...

ফুলির তিনকূলে কেউ ছিলনা, সঙ্গত কারণেই তার মরে যাওয়া খুব বেশি রেখাপাত করেনি কারুর মনে। দু-তিনদিন আলোচনা, ফিসফাস- জলে ঢিল পড়ার পর ক্ষণিক আলোড়ন- তারপর সব চুপচাপ।

কেবল মোহন বৈরাগী কোনো এক অজ্ঞাত কারণে একতারা বাজানো ছেড়ে দিয়েছিল।

তার সাথে শেষ দেখার দিনে সে বলেছিল, মরে গেলে কেউ তারা হয়নিকো দাদাবাবু। ওসব মিথ্যে কথা।

আমি বলেছিলাম, তবে কী হয়?

সে বলেছিল, কী জানি। হয়ত অন্ধকার হয় বেবাক ফাঁকা একখানা। আলো না থাকার আঁধার, মানুষ না থাকার আঁধার...

আমি বলেছিলাম, বাজাও না, শুনিনি কতকাল।

সে দাওয়ায় বসে একতারা বাজিয়েছিল বহুক্ষণ, তারপর একতারাটি পাশে নামিয়ে রেখে বলেছিল, তুমি তো অনেক পড়ালেখা শিখেছ দাদাবাবু, বলো তো এ সুর আসলে কোথায় থাকে, একতারায়?

তারপর আপনমনেই হেসে উঠেছিল, না গো, শূন্য থেকে উঠে আসে সে, তারটিকে আশ্রয় করে বেজে ওঠে। তারপর আবার শূন্যেই মেলায়।

পরেরদিন থেকে মোহনবৈরাগীর আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেলনা।

সন্ধ্যে নামে, কাদের বাড়ির ছেলে দুলে দুলে সুর করে ছড়া পড়ে —

"বাজাতে বাজাতে চলল ঢুলি
ঢুলি গেল সেই কমলাফুলি..."

গূঢ় রহস্যের মত সন্ধ্যে- শাঁখ বাজে, কাঁসর ঘন্টা- তরল জ্যোৎস্না ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ে- স্পর্শে কেঁপে ওঠে অস্তিত্বহীন মায়া-অন্ধকার-...

"বাজাতে বাজাতে চলল ঢুলি
ঢুলি গেল সেই কমলাফুলি..."

এই জ্যোৎস্নায় ডুব সাঁতার দিয়ে, ঘাট ছেড়ে ভেসে যায় ফুলি, মোহন বৈরাগী- ভাসতে থাকে, ভাসতেই থাকে- অনন্ত সে যাত্রা- আবার কোন্ ঘাটে গিয়ে ভেসে উঠবে তারা, কোন্ গল্পের তীরে দেখা হবে তাদের, কে জানে!

লম্বা হাত খাটো হাত

অমর মিত্র

ভগবানের সঙ্গে যা হয়েছিল তা স্পষ্ট আমার মনে নেই। খাটো হাতের এমনই মহিমা। মুহূর্তে মুহূর্তে জীবনের ছবি বদল হয়। জীবন বদল হয়। কত রকম তার ছবি। ভগবান হুজুর আমাকে বলেছিল। জগতে সব কিছু মনে রাখা যায় না। কেউ কেউ কিছু ভুলে যায় না। আমিও তাই। আমি মনে রেখেছি নিজের মতো করে। আসলে আমি চিরকাল ভিখিরি। বাবা ভিখিরি ছিল, তার বাবা ভিখিরি হয়ে গিয়েছিল। ঠাকুরদার বাবা জমি রেখে গিয়েছিল অনেকটা। বন কেটে বসত। অনাবাদী পতিত জমি আবাদী করেছিল। লোকটা খুব খাটতে পারত। আমার ঠাকুরদাও নদীর চর দখল করে চাষাবাদ বাড়িয়েছিল। বাবার আমলে সেই জমি থেকে উচ্ছেদ করতে আমাদের ঘর পুড়িয়ে, অল্প বয়সী মেয়েকে লুট করে তাড়িয়ে দিতে আমরা ভিখিরি। আমি পথের ধারে বসে হাত পেতে ভিক্ষে করি। আমার বউ ছিল। সে ভিখিরির সঙ্গে থাকবে না বলে আর একজনের সঙ্গে সংসার বেঁধেছে। তার দ্বিতীয় পক্ষ রিক্‌শা চালায়। গ্রামে জমি আছে দুবিঘে। চাষের সময় যায়। ধান কাটার সময় যায়। রাস্তার ধারে ঝুপড়ি বেঁধে থাকে। মেয়েকে নাকি ইস্কুলে দিয়েছে। সবই শোনা কথা। সাতবাড়ি কাজ করা আমার বউ আমাকে দেখলে রাস্তা পার হয়ে অন্য ফুটপাথে চলে যায়। আমি বসে বসে খিস্তি দিই তাকে। একদিন একটা লম্বা দুধ সাদা গাড়ি রাস্তা দিয়ে যেতে আচমকা থেমে গেল, আমি আমার লম্বা হাত নিয়ে এগিয়ে গেছি, ভগবান আপনার ভাল করবেন, কিছু দিয়ে যাবেন বাবু।

হাত সরা হাত সরা। ধমকে উঠে লোকটা বলল, ভিক্ষে করতে করতে তোর হাত খুব লম্বা হয়ে গেছে শুয়ার, গাড়ির ভিতরে ঢুকে আসে, তুই এইখেনে থাকিস ?

জি হুজুর, ইয়েস স্যার।

উফ্, কী গন্ধ এখেনে। নাকে রুমাল দিয়ে লোকটা গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, এইরকম একজনকে খুঁজছিলাম, তোকে আর ভিক্ষে করতে হবে না, থুহ, কী পচা গন্ধ তোর গায়ে।

না স্যার, ইঁদুর মরেছে, পচা ইঁদুরের গন্ধ।

ওয়াক! বমি এসে যাচ্ছে, আমার লোক আসবে তোকে নিয়ে যেতে।

লোকটার ধবধবে পায়জামা পাঞ্জাবি। মাথায় গেরুয়া হলুদ পাগড়ি। গালে ছাঁটা দাড়ি, সাদা কালো মিশানো। চেনা চেনা মনে হয়। কিন্তু চিনতে পারি না। একটু পিছিয়ে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, স্যার আপনার নাম ?

আমি কে.ডি.ভি। দূরে দাঁড়িয়ে নাকে রুমাল দিয়ে লোকটা বলল, ম্যায় কে.ডি.ভি হুঁ।

স্যার আপনি ভগবান।

ইয়েস ম্যায় ভগোয়ান হুঁ, আমার লোক এসে তোকে আমার প্যালেসে নিয়ে যাবে। বলতে বলতে গাড়ি হুস করে চলে গেল। রাস্তায় একটা সোনার টাকা।

লম্বা হাত বাড়িয়ে আমি তুলে নিলাম। চাইতে চাইতে হাত সত্যিই লম্বা হয়ে গেছে, সোনার টাকা হলো সোনালি দশ টাকার কয়েন।

সকালে উঠে জোড়া শালিক দেখিনি। নিঃসঙ্গ এক দাঁড় কাক দেখেছিলাম সবদিনের মতো। আর একটি বড় সাইজের মরা ইঁদুর। রক্তপুঁজ মাখা ইঁদুরটিকে ঠোকরাচ্ছিল কাক। জমাদার এসে বেলচা ঠেলে ইঁদুরটিকে সরিয়ে দিয়েছে রাস্তার ধারে। গম্ভীর দাঁড় কাক ডানা ভাসিয়ে একবার চাদ্দিক ঘুরে এসে কদম ডালে বসে নিরীক্ষণ করছিল ইঁদুরের শব। কয়েকটা পাতি কাক হামলে পড়ছিল পচা ইঁদুরের উপর। লোকটা যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখানেই ইঁদুরটা ছিল। গন্ধটা কি মুছে গেছে? লোকটা ছিল খুব ফর্সা, যাকে বলে দুধে আলতায়। মাথায় চুল কম, তা পাগড়ি খুললে পরে বুঝেছিলাম। বেশ গায়ে গতরে মানুষ। দুধ ঘি মাখন, মাছ, মাংস খাওয়া শরীর। যাই হোক কিছুক্ষণ বাদে তার লোক চলে এল। আমি তখন আশা ছেড়ে দিয়েছি। মনে মনে গাইছি,

বল হরি, হরিবোল
মরা ইঁদুর খাটে তোল।
মা গঙ্গা তারে নে
ঘাট-কীত্তন হবে নে।

হ্যাঁ, দু ঘন্টা বাদেই ভগবানের লোক এসে আমাকে নিয়ে গেল। আমার বউয়ের দ্বিতীয় পক্ষের রিক্‌শায় তুলল আমাকে, আর নিজে সেই ভগবানের বাহন আর এক রিক্‌শায় চেপে আগে আগে চলল। বউয়ের দ্বিতীয় পক্ষর নাম মজিদ। মজিদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে একশো টাকা। মজিদ তো অবাক। আমি ভিখিরি, একশো টাকা রিক্‌শা ভাড়া দিয়ে চলেছি কোথায় কোন অজানায়? মজিদ জিজ্ঞেস করল, যাও কোথায়?

গেলেই বুঝবি। আমি ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ তুলে বললাম।

তোমার বউরে তুমি নিয়ে যেতে পারতে।

কেন তোর রস শুকিয়ে গেল?

মজিদ বলল, মেয়ে ইস্কুল যাবে, দ্যাখোদিনি কম জ্বালা, তোমার বউয়ের খাঁই অনেক, মেয়ে কম্পিটার শেকবে, তারও টাকা চাই, রিক্‌শা ভাড়া নিয়ে রোজ বাবুদের সঙ্গে গোলমাল, বলে বেশি চাই আমি, দু'টাকা হলেও কম দেবে।

ঐ বউয়ের মুখই দ্যাখব না আমি, আর নেবই না, দরকারে নোতন বে করব, আমার কপাল খুলে যাচ্ছে। বলতে বলতে দেখতে পেলাম মস্ত এক শ্বেত প্রাসাদ। শ্বেত পাথরে রোদ ঝলকাচ্ছে। রামধনুকের মতো হিজিবিজি রঙ ফেটে পড়ছে। মজিদ সেই প্রাসাদ দেখে কাঁদতে লাগল, ওরে আমার স্যাঙাতরে, তুই এখেনে থাকপি রে, আমার কী হবে রে, আমার কথা বলে দ্যাখরে।

ভগবানের লোক বলল, এই থাম, ফোট এখেন থেকে, শালা বেজন্মার বাচ্চা।

মজিদ বলল, যা বলো ক্ষতি নেই, কিন্তু আমারে একটা সুযোগ দিও কত্তা, আমি এই বাড়ি ধুয়ামুছা করতে পারব, বাগানে ফুল ফুটাতে পারব, পাখিদের দানা দিতি পারব.....।

মজিদ বলতে লাগল আমি ভিতরে ঢুকতে লাগলাম। ভগবান হুজুরের যে লোক তার প্রাসাদে আমাকে নিয়ে এল, রুমাল নাকে দিয়ে সে বলল, শ্যাম্পু কর চুলে, সাবান মাখ গায়ে, পরিস্কার জামা কাপড় পরে স্যারের সামনে আয়, কী নোংরা তুই, কাকে খুঁটে খুঁটে খায় না কেন তোকে হারামির বাচ্চা, বমি আসছে তোর গন্ধে?

আঁজ্ঞে কত্তা বিয়ের পর কদিন সাবাং মেখেছিলাম, আর সাবাং মাখিনি কোনো কালে, তবে মাঝে মধ্যি মাটি দিয়ে গা ঘষি খুব।

যা বাথরুমে ঢোক, সাবান সোডা দিয়ে গরম জলে সেদ্ধ করলেও, তোর গায়ের ময়লা যাবে না।

নোংরা না বাবু, পথের ধুলো, দ্যাখেন আমার মাথায় হাত দিয়ে, ধুলো আর পোড়া মোবিলের তেল-কালি, পথের ধারে থাকি কি না।

কথা বলিসনে, যা পরিস্কার হয়ে আয়।

উফ, এরে বলে চানঘর! আমি চান ঘরে গিয়ে নিজের গায়ের গন্ধ শুঁকতে লাগলাম। হুঁ, পচা ইঁদুরের গন্ধ লেপ্টে গেছে গায়ে। এই গন্ধ কি যাবার? গঙ্গায় ডুব দিলে হয়তো যেত। নাকি আমাদের গাঙ মাতলায়? আমি জল ঢালতে লাগলাম। সাবাং ঘষতে লাগলাম। শ্যাম্পু দিলাম মাথায়। কিন্তু গন্ধ যেন যায়ই না। বুঝতে পারলাম গা থেকে তারা বেরিয়েও নাকের কাছ থেকে সরছে না। চানঘরে মরা ইঁদুরের গন্ধ ভেসে বেড়াতে লাগল। তার মানে আমার গা থেকে তারা মুক্তি পেয়ে চানঘরে ভাসছে। জলে গুলে যাচ্ছে। বাতাসে মিশে যাচ্ছে। শেষ অবধি আমাকে বেরতে হলো। দরজায় ধাক্কা মারছিল হুজুরের চেলা। আমার চান হলো। খোলতাই হয়ে বেরিয়ে এলাম। দুটো সাবাং গায়ে ঘষে ঘষে শেষ করে দিয়েছি। শ্যাম্পুর শিশি উপুড় করে মাথায় ঢেলে চুলের জট ছাড়িয়েছি। বাইরে কাচা জামা কাপড় ছিল। পরে নিলাম। ভগবানের বাহন বাবু এসে গায়ে সেন্ট ঢেলে দিতে দিতে বলল, তোর গা দিয়ে এখনো পচা গন্ধ বেরোচ্ছে।

তাই, আমি যে টের পাচ্ছিনে, মনে হয় চানঘরের বাতাসে।

হারামি বাথরুমটা অশুদ্ধ করে দিল, গঙ্গাপানি ক'ঘড়া লাগবে কে জানে। বাবু বলল।

এক ফোঁটা দিলেই হয়ে যাবে স্যার।

বাবু বিড়বিড় করছিল, গন্ধ আমার গায়ে না লেগে যায়।

গো-চোনা আর গোবর ছড়িয়ে দেবেন কত্তা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

দূর ভিখিরির বাচ্চা, তুই যেন পায়খানা পেচ্ছাপ করে এসেছিস বাথরুমে। ভগবানের বাহন বলল, তারপর আমাকে নিয়ে চলল ভগবানের কাছে। কত ঘর পেরিয়ে, কত বারান্দা, কত জানালা পেরিয়ে আমি পৌঁছে গেলাম তাঁর কাছে। তিনি ডাকলেন, আও বেটা আও।

হুজুর! আমার মনে হলো আমি স্বপ্ন দেখছি। আমি এখানে আসতে পারব এ আমার পরম সৌভাগ্য। মরা ইঁদুরের মুখ দেখলে এই হয়।

তিনি বললেন, বেটা তুই ভগবানের আশীর্বাদ পেয়ে এখানে এসেছিস।

হুঁজুর মা-বাপ।

তোকে আমার মনে ধরেছে।

হুঁজুর মা-বাপ।

ভিক্ষে করতে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে এত লম্বা হাত হয়ে গেছে তোর, ওই হাত কত কাজ করতে পারে। তিনি বললেন।

হুজুর মা-বাপ। আমি দেখলাম না চেয়ে চেয়ে সব পেয়ে পেয়ে তাঁর হাত প্রায় টিভির রিমোট কন্ট্রোলের সাইজে খাটো হয়ে গেছে।

তোর জন্য কত কাজ পড়ে আছে। খাটো হাত নাড়িয়ে তিনি বললেন।

আহা, চোখে জল এসে গেল। মরা ইঁদুর আর জ্যান্ত দাঁড় কাককে আমি মনে মনে প্রণাম করলাম।

শ্যাম্পু সাবান মেখে চান করে এসেছিস তো?

আমি ঘাড় কাত করলাম।

তোর গা দিয়ে এখন পরম বিশুদ্ধ গোবরের গন্ধ ছাড়ছে, ছাড়ুক, গরিব মানুষের এইটা চিহ্ন। বলতে বলতে তিনি তাঁর রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রের মতো খাটো হাত আমার দিকে তাক করলেন বন্দুকের মতো। চোখে ধাঁধা লেগে গেল, রিমোট না স্যারের খাটো হাত। খাটো হাত না রিমোট? খাটো হাত নাড়িয়ে তিনি সুইচ দিলেন। মুখখানি আমার ঠান্ডা বাতাসে ভরে গেল। বাতাস না, তিনি বললেন, গঙ্গা পানি, আর গন্ধ থাকবে না।

আশ্চর্য গঙ্গা পানি, পানি কই? রিমোটে গন্ধ নাকি চলে গেল। আমি অবশ্য জানি না, তিনি বললেন, আর গন্ধ নেই। গঙ্গা পানিতে সব শুদ্ধ।

আপনার হাতে গঙ্গা পানি থাকলে তবে তা হয় হুজুর, গরিব কোনোদিন আপনাদের মতো হবে না স্যার, পায়ের তলায় থাকবে, আপনি গঙ্গা পানি দিয়ে শুদ্ধ করে নেবেন।

হবে হবে, অপেক্ষা কর বেটা।

আমি তো হতে পারব না আপনার মতো, আমি ছোটলোক হুজুর, আমার জমি নিয়েছে বাবুরা, আমার পিসিকে লুট করেছিল বাবুরা, হুজুর মা বাপ, ইস্কুলে পড়ে আমার মেয়ে, তারেও লুট করবে কেউ নেশ্চয়, আর দু-তিন বছরে ডাগর হয়ে উঠবে। আমি বললাম।

সব ভুলে যা বেটা, এবার তুইই করতে পারবি লুটতরাজ, পিটিয়ে মারতে পারবি ছোটলোক, ছোটলোকের ভি বহুত কাজ আছে বেটা।

কেমন করে হবো?

ভগবান বলল, প্রথমে ডিরেস বদল কর বেটা।

বদল তো করে এসেছি স্যার।

আবার বদল করতে হবে বেটা।

আহা, মনে কত আনন্দ হলো যে বলার নয়। আবার পোশাক বদল। আমি তো একসময় প্রায় ল্যাংটো হয়ে পড়ে ছিলাম পথের ধারে। যা পরি তা দিয়ে আব্রু ঢাকে না। মাথা ঠুকলাম হুজুরের পায়ে, বিড়বিড় করলাম, হুঁজুর মা বাপ, আপনার আদেশে ধুয়ে গেল সব পাপ।

তিনি বললেন, এখানে যে ইউনিফরম পরে সবাই।

ইস্কুলে যেমন পরে?

হ্যাঁ, তাই, বাঘছাল পিন্ধে সাধনা করবি তুই।

বাঘেরছালের মতো জামা কাপড়?

হাঁ, টাইগার স্কিন, তোকে বাঘ করে দেব বেটা।

তখন বাঘের মতো খাব, মাংস, গরু-ছাগল-মানুষ ?

আরে ছ্যা ছ্যা, ঘি মাখন, সব্জি, প্রাণী হত্যা পাপ, লেকিন তুই পাবি, কেউ জানবে না।

তাইই হলো। আমি ভিখিরির অধম। খাওয়া জোটে না। মাথার উপর ছাদ বলতে কিছু নেই। হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে পেট চালিয়েছি। আমি এটা পারি। নিরিমিষ আমিষ, যা দেবে তাই খাব। আঁস্তাকুড় ঘেঁটে খাওয়ার অভ্যেস আমার, যা দেবে তাই খাব। যদি আমিষ না দেয়, সবদিকে হাওয়া উঠেছে প্রাণী হত্যা মহাপাপ, ছোটলোকের নেই কো মাপ। তবুও ইচ্ছে হলো, পেটপুরে শেষবারের মতো চিকেন, মাটন, বিরিয়ানি মোগলাই খাই। স্যার ভগবান বললেন, হবে হবে। নিরিমিষ মানে কি শুধুই নিরিমিষ, পাবি বেটা, তাগদ করতে হবে তো। তবু আমি এসেছি যে ডেরায়, সেখানে মাছ মাংস নিষেধ। আমি ভগবান হুজুরের কথায় পরে নিলাম বাঘ ছাল। জামা পায়জামা। পরা মাত্তর জামাটা কালো হয়ে গেল। ব্ল্যাক শার্ট । স্যার বলল, রিমোটে হলো, ব্ল্যাক শারটে জোস হবে বেটা।

হচ্ছে হুজুর। আমি বললাম। সত্যিই হচ্ছিল তাই। মনে হচ্ছিল কিছু একটা করে ফেলি। ছোটলোক নিকেশ করি বাইরে গিয়ে। শুয়ারের বাচ্চা মজিদ, আমার বউ নিয়েছিস, আমি ছাড়ব না, মুসলমানে বউ নিয়েছে, বউ তার বিবি হয়েছে, এমনি কেন ছাড়ব, ধরব আর মারব।

হাউ ডু ইউ ফিল বেটা?

বহুত আচ্ছা জি, ভিতরে এমন হচ্ছে যে?

কেমন হচ্ছে?

বুঝতে পারছি না স্যার, বডি পার্টস সব ভালো হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, হাঁটুতে জোর এসেছে, রেপ মার্ডারের জোস এসেছে।

ভগবান স্যার বলল, তুমি আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে এসে গেছ, এবার তোমার ভিতরের প্রবৃত্তিগুলো জাগাতে হবে।

আচ্ছা স্যার।

কিছু ফিল করছ? স্যার হুজুর জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ, স্যার। আমি উত্তর দিলাম।

কী মনে হচ্ছে?

ইচ্ছে হচ্ছে কিছু একটা করে ফেলি, মজিদকে আমি পিটিয়ে লাশ বানিয়ে দেব।

আরে ওয়া, আর কী মনে হচ্ছে? হুজুর ঝুঁকে পড়ল আমার উপর।

রক্ত স্যার, রক্ত দর্শনের ইচ্ছে হচ্ছে। আমি বললাম গরগর করে।

ভগবান হুজুর বলল, বাহ রে বেটা, তোর প্রোগ্রেস খুব ভালো, আমাদের কাজ মানুষের ভিতরের বাঘ জাগিয়ে তোলা, হিংসা জাগিয়ে তোলা।

আমার হবে স্যার? জিজ্ঞেস করলাম হুজুরের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে।

হবে, ধ্যানে বসতে হবে, নিজের ভিতরের ভয়ানক রক্ততৃষা জাগিয়ে তুলতে হবে।

সাতদিন ধরে চলল ট্রেনিং। সামনে নিরিমিষ, গোপনে মাংস। মাংস খেয়ে না শরীর মজবুত করতে হবে। হুজুর বলল, তুমি দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত, তোমাকে সেই রকম হতে হবে, তুমি মাংস খাবে, না খেলে পারবে না মাংসাশী প্রাণী আর মানুষ মারতে।

আচ্ছা স্যার, আমার ভিতরে কেমন যেন হচ্ছে।

সাহস আসছে মনে? হুজুর জিজ্ঞেস করল।

ইয়েস স্যার। আমি বুক চিতিয়ে বললাম।

রেপ করতে পারবে?

ইয়েস স্যার, রেপ করে ছিঁড়ে ফেলব দুই পা, মেয়েছেলে দেখিয়ে দিন।

রক্ত মাখতে পারবে মানুষের?

ইয়েস স্যার।

সামনে এস। স্যার ডাকতে আমি তার কাছে গিয়ে বসি।

যা বেটা, বাঘের মতো ঝাপিয়ে পড়, মনে মনে বল খুন চাহিয়ে, খুন, মার্ডার, মার্ডার, মার্ডার.....।

আমি বুঝতে পারছিলাম এত বয়স পর্যন্ত আমার বিকাশ ছিল অসম্পূর্ণ। নখ আর শ্বদন্ত লুকিয়ে ছিল যা বেরিয়ে এসেছে। মনের ভিতরে আগুন জন্মেছে। এই দিনটার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম। ছাড়ব না। একবার আমায় পিটিয়ে মেরেছিল তা মনে আছে। মরা ইঁদুরের মতো পথে পড়েছিলাম। আমার বন আমার পাহাড়, আমার ক্ষেত আমার খামার, আমার নদী, আমার আকাশ, আমার মেঘ..... সব নিয়ে নিল, মনে আছে সব। সাজ্জন্মেও ভুলব না। ভুলিনি। মুখ চিনে রেখেছি। এই দিনের অপেক্ষায় ছিলাম। আমাকে দিয়েই আমার সর্বস্ব লুট করেছিল তারা। শোধ নিতে আমি স্যার হুজুরের উপরই ঝাঁপিয়ে পড়লাম, অনেক মাংস ওর গায়ে, অনেক রক্ত ওর শরীরে। কিন্তু সেই যে খাটো হাত রিমোট, তা নাচিয়ে সুইচ টিপে স্যার আমাকে আবার ভিখিরি করে দিল। যা বেটা, ভিখিরির জাত, আবার ভিখিরি হয়ে যা, সুযোগ দিলাম, সিনান করালাম কিন্তু কিছুই ভুলিসনি, পচা গন্ধ লুকিয়ে রেখেছিস, যা হারামি, ছোটলোকের বাচ্চা যা, ভাগ।

মজিদ মজিদ শুনছিস মজিদ? ফিরে আমি মজিদের কাছে গেলাম।

মজিদ শুনতে লাগল, আমি বলতে লাগলাম। মজিদের বিবি এল। আমার বউ এল। শুনতে লাগল। আমি বলতে লাগলাম। আমাদের মেয়ে এল, শুনতে লাগল, আমি বলতে লাগলাম। দাঁড় কাক এল। আমি বলতে লাগলাম। সে শুনতে লাগল। আরো কারা এল, শুনতে লাগল, আমি বলতে লাগলাম। গ্রাম গঞ্জ ভেঙে লোক আসতে লাগল। তারা কেউ কেউ দল পাকিয়ে মেরেছে। আবার মরেছেও। তারা তাদের কথা বলতে লাগল। আমি এবার শুনতে লাগলাম। বলতে লাগলাম। লম্বা হাত বলতে লাগল খাটো হাতের কথা।

ওসিডি ঠাকুর

চণ্ডীচরণ দাস

খামারে বসে লক্ষ্মণ বাঁশের বাতা ছিলছিল। হঠাৎ নজর পড়ল ভারতীর দিকে, পুকুরে চান করে ভিজে গামছা গায়ে জড়িয়ে বালতিতে জল নিয়ে আসছে। কিন্তু জলের বালতিটা ডান হাতের বদলে বাঁ হাতে দেখে আশ্চর্য হল। কাছে আসতে লক্ষ্য করল ডান হাতটা গামছার মধ্যে ঢোকানো, আর তার দিকে মাঝেমাঝে আড়চোখে দেখছে। সন্দেহ হল। কাটারিটা রেখে দিয়ে চুপিচুপি ঘরে গিয়ে দেখে যা ভেবেছিল তাই, জলের বালতি রেখে দিয়ে ঠাকুরঘরে গিয়ে পাথরের মত কিছু একটা ঠাকুরের সিংহাসনে রাখছে। তার সাড়া পেয়ে পিছন ফিরে দেখেই 'হাঁ' 'হাঁ' করে উঠল। "দিলে তো সব নোংরা করে? বেরোও, বেরোও আগে ঠাকুরঘর থেকে। নোংরা হাত, বাসী কাপড়ে ঢুকে পড়েছ ঠাকুরঘরে, কোনও আক্কেল জ্ঞান নেই তোমার। কাজ বাড়ালে আমার, আবার গোটা ঘরটা মুছতে হবে।"

লক্ষ্মণ দু'পা পিছিয়ে এসে বলল, "তার আগে বল, কাপড়ে লুকিয়ে ওটা কী নিয়ে এলে?"

ভারতী মৃদু হেসে বলল, "জান, পুকুরে ডুব দিতে গিয়ে পাঁকের মধ্যে কিষ্ট ঠাকুরের এই মূর্তিটা খুঁজে পেলাম গো! ঠাকুরকে কি ফেলে আসতে পারি?"

লক্ষ্মণ ভেঙচে উঠল। "ফেলে আসতে পারি। তা ফেলে আসবে কেন? পুকুরে, রাস্তাঘাটে বনেজঙ্গলে যেখানে যত পাথর, নুড়ি, ভাঙা পুতুল পাবে সব নিয়ে এসে সিংহাসনে জমা কর। বল তো আরও দু'টো সিংহাসন এনে দিই।"

"এরকম তুচ্ছতাচ্ছিল্য কোরো না, ঠাকুর পাপ দেবে।" বলে ভারতী দু'হাত কানে ঠেকাল।

"তুচ্ছতাচ্ছিল্য আবার কী? তাই তো করছ তুমি। পরশুই তো একটা ভাঙা পাথর রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে বললে ওটা শিবঠাকুর।"

"কোথায় ভাঙা পাথর? এই দেখ শিবঠাকুরের মত চোখ আর গলায় সাপের চিহ্ন।" বলে সিংহাসন থেকে একটা সিঁদুর লাগানো পাথর বের করল।

"কোথায় চোখ আর সাপ? এতো একটা পাথরের টুকরো।"

"ভাল করে দেখ। এই তো.....।"

"চুপ কর" লক্ষ্মণ ধমকে উঠল। "সবকিছুতেই তুমি ঠাকুরের চিহ্ন দেখতে পাও। যত্তো সব।"

"ওকে একটু মাথার ডাক্তার দেখা, নাহলে এসব বন্ধ হবে না।" ওদিক থেকে শাশুড়ি ফোড়ন কাটল।

"তাই করতে হবে দেখছি।" বিরক্তির সুরে বিড়বিড় করতে করতে লক্ষ্মণ চলে গেল বাকী বাতাগুলো ছিলতে।

"কাজ নেই, কম্ম নেই, একপয়সা ইনকামের মুরোদ নেই, সবসময় খালি ঠাকুর আর ঠাকুর। যেখান থেকে যা পারছে তুলে এনে ঘরে জঞ্জাল ভর্তি করছে। লোকের কাছে মুখ দেখানো দায়। কোথাকার মাথা পাগল এসে জুটেছে কে জানে!"

শাশুড়ির কথা শুনে ভারতী বেরিয়ে এসে বলল, "তুমিও তোমার ছেলের মত ঠাকুরের নামে যাই তাই বোলো না মা। তোমাদের এইসব ববহারের জন্যেই ঘরে এত বিপদ। বড়টা বাঁচল না, ওর অতবড় এক্সিডেন্ট হল, গাইটাও রোগ হয়ে হঠাৎ মরে গেল।"

শাশুড়ী চেঁচিয়ে উঠল, "চুপ কর পাগলি। বেশী বাজে কথা বলবি না। সব হয়েছে তোর জন্যে। তুই বিদেয় হলে এঘরের পাপ কাটবে।"

"হ্যাঁ আমিই তো যত নষ্টের মূলে। আমি মরলেই তো তোমাদের হাড় জুড়োয়। সে কি আর আমি জানি না?" ভারতী কাঁদতে লাগল।

"একটু চুপ করবে তোমরা?" লক্ষ্মণ ধমকে উঠতে তর্কাতর্কি থামিয়ে ভারতী ঢুকে গেল ঘরের ভিতরে, আর তার মা চলে গেল খামারে মেলা ধানগুলো উল্টে দিতে।

(২)

বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ীতে এসে প্রথমদিকে বছর খানিক ভারতীর ভালই কেটেছিল, কিন্তু তারপর বাড়তে লাগল অশান্তি। প্রথম সন্তান জন্মের পরই মারা গেল। তার উপর স্বামীর রোজগারপাতি তেমন কিছু নেই। স্বাভাবিকভাবেই ঘরের মেজ বউ হয়ে উঠল সকলের চক্ষুশূল। শ্বশুর-শাশুড়ী আর বড় জায়ের দু'চক্ষের বিষ হয়ে উঠল সে। সংসারের কাজকর্মে কথায় কথায় খুঁত ধরা, ঝগড়া করা শুরু হল। সাদাসিধে ভারতী তাদের সঙ্গে ঝগড়ায় পেরে উঠত না, স্বামীর কাছেও সান্ত্বনা ভালবাসা পেত না। ঘরের লোকেদের বউয়ের উপরে এইরকম ব্যবহারের কোনও প্রতিবাদ লক্ষ্মণ তো করতই না, ঝগড়ার সময় চুপচাপ সরে পড়ত। ভারতী স্বামীকে বললে সে উল্টে তাকেই দোষ দিত, বলত সবকিছু সহ্য করে যেতে, মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে। বাপের বাড়ীর লোকেরা এসে জামাই আর বেয়াই-বেয়ানকে অনেক বোঝাল, কিন্তু লাভ কিছুই হল না।

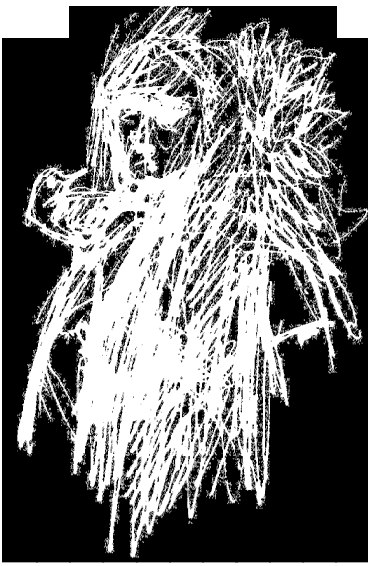

কিছুদিনের মধ্যে ভারতীর পরপর দুটি ছেলে হল। কিন্তু সাংসারিক অশান্তি বিন্দুমাত্র কমল না। এর মধ্যে একদিন গুরুদেব এসেছিলেন লক্ষ্মণদের বাড়ী। তিনি ভারতীর দুঃখ দেখে ঠাকুরের কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দিলেন, নামমন্ত্র দিয়ে বললেন— নিয়মিত ঠাকুর সেবা করবি, তাহলে মনে শান্তি পাবি, সব দুঃখ কেটে যাবে। তারপর থেকে ধীরেধীরে ভারতী কেমন যেন হয়ে গেল। হয়ে উঠল

মাত্রাতিরিক্ত ঠাকুরভক্ত, সংসারের কাজের থেকেও ঠাকুরের কাজ বেশী করে করতে লাগল। ঠাকুরঘর জল দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা, বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদতে কাঁদতে ঠাকুরের পূজা করা, সন্ধ্যে বেলা নাম, মালা জপ করা, ইত্যাদি হয়ে উঠল তার মূখ্য কাজ। আর সেই সঙ্গে হয়ে পড়ল খুঁতখুঁতে। ঠাকুরঘরে কেউ নোংরা পায়ে বা বাসী কাপড়ে ঢুকলে চেঁচিয়ে উঠত, আবার ধুয়েমুছে পরিস্কার করা শুরু করত। পূজার বাসনপত্র বারবার ধুত, একটু খুঁত মনে হলেই আবার লেগে পড়ত ধুতে। তার ঠাকুরপূজার ব্যাপারে বা কৃষ্ণঠাকুরের সম্বন্ধে ঘরের বা বাইরের কেউ কিছু বললে প্রতিবাদ করে উঠত। তারপর ঠাকুরের কাছে গিয়ে নাক-কান মলে ক্ষমা ভিক্ষা করত। সবসময় মনে ভয়— এই বুঝি কিছু ত্রুটি হয়ে গেল, ঠাকুর পাপ দেবে। মনেপ্রাণে হয়ে উঠল অত্যন্ত ঠাকুরভক্ত, সবকিছুর মধ্যেই দেখতে পেত ঠাকুরকে।

ইদানীং আবার হয়েছে আর একটি অভ্যাস। একদিন রাস্তায় একটি ভাঙা পাথরের মূর্তি কুড়িয়ে পেয়ে ঘরে নিয়ে এসেছিল। তারপর থেকে যখন-তখন এদিক-ওদিক থেকে পাথরের টুকরো কুড়িয়ে এনে বলে— দেখ এতে ঠাকুরের মুখ চোখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কখনো বা বলে— দেখ, কালই ঠাকুর আমাকে স্বপ্ন দিয়েছিলেন, আর আজই আমি এটা কুড়িয়ে পেলাম। এই করে করে ঠাকুরের সিংহাসনে পাথরখণ্ডের পাহাড় জমা হয়েছে, তাতে সিঁদুর লাগিয়ে ফুলবেলপাতা দিয়ে প্রতিদিন পূজা করে। এই নিয়ে ঘরে আরও বেড়েছে অশান্তি, লক্ষ্মণ তো কতবার হুমকি দিয়ে বলেছে— একদিন সব তুলে নিয়ে গিয়ে পুকুরে ফেলে দেব। অমনি ভারতী হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠে, ঠাকুরের কাছে মাথা ঠুকে স্বামীর জন্যে ক্ষমাভিক্ষা করে, বলে— সব অপরাধ মাফ করে দাও ঠাকুর। আর শাশুড়ী তো 'পাগল' 'ছাগল' করে মুখে যা আসে তাই বলে গালাগালি দেয়।

(৩)

একদিন বড়ভাই রাম লক্ষ্মণকে ডেকে ধমকে উঠল, "তোর বউয়ের জন্যে তো পাড়ায় গ্রামে মুখ দেখানো যাচ্ছে না। হয় ওর চিকিৎসা করা, নয়তো এঘর ছেড়ে অন্য ব্যবস্থা কর।"

"সবই তো বুঝি দাদা, কিন্তু কোথায় কাকে দেখাব? আমি তো কাউকেই চিনি না।"

রামের বাজারে ওষুধের দোকান। সে খোঁজখবর করে বলল সদরে একজন সাইকিয়াট্রিষ্টের কথা। সেইমত একদিন মেয়েদের ডাক্তার দেখানোর নাম করে লক্ষ্মণ ভারতীকে নিয়ে গেল তার কাছে।

ডাক্তার ম্যাডাম লক্ষ্মণের কাছ থেকে সব শুনলেন। তারপর ভারতীর সঙ্গে আলাদা করে অনেকক্ষণ কথা বললেন। কয়েকটা টেষ্টও নিলেন। শেষে লক্ষ্মণকে বললেন— ও অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডারে ভুগছে, সংক্ষেপে ওসিডি— যেটা এসেছে অত্যধিক অ্যাংজাইটি আর ডিপ্রেশান থেকে। তবে চিন্তার কিছু নেই, সামান্য কিছু ওষুধ খেলে, আর কিছু থেরাপি ও কাউন্সেলিং করালে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তবে সবথেকে বড় হল ঘরের লোকের, বিশেষ করে

স্বামীর ভালবাসা ও যত্ন— যেটার ওর খুবই অভাব, আর সেটাই ওর সমস্যার মূল কারণ। যদি এই পরিস্থিতি চলতে থাকে, তাহলে কিন্তু ওর মানসিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যেতে পারে।

এরপর চলল ভারতীর চিকিৎসা আর কাউন্সেলিং। প্রথমদিন ডাক্তারের কাছে যেতে আপত্তি করলেও তারপর থেকে সে ম্যাডামের কাছে যাওয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকত, তাড়াতাড়ি পরের সেশানের তারিখ চাইত। বলত— তার সঙ্গে কথা বলতে তার খুব ভাল লাগে, মনে শান্তি পায়।

(৪)

বছর পনের পরের কথা। ইতিমধ্যে গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেছে। ভারতীর বড় ছেলে জলপাইগুড়িতে ফার্মাসি পড়ছে, আর ছোট ছেলে কলেজে। একটা মেয়েও হয়েছে ভারতীর, এখন বেশ বড় হয়ে গেছে কৃষ্ণা, এবছর মাধ্যমিক দেবে। বাবা ভিন্ন করে দেওয়ার পর লক্ষ্মণ পাড়ার নতুন রাস্তাটার ধারে একটা চা-তেলেভাজার দোকান দিয়েছিল, রমরমিয়ে চলছে দোকানটা। তার আয়ে, আর সামান্য যেটুকু জমি ভাগে পেয়েছে তার ধানে মোটামুটিভাবে তাদের সংসার চলে যায়।

কৃষ্ণার জেদে এবার ঘরেই হচ্ছে সরস্বতী পূজা। আগের দিন সন্ধ্যায় ছোটদার সঙ্গে গিয়ে বাজার থেকে একটা ছোট ঠাকুর কিনে এনেছে। আর ভোর হতে না হতেই লেগে পড়েছে ঠাকুরঘর পরিস্কার করে ঠাকুর সাজাতে। ঠাকুরের সিংহাসনটা সরাতে গিয়ে হঠাৎ ভিতরে রাখা মূর্তি আর ছবিগুলো উল্টে পড়ে গেল। ভারতী দুয়ারে ন্যাতা দিচ্ছিল। আওয়াজ শুনে কাছে এসে কাণ্ড দেখে 'হাঁ' 'হাঁ' করে উঠল— বললাম আমি করে দেব, তবু তুই জোর করে লেগে পড়লি। ছাড়, আমি এখুনি চান করে এসে সব গুছিয়ে রাখব।

কৃষ্ণা মায়ের কথায় কান না দিয়ে সিংহাসনের ঠাকুর আর ছবিগুলো গুছিয়ে রাখতে লাগল। হঠাৎ পিছনে এক কোণে একটা পাথরের টুকরো দেখে আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল, "এটা কী মা? এখানে কোত্থেকে এল?"

লক্ষ্মণ দুয়ারে চালের বস্তাটা সরাচ্ছিল। দেখে মুচকি হেসে বলে উঠল, "ওটা হল ওসিডি ঠাকুর। সাংঘাতিক রাগী, ফেলিস না যেন, তাহলে তোরও ঘাড় মটকাবে।"

ভারতী রেগে গিয়ে বলে উঠল, "দাঁড়াও, তোমার মস্করা করা বের করছি।" বলে গোবরজলের বালতিটা তুলে নিয়ে ছুটল তার গায়ে ঢালবে বলে।

স্ত্রীকে রণং দেহী মূর্তীতে ধেয়ে আসতে দেখে লক্ষ্মণবাবু চালের বস্তা ফেলে 'য পলায়তি স জীবতি' এই আপ্তবাক্য স্মরণ করে বাইরে পলায়ন করলেন।

সিঁদুর লাগানো পাথরটা হাতে নিয়ে কৃষ্ণা হাঁ করে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল। অনেক ঠাকুর দেবতার নাম শুনেছে, কিন্তু এই ওসিডি ঠাকুরের নাম বাপের জন্মে শোনেনি। আর সেই ঠাকুরের নাম শুনে মা-ই বা কেন বাবার দিকে অমন করে গোবর জলের বালতি নিয়ে তেড়ে গেল সেটাও তার মাথায় ঢুকল না।

বৃষ্টিলেখা

সুকমল বসু

অনেক দিন পর আজ বৃষ্টি এলো, একলা ঘরে বসে বৃষ্টি দেখতে খুবই ভাললাগে বৃষ্টিলেখার। শরীরটা ওর তেমন নেই। একটু জ্বর জ্বর লাগছিল, দুদিন অফিস ছুটি নিয়েছে সে। তারপর ট্রেন জার্নি, বাস জার্নি করে আসতে হয় দূর্গাপুর থেকে মেদিনীপুর টাউনে। পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাংকে কাজ করে সে। চাপ এত বেশী যে মাথাগুলিয়ে যায়। এই সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে বৃষ্টির ভেতরে অনেক আলো দেখতে পাচ্ছে। সামনের বারান্দার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে এই জল কত হৃদয়ের কথা বলতে পারে। রাস্তার টিউব লাইটের আলো এসে পড়ে বারান্দার ডিকসেন চেঞ্জ করে দিয়েছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই আলমারির ভিতর ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠল বঙ্কিম রচনাবলী। ক্লাস এইটে সে যখন পড়ে তখন থেকেই এই বইটির সঙ্গে তার একটা আত্মিকতা আছে। তার অনেক উপন্যাসের মধ্যে সে একটা জায়গায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে। সেটা হল কপাল কুন্ডলা। সমুদ্র, বালিয়াড়ী, কাপালিক, নবকুমার, বিচ শ্রেণী তার মাঝখানে থেকে কপালকুন্ডলাকে বের করে আনে, আবার সে হারিয়ে যায় অনেক প্রশ্নের অন্ধকারে। এই রকম একটা কিছু ভাবতে ভাবতে তার মনে হল বইটা বের করে পড়া যাক। আগের অনুভূতির সঙ্গে বর্তমানের অনুভূতি মেলে কী না।

বৃষ্টিলেখা তখন কলেজের ছাত্রী। ওর এক বন্ধু ছিল তার নাম তন্ময়, ও প্রায়ই ওদের বাড়িতে আসতো। একদিন তন্ময় ওকে বলল তুমি দিনকে দিন কপাল কুন্ডলা হয়ে যাচ্ছো কেন? খুব নিমিলীতভাবে বৃষ্টি বলেছিল কেন তুমি কি এমন দেখলে যে আমাকে ওর সাথে তুলনা করছো। না ঠিক তা নয়, কিন্তু কোথায় একটা যেন রূপাতিতের মধ্যে তার স্পর্শের ছোঁয়া পাই। বৃষ্টি এবার উদাস গলায় বলে উঠল আমি যদি তা হতে পারতাম তা হলে তো হারিয়ে যেতাম। তন্ময় অবাকভাবে তার দিকে তাকায়। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলে কোথায় হারাতে কাপালিকের ডেরায়।

ডেরা বলছ কেন? মন্দির কখনো ডেরা হয়? না তা হয় না। কিন্তু আমার কী মনে হয় জানো বঙ্কিমচন্দ্র কেন যে এই রকম একটা লেখা লিখলেন এর বিস্ময় এত রহস্যময় এত পরাবাস্তবতা যা ভাবাই যায় না।

বৃষ্টি একটা মায়াময় হাসি হেসে বলল আমি তো এই কথাগুলো ভেবেই প্রশ্নের জালে জড়িয়ে পড়ি আর বের হতে পারি না। যাক ছাড়ো এখন তো ক্লাস নেই। সেই ২টা ৩০শে ক্লাস। চল ক্যানটিনে যাই একটু চা খাব সাথে বিস্কুট। ওরা দুজন ক্যান্‌টিনের দিকে এগিয়ে গেল। দুজনে চা বিস্কুট খেল। কিন্তু আর কথা হয়নি। তন্ময় বি.এ. অনার্স পাশ করে এখন বর্ধমানের একটা স্কুলের শিক্ষক। রিসেন্ট বিয়ে করেছে। ফোনে কথা হয়।

এইসব স্মৃতি ভারাক্রান্ত করে বৃষ্টিকে। মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। কোথায় একটা না পাওয়ার বেদনা তাকে ঘিরে ধরে।

সে আলমারির ভেতর থেকে রচনাবলী বের করে। মা এসে বলেন, এখন

শরীরটা ভাল লাগছে তোর?

-হ্যাঁ অনেকটাই ভাল। কাল আবার অফিস যেতে হবে, কী করে যাবো আমি বুঝে উঠতে পারছিনা।

মা চলে গেলে, বৃষ্টি টেবিলের কাছে গিয়ে জল নিয়ে চোখে মুখে দেয়। তারপর মুখটা মুছে এক গ্লাস জল খায়। বিছানায় শুয়ে আবার সেই উপন্যাস তাকে তাড়া করে। তার হঠাৎ মনে হয় কল্পনা কী কল্পনাই থাকে, বাস্তবের মাটি তাকে স্পর্শ করতে পারে না। এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে সে। ঘুমের মধ্যে সে একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখে। অনেক প্রদীপের আলো জ্বালা আছে একটা মন্দিরে সেখানে খড়্গ হাতে দাঁড়িয়ে আছে কাপালিক। একটা সুন্দরী মেয়েকে বেঁধে এনেছে কেউ। সে পালাতে পারছে না। এলোমেলো হাওয়ায় প্রদীপগুলো কাঁপছে। বৃষ্টি এসে নিভিয়ে দিল সব। এবার অন্ধকারের ভেতর একটা আলো জ্বলে উঠল। কালী মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। ক্রমশ নিথর নিশ্চল, নিশ্চুপ.....

বৃষ্টি উঠে পড়ল।

-কী হল!

-না খুব তেষ্টা পেয়েছে।

-দুঃস্বপ্ন দেখলে এমন হয়। শরীরটাও অস্থির করে ওঠে। কিন্তু মেয়েটার কী হল, কাপালিক কী তাকে.....

না আর কিছুই ভাবতে পারে না। জানালা খুলে সে শুধু অন্ধকার দেখছিল, আবার স্বপ্নটা তার মাথায় ঘুরপাক দিচ্ছিল। বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তার মনে হলে এক কাপালিক খড়্গ হতে সমস্ত পৃথিবীটাকেই দাপিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে.....

কবিসম্মান

দেবাশিস দণ্ড

জগন্নাথ কবিতা লেখার ব্যাপারে ঘরে বাইরে দুদিকেই দলছুট। পিতৃকুলে সবাই উকিল মোক্তার। দলিল লেখকও আছে। কবি নেই। মাতৃকুলে সবকটাই চাষী। ধান সর্ষে মূলো ছাড়া কেউ কিছু বোঝেনা। যার একুল ওকুল দুকুল ফাঁকা, তার আর কী থাকে? হাতে গোনা যে দু চারজন বন্ধু আছে, তাদের কেউ মাল টানে, কেউ মালগাড়ি টানে। কবিতার ধারে পাশে কেউ নেই।

তবু কবিতাপ্রাণ জগন্নাথ চাকলাদার চল্লিশ বছর ধরে কবিতা ভেবে যাচ্ছে, কবিতা লিখে যাচ্ছে। দিস্তা জমে জমে বস্তার পর বস্তা হয়ে যাচ্ছে।

যখন তখন জগন্নাথকে কবিতায় পায়। মনের ভেতর কত রকম অনুভূতি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। তখনই সংকেতে ধরে রাখতে হয়। তা না হলে ভুস ভুস

করে মিলিয়ে যায়।

সেদিন একজোড়া ফুলকপি কিনতে কিনতে কী যেন একটা মনের ভিতর গুড়গুড় করে উঠল। কপিওয়ালাকে বলল- ভাই একটা পেন্সিল হবে?

কপিওয়ালা আকাশ থেকে পড়ল- পেন্সিল দিয়ে কী হবে দাদা?

-কবিতা এসে গেছে রে। এক্ষুণি ধরে না রাখলে পিছলে পালাবে।

-কপি নেবেন না?

-কপি পরে হবে, আগে কবিতা। একটা পেন্সিল হবে?

কপিওয়ালা পেন্সিল দিতে পারল না। জগন্নাথও কপি নিল না। শেষ পর্যন্ত ফর্দর পেছনে কবিতার সংকেত ধরে রাখতে পেরেছিল কিনা এত বছর পরে জগন্নাথের আর মনে নেই। হামেশাই তো হয় এসব।

পৃথিবীতে জবরদস্ত থেকে জোলো— সব ধরনের কবিদের জন্য পত্রিকা আছে। বাংলা ভাষায় তো আছেই। তাই জগন্নাথের প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা নেহাত কম নয়। তবে এখনো এক বস্তা কবিতা পড়ে আছে, যেগুলো অপ্রকাশিত।

জগন্নাথ উকিল মোক্তার হতে পারতো। হয়নি। কবি হয়ে গেল। দলছুট হলেই মুশকিল। শিক্ষক অধ্যাপকদের সঙ্গে কবিতা লেখার ব্যাপারটা যতটা মানিয়ে যায়, উকিল পুলিশের সঙ্গে যায় না। তাই উকিল পরিবারে জগন্নাথ চাকলাদার নামে যে একজন বিশুদ্ধ কবি থাকতে পারে, বিশ্বাস করল না কেউ। কোনও পত্রিকা তাকে উপদেষ্টা হিসেবে ভাবতে পারল না।

পাশের বাড়ির নিবারণ লাহিড়ীর নাতি লাটুর বড় কৌতুহল কবিতার বস্তাটা নিয়ে। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে- ও জগাদাদু বস্তাটার ভিতরে কেমন কবিতা আছে একবারটি দেখাও না।

বহুবারই আবদারটা করেছে।

শেষে একদিন নাছোড়বান্দা লাটুর কথামতো বস্তার মুখটা খুলতেই হল। খুলেই চোখ কপালে উঠল জগন্নাথের। ফাঁস আলগা হতেই বেরিয়ে এলো জমাট মাটির ছোট বড় ঢ্যালা। অজস্র উইপোকা বিজয় মিছিল করছে বস্তার ভিতরে। শত শত কবিতার পান্ডুলিপির একটিও অবশিষ্ট নেই। মাথায় হাত দিয়ে খাটে বসে পড়ল জগন্নাথ। বিড়বিড় করে বলে উঠল- আমার সব কবিতা মাটি হয়ে গেল।

হি হি করে হেসে উঠল লাটু। বলল- মাটি নয় জগাদাদু, মাটি নয়। পটি। তোমার কবিতা খেয়ে পোকাগুলো পটি করে দিয়েছে।

লাটুর কথাটা আজও কানের সামনে বাজে। না বুঝেই কত বড় সত্যি কথাটা বলে দিল ছেলেটা।

জগন্নাথকে কেউ কোনো মঞ্চে ডাকে না। হাতে ফুলের স্তবক তুলে দেয় না। চল্লিশ বছর ধরে কবিতা লেখার পরে এখনও সে শুধুই জগাদা। অথচ কবিতার জন্য জগন্নাথ দারিদ্র মাথা পেতে নিয়েছে। পাতা মাথার উপর দিয়ে কত ঝড় ঝাপটা বয়ে গেছে সেইই জানে। আত্মকথায় এসব টুকে রাখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু যাকে কবি বলে কেউ সমীহই করে না, তার আত্মকথা পড়বে কে?

ইদানিং কথায় কথায় কবিদের সংবর্ধনা দেওয়ার হিড়িক পড়েছে। কবিরা ক্যানিং থেকে কোচবিহার ছুটে বেড়াচ্ছেন। সবই সমাজমাধ্যমের স্ক্রিনে ভেসে

উঠছে। কবির গলায় উত্তরীয়। হাতে সোনার বরণ স্মারক। ঠোঁটের ফাঁকে চিলতে হাসি। কই, জগন্নাথকে তো অদ্যাবধি কেউ ডাকল না?

একটা মনখারাপ ছেয়ে থাকে সর্বক্ষণ। বড় ইচ্ছে জাগে। গোপন নিচ্ছে। মুখ ফুটে বলা যায় না। এতদিন ধরে কবিতায় জড়িয়ে থাকা একটা মানুষের কিছুই কি পাওনা হয় না?

একবার একটা বই করেছিল জগন্নাথ। প্রেসের ধার চুকোতে বেশ কয়েক মাস সময় লেগে গিয়েছিল। ভেবেছিল বই বিক্রি করে টাকা মেটাতে অসুবিধে হবে না। সে আর হল কোথায়? বইগুলো লুকিয়ে লুকিয়ে রাখতে হয়। রুবির চোখে পড়লেই মেজাজ তিরিক্ষে। কবিতার বাপ-বাপান্ত করে ছাড়ে।

-উঁ, যে ছাইপাঁশ লিখে দুটো পয়সার সুরাহা হয় না, তার জন্য ধারদেনা করে টাকার শ্রাদ্ধ করা হয়েছে! যত্তসব আবর্জনা।

ওর খোঁটা খাওয়ার চেয়ে লুকিয়ে রাখা ভালো।

এই মনখারাপের অধ্যায়ের মধ্যেই হোয়াটস অ্যাপ মারফৎ এল সেই শুভসংবাদ। একটি আমন্ত্রণ এল সুদূর মালদা থেকে। দু এক কথায় আমন্ত্রণ। কবিতাচর্চার একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ মালদার একটি মঞ্চ থেকে তাকে সংবর্ধনা জানাতে চায়। বড় অবিশ্বাস্য লাগছিল লাইন কটি। যা তার নিজের পাড়া ভাবেনি, নিজের শহর ভাবেনি, তাই ভাবল মালদা।

সত্যিই কি ভাবল? ইয়ার্কি নয় তো? একবার এরকম একটা সস্তা ইয়ার্কির ফাঁদে পড়ে বড্ড ঘোল খেয়েছিল। সেজেগুজে গিয়ে দেখে কোথাও কিচ্ছু নেই।

পত্রপাঠ ফোন করে নিশ্চিত হল। ফোনের ওপারে থাকা জনৈক দীপনবাবু অত্যন্ত বিনীতভাবেই জানালেন, এই গ্রুপটি কবি জগন্নাথ চাকলাদারের কবিতায় মুগ্ধ হয়েই সম্মান জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জগন্নাথের ইচ্ছেপূরণের দিন যত ঘনিয়ে এল, ততই দুশ্চিন্তার ভাঁজ জমলো কপালে। অমনি তো আর যাওয়া যায় না। খরচ আছে। টাকাপয়সার জোর আর কোথায়? যাওয়ার টিকিট যদিওবা কোনমতে কাটা যায়, ফেরার কী হবে? জগন্নাথকে যারা মাথায় করে রেখেছে, তাদের কি এই অনটনের কথা বলা যায়? যদি ওরা পিছিয়ে যায়?

আচ্ছা এমনও তো হতে পারে ওরাই ফেরার ব্যবস্থা করে দিল? যাওয়াটা তো হোক আগে। সুযোগটা হাতছাড়া করার মানে হয় না।

দীপন সামন্ত স্বয়ং গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন স্টেশনে। দিলখোলা মানুষ। কথায় কথায় হাসতে পারেন। গাড়িতে বসে জগন্নাথের অন্তত ১০-১২টি কবিতার নাম গড়গড় করে বলে দিলেন। তার সঙ্গে মুগ্ধ বিশ্লেষণ। জগন্নাথ বিস্মিত হয়। সংকোচে গুটিয়ে যায়। ভদ্রলোক মাঝে মাঝেই বলছিলেন, আপনার সঠিক মূল্যায়ন হল না স্যার। আমাদের অনেক সৌভাগ্য আপনাকে পেয়েছি।

মাঝারি মাপের হলঘর। আয়োজনের ত্রুটি নেই। ব্যাকস্ক্রিনে জগন্নাথের মুখ ভাসছে। দীপনবাবু ছাড়াও আরো দুজন বক্তা জগন্নাথের কবিতার পঙক্তি ধরে ধরে আলোচনা করলেন। জগন্নাথের কবিতা পাঠ করল নতুন ছেলে মেয়ের দল। বড় দরদী উচ্চারণ। কবি বোধহয় কবিতার অর্ধেকটা লেখেন। বাকী অর্ধেক লুকিয়ে থাকে সুললিত উচ্চারণে। জগন্নাথ চোখের জল ধরে রাখতে পারল না। চোখের জল এত মিষ্টি হয়?

কত কথা উঠল জগন্নাথকে নিয়ে। রুবি শুনতে পেল না। তার পাড়া-শহরের লোক, যাদের কাছে শুধুই জগাদা, তারাও শুনল না। ওরা কেউ দেখতে পেল না কতখানি শ্রদ্ধা আর মুগ্ধতায় জড়ানো এই সম্মানফলক। কতখানি আদর উষ্ণতায় জড়ানো এই উত্তরীয়।

জগন্নাথ যা যা চেয়েছিল গোপন মনে, সব পেল। অনুরাগীরা হাসিমুখে পাশে এসে দাঁড়াল। ফ্রেমে বাঁধল। উচ্ছ্বসিত কথায় চুরমার করল এতদিনের সুপ্ত অভিমান।

এবার ফেরার পালা। ফিরতি ট্রেনে কবি জগন্নাথ। বিনি টিকিটের সওয়ার। অসংরক্ষিত কামরা। গাদাগাদি করে যাচ্ছে একদল দেহাতি মানুষ। রুক্ষ কথায় সরগরম আশপাশ। ওরা জগন্নাথের মতো কথা আঁকতে পারে না। কেজো কথায় অত সাজসজ্জা থাকে না।

কাঁধের ব্যাগে স্মারক উত্তরীয়। নিস্তেজ ফুলের স্তবক। আরেকটু বেঁচে থাক তোরা। রুবি দেখুক। বুঝুক, ঘরের মানুষটাকে।

জগন্নাথ ব্যাগটা আঁকড়ে কোনোমতে দাঁড়িয়ে রইল। গতকালের সেই স্বপ্নবৎ আনন্দটুকু একটু একটু করে ফিকে হয়ে যাচ্ছে। আনন্দের জায়গায় গেড়ে বসছে আতঙ্ক। আতঙ্কর ছায়াটা বড় হচ্ছে। দেহাত কোলাহলের ভিতর ভয়ংকরভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে একটা মুখ। বিনা টিকিটে এতটা পথ উজানো কি চাট্টিখানি কথা? টিকিট পরীক্ষক হঠাৎ এসে পড়লে কী বলবে? মনে মনে অকারণে কত কথাই সাজিয়েছে। আজ সাজাতে পারছে না কেন? কী বলবে জগন্নাথ?

বেশ কিছুটা ছোটার পর ট্রেনটা থামছে। নতুন মুখ। নতুন কোলাহল। এদের মধ্যে সেই টিকিট পরীক্ষক লোকটা ঘাপটি মেরে নেই তো? এখনও তো সাজিয়ে নিতে পারেনি কথাগুলো।

দুশ্চিন্তা আর আতঙ্কে খিদে মরে ভূত। ভালোই হয়েছে। হতদরিদ্ররা মনে হয় এভাবেই মরা পেটে বেঁচে থাকে।

ব্যান্ডেলে ঢুকছে ট্রেনটা। মনের অস্থিরতাও থিতিয়ে এসেছে। রাতজাগা চোখে ঘুমের আনাগোনা। বুকে ব্যাগ আঁকড়ে হাঁটুতে মাথা দিয়ে ঘুমিয়েই পড়েছিল বোধহয়। হঠাৎ কাঁধে টোকা- টিকিটটা দেখাবেন।

জগন্নাথ ঝিম ধরা চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। কী বলবে? কোনো কথাই তো সাজানো হয়নি। নিচু স্বরে বলল- টিকিট নেই।

রেলকর্মীটি ভারী গলায় বললেন- নেই তো করে নিন।

-আমার কাছে পয়সা নেই।

-লজ্জা করে না এসব বলতে? দেখে তো মনে হয় শিক্ষিত লোক। কী শিক্ষা পেয়েছেন মশাই, উইদাউট টিকিটে ট্রেনে উঠে পড়েছেন?

পেছন থেকে কেউ একজন বলে উঠল- ঘাড় ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিন না মশাই। চ্যাংড়ামি বেরিয়ে যাবে।

ট্রেনটা চলতে শুরু করে দিয়েছে।

টিকিট পরীক্ষক বললেন- টিকিট করবেন না হাজতে যাবেন?

হাজত? কয়েক ঘন্টা আগের দৃশ্যগুলো আর মেলাতে পারে না জগন্নাথ। পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা সেই অনুরাগীরা কোথায়? কোথায় আপনারা, যাঁরা আমার কবিতার পঙক্তি সাজিয়ে মুগ্ধ বিশ্লেষণ করেছেন? কোথায় আপনারা, যাঁরা আমার হাতে তুলে দিয়েছেন সম্মানফলক?

টিকিট পরীক্ষক আর দাঁড়ালেন না। চলে গেলেন। জগন্নাথ ঠায় বসে রইল দুই পায়ে মুখ গুঁজে। এই মুখ কি দেখানোর মুখ?

অবশেষে হাওড়ায় নামল জগন্নাথ। সাবওয়ে পেরিয়ে একটি ডাস্টবিনের সামনে এসে দাঁড়াল। ব্যাগ থেকে বের করল উত্তরীয় জড়ানো সম্মানফলকটি। পচা আবর্জনার মতো বড় শীতল। নিষ্প্রাণ। ফেলে দিল ডাস্টবিনে। তারপর ক্লান্তি আর লজ্জা জড়ানো শরীরটা টানতে টানতে হাঁটা দিল সালকিয়ার দিকে।

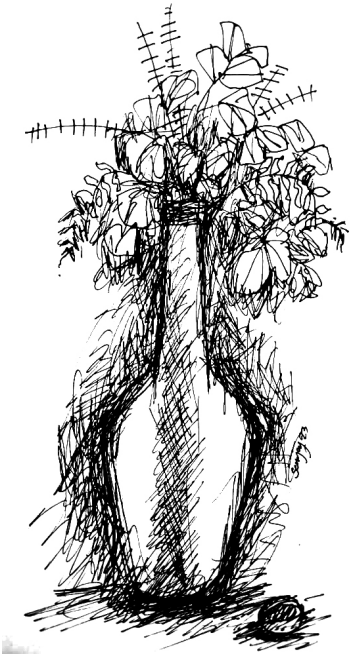

অনুগল্প ও অন্যান্য

পুরনো জিনিস বিক্রি

দেবাশিস দে

রাস্তার ধারে টালির ছাউনি। ছোটো ঘর। মাথায় বহু পুরনো ছোটো কালো জংধরা বোর্ড। কী লেখা ছিল পড়া যাচ্ছে না। তার উপরে সবুজ রঙ দিয়ে কাঁচা হাতে লেখা পুরনো জিনিস বিক্রি হয় -

আধ ভেজানো দরজা ঠেলে মানুষটা ঢুকে গেল ভিতরে। পকেট থেকে মোবাইল বার করল। হাতের বেতের বাস্কেটটা ঝরঝরে টুলটার ওপর রেখে বলল – সাত মাসের পুরনো এটা, বিক্রি হবে? কত পাব?

দোকান মালিক রাম কি একটা ওজন করছিল। ওজন করা বন্ধ রেখে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। কর্মচারীটির চোখের পলক পড়ছে না। বোবা হয়ে গেছে। রাম ভাবে-লোকটার মাথা খারাপ, না কোনো দুরভিসন্ধি আছে? মুখে বলে– আপনি কি পাগল? মজা করছেন? দাঁড়ান দেখাচ্ছি মজা। ফোনের কন্ট্যাক্ট লিস্ট খুঁজে কাকে যেন ফোন করল।

মানুষটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কোনোরকমে দরজা থেকে বাইরে বেরোতেই পিছনে থেকে রাম আর তার কর্মচারী জাপটে ধরে ফেলে। জুটে যায় পাড়ার কয়েকটা ছেলে। ধরে নিয়ে পাড়ার ক্লাব ঘরে ঢুকিয়ে একের পর এক কিল,ঘুসি, চড়।

- দেখে তো মনে হচ্ছে-ভদ্র ঘরের, বিবেক বলে কিছু নেই? কার বাচ্চা চুরি করে বিক্রি করতে এসেছিস- তোকে পুলিশে দেব। চার দিক থেকে বিভিন্ন বাক্যবাণ ছুটে আসতে থাকে।

মানুষটা পাড়ার দাদাদের পা জড়িয়ে ধরে বলে-বিশ্বাস করুন–এটা আমারই বাচ্চা। আমি মজা করছিলাম। একটা ভিডিও রিল বানিয়ে ফেসবুকে ছাড়ব ভেবেছিলাম।

মিতাক্ষর নাবাল

লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল

সাপটা হঠাৎই ডান দিক থেকে বাম দিকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো, যে পথটা চলে গ্যাছে নিবু নিবু নদীর দিকে তারই দুপাশেই থেমে গেছে শুকনো পাতার শব্দ, এপাশে লিজ নেওয়া ঝিলের থেকে আসছে মহুয়া পচার গন্ধ, ওপাশে পরজীবী স্বর্ণলতা ফ্যাকাশে হতে হতে দুলছে গ্রামীণ পটচালায়; ইতিহাসে অন্তরীণ হয়ে থাকা অনিন্দ্য হেসে ওঠে বারবার

আলোর শব্দরা নিশ্চুপ আমার কাছেও– বাকিরা তারও বেশি মেঘজটা বিস্তারে অস্থির; খোপ খোপ বেড়ার শব্দ ভাসে আকাশের পর আকাশ

এখন কাশবনে নিকষিত হেম, ভয় জড়িত মিতাক্ষর নাবাল নিয়ে পবনের অক্ষাংশ শূন্য হয়ে যায়।

রাতের আতঙ্ক

দীপ্তরূপা মল্লিক দাশগুপ্ত

একবার টিউশন থেকে ফেরার সময় আমার গাড়ির ড্রাইভার হঠাৎ বলে, "ম্যাডাম ওই দিকটায় তাকাবেন না"। আমি কিছুটা অবাক হলে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই সে নিজেই বলে ওঠে, "আমি আপনার জন্য গাড়িতে অপেক্ষা করছিলাম, আজ ওই ঝোপের দিকটায় দেখি

সাদা কাপড় পরে বেশ লম্বা একজন কেউ যেন আমার দিকে এগিয়ে আসছে, তাকে দেখেই আমার ভূত মনে হয়েছে, আপনি দয়া করে ওই দিকটায় তাকাবেন না, আমি তাড়াতাড়ি গাড়ি চালিয়ে আপনাকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।" যদিও আমি কিছু বলিনি বা কিছু দেখতে পাইনি, সত্যি বলতে সেদিকে আর ভয়ে তাকাইনি কিন্তু সেদিনের কথা মনে পড়লে এখনো কিরকম যেন শিউরে উঠি।

বাবা

বেবী সাউ

বিকেলে আমাদের কোন খেলার মাঠ ছিল না। ছিল না একছুটে ছুঁতে যাওয়া দিগন্তের রামধনু। এই মাঠের নেশা, এই নীলের পেছনে ছোটা....এগুলোর অভাব বোধ হয় নি একটি হাতের জন্য। সঠিকভাবে বলতে গেলে, হাত নয়.....একটি আঙুলের জন্য। তর্জনী। আর ওটার মালিক আমার বাবা। ওই আঙুলে রাখা প্রজাপতি হওয়ার ইচ্ছে। কখনও বা তুলতুলে পরী। আর এই নির্মম পৃথিবী, আমার বিষাদমণ্ডিত পৃথিবী আদরে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

আমার বাবা, ঠিক আমার বাবার মতোই। সবাইকে "তুমি" বলা বাবা। কাউকে "না" বলা বাবা। আর লক্ষ্মীপ্রিয়া, বেলাদের চোখে, আমার উত্তমকুমার বাবা। অঙ্কে স্কলারশিপ বাবা, জীবন অঙ্কে ভুল করতে করতে সারাটা জীবন কেটে গেল।

স্কুলের প্রতিটি রেজাল্টের পর ধরিয়ে দিতেন একটা এক নীল রঙের ডাইরি। আমিও এক একটা ডাইরি জমাই, আর টপকে টপকে পার হয়ে যাই এক একটা সিঁড়িভাঙা অঙ্ক। নতুন পৃথিবী, নতুন বন্ধু আর অনেক অনেক নতুন পেতে পেতে অনুভব করি তোর হাতের।

তোর হাতের লোভে ছুটতে থাকি। কাঁদতে থাকি। তারপর একদিন যখন অনুভব করি, সে হাত ঠিক আমার হাত ধরার জন্যে নয়, সমস্ত কথা ভারী ভারী হয়ে ওঠে বুকে। আমি একা হাঁটতে থাকি। আমি একা একা দেখি ডিমনার লেক,

জামশেদপুরের বৃষ্টি আর হঠাৎই মোবাইলে রিংটোন বাজে, শুরু হয় পাখি জন্ম আমার। দূর থেকে বাবার কথা ভাসে, "মা-রে, আজ এখানে খুব বৃষ্টি। আজ ধানের ক্ষেতে কিছু টিয়া এসে বসেছিল। আজ.....আজ...।"

সবটুকু বর্তমান ফিরে আসে। আমি লুটোপুটি হয়ে বলি কলেজের কথা, বান্ধবীর কথা–অসংখ্য মনখারাপের কথা। তোরও। ফোনের ওপাশ থেকে বাবা হাত বুলিয়ে দেন। একথাগুলো তখন সুর হয়ে ছোটে জুবিলি পার্কের দিকে। সাকচির ব্যস্ততায়। সবটুকু অতীত ভুলে আমি মা হয়ে উঠি। বাবা তখন একমাত্র সন্তান আমার।

আবার হাঁটতে শিখি। পা মেলাই। পৃথিবীর বুকে রেখে দিই সংসারবাসনা....

মৃত মানুষদের মাধ্যাকর্ষণ ও সুরিয়েলিস্টিক ঘোড়া

নিমাই জানা

মৃত মানুষকে নীল নীল মাধ্যাকর্ষণ সুতোয় ঝুলিয়ে রেখে আঙ্গুরের মতো সুরু জনন ছিদ্রওয়ালা ককটেল আর ফিনাইল গন্ধ ওড়া শয়তানের ভায়োলিনে ডোবানো রজনীগন্ধা ফুলের স্তবক থেকে মৃত প্রজন্মদের মুখে ঢেলে দেই দেশীয় নিকোটিনের স্যাক্সোফোন,

ঈশ্বরীয় শরীর দীর্ঘ সমুদ্রের নিচে গলে যাচ্ছে তাদের এ প্রজন্মের ফেডেড বিদেহী পাঁজর, নর্তক নাচছে অতিপ্রাকৃত ভূগোলবিদ সেজে, তাপমাত্রায় পুড়ে যাচ্ছে জিংকের মতো ফসফরিক নাভি, ঘোড়ারা জিভ দিয়ে চেটে চেটে রঙিন কাঁচের গুঁড়ো খাচ্ছে, রক্তের স্বাদ তিক্ত, আমি শিলাজিৎ গুঁড়ো মিশিয়ে বিষ খাই দক্ষিণ হর্ষবর্ধনের মতো ঝলমল করছে প্লাজমা ভর্তি ক্লোরাইড আলোর নপুংসকতা, টেক্সাটাইল মিলের দুর্গন্ধ উড়ছে, সাদা সাদা সোয়াব গলার ভেতর থেকে টেনে বের করছি আমি নতুন দেবদারু গাছের ক্ষয়ে যাওয়া ঋতাভরী অণ্ডজ জনন প্রক্রিয়ায়, বুকের হলুদ কফ পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য কোন বিষাক্ত ওষুধ খেতে নেই রাত্রির মৃত প্রহর গুলোতে, বাবার জনন ছিদ্র গুলোকে কৃত্রিম উপায়ে আবার ছিদ্র করছি অ্যানাস্থেটিক মলম লাগিয়ে মাঝরাতের অজাত শত্রু অক্ষাংশের মহানগর থেকে উঠে আসা নাবিক মৃত্যুর মতো দীর্ঘ হত্যার পর

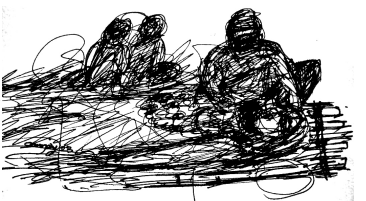

গলায় ছয় দশমিক পাঁচ সংখ্যাটিকে লাল টকটকে শ্মশানে ঝুলায়ে রাখ আতপৃক্ত দ্রবণের মতো, বৈমাত্রেয় চাঁদ আমার সুরিয়েলিস্টিক সঙ্গম দেখে ঘোড়া হয়ে গেছে তেজস্ক্রিয় অযোগবাহ পিশাচ অসংখ্য বার জন্মগ্রহণ করছে বলে, অর্জুন সারথী পূর্ণ গ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখছেন নাভির ভেতরের ব্যাধিনী মানচিত্রে।

পিয়ামুখচন্দা
সুদেষ্ণা দত্ত সাহা

চোখের কালোর দৃঢ় অতলে সমুদ্রঝড়। অথচ এ অবগাহনে কোনো দুঃখ নেই। শ্রাবণমেঘের অবেলায় আমরা নৌকাভাসি হই বা দুঃখবিলাসী। সশব্দ অক্ষরগুলো হাঁটছে অভিসারে। সহস্রাব্দ ধরে বেঁহুশ পৃথিবী তীব্রতর হচ্ছে তোমার দিকে। এইসব বিষাদ বর্ণমালা, মধুগন্ধ আলো, ধূসর বৃষ্টির কায়া স্পর্শ করতে চাইছে শর্বরীদীপ্ত করে থাকা তোমার মুখ, ভালোবাসার সেই সুরেলা চিত্রকরকে!

রাত্রির নির্জন ব্যপ্ত করে বাজছে "আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ পেখলুঁ পিয়ামুখচন্দা"

আমার ঈশ্বর
প্রিয়ব্রত গোস্বামী

আষাঢ় মাসের ডাগর বেলা
তরাই তো টানালি তলা
বেলা তিনটা, তিনটা প্রহরে
কামিনী চলিল ডহরে...

এ কথা লিখেছিলেন বাঁকুড়ার বক্সি গ্রামের এক সঙ্গীতসাধক-পুরুষ সিদ্ধেশ্বর হাজরা। বাংলা ক্যালেন্ডার ও পঞ্জিকা অনুসারে এখন আষাঢ় পেরিয়ে শ্রাবণ/ভরা বর্ষামাস। আর এই আষাঢ় কিংবা শ্রাবণেই কৃষক পরিবারের যতসব বাপ বাপান্ত। ঘরে দাঁড়াবার সময়টুকু পর্যন্ত নেই। সারাটা দিন মাঠের জল-কাদা ঠেলে ঠেলেই শশব্যস্ত শরীর। হাতে কোদাল, কাঁধে জোয়াল, লাঙল আর বলদ নিয়ে চলেছে চাষীরা। গতরে বতরে এই সময়টাতেই যে আমনের চারা রোপনের পূর্ণ বহর। স্বর্ণ, বিবি, ছত্রিশ ধানচারা লাগানোর শুভ মরশুম। এই দিনগুলোতেই যে আগাগোড়া জমিকে পরিচর্যা করার বিশেষ সময়। 'বাতালি' একটি কৃষিপ্রধান এলাকার আঞ্চলিক শব্দ -এই কথাতেই আমরা বুঝে ফেলি চাষবাসের ধারাপাত। এরকম কত কত শব্দ ঝরে পড়ে কৃষকের মুখে, আমরা তার কতটুকুই বা বলতে পারি। "কৃষকের সন্তান হওয়া ভাগ্যের ব্যাপার" বা "জমি যার ভাগ্য তার"- একটা সময় এই আওয়াজ শোনা যেত। সেই সময় ছিল সু-সময় আর এখন তা হয়ে দাঁড়িয়েছে দুশ্চিন্তার সাথে দুঃসময়ের। কারণ গ্রামীণ অর্থনীতির বিষয়টা খোলসা করে বলছি না আর। বিষয়টা এখন এখন সকলেরই জানা। বিশেষ করে গ্রামীণ কৃষক সমাজ হাড়ে হাড়ে তার অবগত আছেন। গ্রামীণ জীবনের মূল ভিত্তি তো কৃষি, তাছাড়া আর করবেটা কী। অথচ এক বিশেষ শ্রেণীর জীব লুটে নিয়ে যায় পুরো মুনাফাটাই। চাষীর ভাগ্যে জোটে মার। হায়! ভারত ভাগ্য বিধাতা। তবুও নির্লোভ কৃষক সারাদিন খেটেখুটে গতর ফাটায় দু-ফসলী একফসলী দু-

টুকরোর বাপের দেওয়া জমিতে।

এখন তো বলাই যায়- "এই যে অমেয় জল/মেঘে মেঘে তনুভূত জল/ ফসলের দেহে তার কতটুকু আসে বল.."(কবি কালীদাস)। এই হচ্ছে কথা। তবুও লিখতে বসে এই চাষের জমিতে যে একজন চাষীকে কতটা অগাধ পরিশ্রম করতে হয়, আস্থা রাখতে হয় কৃষিজমির প্রতি তা সামান্য পরিসরে তুলে ধরছি। প্রথমেই নির্দিষ্ট জমিতে চারা ফেলা হয়। সেই চারা বাড়লে সেগুলোকে এই বর্ষাকালে তুলে ফেলতে হয়। এই তলা টানার কাজটা মেয়েরাই প্রধানত করে থাকে। বিশেষত আদিবাসী ও বাগাল সম্প্রদায়ের মহিলারা। ঠিকমতো বৃষ্টি হলে পর পর যে কাজগুলো হয় সেগুলো হলো-কাদা করা, পচান দেওয়া, ভিতা কাটা, বৃষ্টির জল দাঁড়ালে চারাগুলোকে এনে নির্দিষ্ট হাতের মাপে সেগুলোকে বসাতে হয়। এরপর নিড়ানির কাজ (ঘাস সমেত আগাছা বাড়লে), নিড়ানির পরেই আসে দু-চারবার স্প্রে, খাবারও খাওয়াতে হয়। চারা বাড়লে সেগুলোকে নজরে নজরে রাখা আর তারপরেই ফসল কাটার মরসুমে রোটার বা হারভেস্টারের খরচাখরচ দিতে দিতেই চাষীর দম ফেটে যায়। মাঠ থেকে আবার খামারে আনলে তার খরচ বললে বেড়েই যাবে।

এতটা পথ পেরোলে তবেই কৃষকের কাজ সম্পন্ন হয়। গোটা বছরভর কৃষিকাজে থাকা চাষীবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা এভাবেই দিনযাপনে দিনাতিপাত করে থাকেন। এসব শহুরে বাঙালীরা কী করে বুঝবে! মুখের কথা নয়, কাজে করে দেখানো। আর এভাবেই আমার গ্রামবাংলার কৃষককূল থেকে শুরু করে মুনিষখাটা কামিন ও কামিনীরা চাষেবাসে লিপ্ত হয়ে থাকে কিছু টাকার মুখ দেখার আশায়। আর সেই টাকার অনেকটাই চলে যায় বিশবাঁও জলে। বড় বড় পদে থাকা ব্যক্তি থেকে আরম্ভ করে চুঁটোচামড়া সব ওত পেতে থাকে গলাভর্তি খাওয়ার বাসনায়।

ও মন তুমি কৃষিকাজ জানো না
এ মানবজমিন আবাদ করলে ফলতো সোনা।

কতজন বোঝে 'A man is an asset' এই কথা। না হলে কথার কথা হয়ে আজ থাকতো না এই বাক্যবন্ধ। পরিশেষে বলি :আমার কাছে কৃষক আমার ঈশ্বর। ওঁরা ভালো থাকুক। সেই রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই সমাপ্তি টানি--

"শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে
ওরা কাজ করে।"

আলাপ-আলোচনা

অশ্বত্থ

মানবেন্দ্র পাত্র

সেই কবে আলোক সরকারকে পড়েছিলাম -

"..... রাত্রিবেলা
অদূর অশথগাছ খরতায় নিমগ্ন অলীক।"

এরকম এক একটা লাইন পড়লে, শব্দদের অপেক্ষায় রেখে বুঁদ হয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, শরীরে শরীরে শব্দের সঙ্গে সহবাসে বড্ড ক্লান্ত এখন! ঘনিয়ে ওঠা চাঁদ, ফাঁপা বিষাদ আর মেঘভাঙা রোদে শব্দের নিসর্গরা কখনো খর! কখনোবা অলীক! আবার মনে হয়, অদূরের অশত্থ নিমগ্ন হয় কীরে?

এবার রাত্রি জুড়ে নৈঃশব্দ্যের সাথে গহন হওয়া যাক বরং। একটু পরেই এসেছিল আর একটা অমোঘতা-

"কে ভাবে অশথ গাছ কোনখানে!"

মুহূর্তেই নিজের একলা হয়ে আসা তন্ময়তা যেন শূন্যে শূন্যে অনিশ্চিত হয়ে যায়। শব্দদের এমনভাবে নিরাশ্রয় করে দিতে পারেন ক'জন কবি? লাইনটা পড়েই মনে হলো, আমারতো কোনো মগ্ন তেপান্তর নেই! কালজয়ী পক্ষীরাজও নেই! এক চিলতে নকল বাঁধনের ছাদই আছে শুধু। দূরকে দেখার এত অভিমানী আত্মসুখ আর কে দিতে পারে?

ছাদে না উঠলে নৈঃশব্দ্যদের নির্জন সংঘর্ষ বোঝাই যায় না। সব রোমাঞ্চিত নদী তার মতো করে নিজস্ব রাত খুঁজে নেয় চিরকাল! আর বকুলগাছেরা সারা দুপুর বিকেল গুছিয়ে রাখে ঐ সব বোবা হয়ে যাওয়া রাতের জন্য।

নিঃশব্দ রাত ভেতরে গুনগুন করে ওঠে। এইতো, বেশ আছি। আলো আর অন্ধকার দিয়ে ফুটিয়ে তুলি বাগান। তার ভিতর বীজ আছে। সুপ্তি আছে। সুর কখনো কখনো হারিয়ে যায় অন্ধকারের বাগানপথে। মেঘরোদের বারান্দা ছুঁয়ে বিষণ্ণ একটা মনও আছে হয়তোবা! তারই মাঝে শুধু প্রত্যাশাদের ছুটি দিয়ে দিতে শিখছি।

ঐ যে লাইনটা! "কে ভাবে অশথ গাছ কোনখানে!" প্রশ্ন নয়! এখানেও যেন এক নির্লিপ্তি আরও মগ্ন হতে চাইছে! শুধু শব্দ নয়, নৈঃশব্দ্যদেরও অপেক্ষায় রেখে!

আজকাল তোমার কবিতা পড়লেই মনে হয়, হয়তো সবুজ রোদের খোঁজে রয়েছো! নয়তো নির্জনে গড়িয়ে নামা আলোর! অথবা এসব কিছুই নয়! পুরোটাই পরিত্যক্ত বিকেলের নিছকই এক মেঘ মেঘ খেলা! কখনো কখনো মনে হয়, তোমার কবিতার আর্তিও যেন রাতের নির্জনতা মেখে জেগেই আছে রাতভর! শুধু তার এক অনাসক্ত আর নির্বিকার অশ্বত্থ চাই। যেদিন মনে হবে, অশত্থের জন্য তোমার এই আকুতিটুকুতে ব্যক্তিগত বিবিক্তির কোন তন্ময় খোঁজ নেই, তা শুধুই শব্দের অতি-সংযমী স্তব্ধতার এক তৈজস, সেদিন জানব নির্জন রাতেও গহন হতে ভুলে গেছি আমি।

সাঁকো সন্ধানী কবি তুলসীদাস মাইতি

গুরুপদ মুখোপাধ্যায়

কোন তাপ নেই, উত্তাপ নেই। একটা চোরাস্রোত দুরন্ত ঘূর্ণিতে বালিয়াড়ির নীচে আটকে আছে। কবির কথাগুলি নির্জন প্রান্তরের নিঃসঙ্গতা ছড়াতে ছড়াতে ফুল ফুটিয়ে অদৃশ্য হতে থাকে। কথার মায়াজালে বেঁধে ফেলেন পাঠককে। শূন্য ও অনন্তের রহস্যময়তার মধ্যে জীবনমৃত্যুর ঢেউ তরঙ্গে তরঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে পাড়ে এসে আছাড় খায়। সূর্যের উত্তাপ কবিতার চরণে সব বিরহবেদন নূপুর রঞ্জিত হয়ে উদাসী হাওয়ার সঙ্গে প্রেমপর্ব সারতে চায়। আসলে একটা অদ্ভুত টানকে ছড়িয়ে দেন অক্ষরে ও পংক্তিমালায়। কবিতা হয়তো তাই। যে পোড়া বাতাস আর শ্মশানের ছাই মেখে জন্মদিনের উৎসব সারে। তুলসীদাস মাইতির কবিতা সেই অবগাহনের অবগাহন। বারবার নীলকণ্ঠ হয়েও লজ্জাবতীর মতো কণ্ঠে নীল মাখতে থাকে।

গ্রাম বাংলার ছবি! প্রেমের কী মৃদু উচ্চারণ! তরমুজের মতো সব রসটুকু ভরে দেন গ্রন্থিতে গ্রন্থতে। কোন ব্যাকুলতা বা উষ্মা নেই, চরণ বিক্ষেপের স্বরগুলি ভেসে আসে সুদূর থেকে। গজেন্দ্রগামিনী হয়ে দুলকি চালে অশ্বারোহনের মিথ ভেঙে এগিয়ে চলে শব্দের মায়াজাল। গন্তব্যে পৌঁছানোর কোন তাড়া নেই। কালিদাসের মেঘের মতো রামগিরি থেকে অলকার পথে কত দৃশ্য দেখতে দেখতে ছেড়ে যেতে হয় তাদের। কবিতার ভাষা সেই রামগিরির শূন্যতার মায়ালোক। মাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন কবি তুলসীদাস মাইতি। তাই খেলাঘরের মতো হয়তো বাল্যের শিলাবতীর ভাঙনের রূপ দেখে অদৃশ্য সাঁকো বাঁধেন। যে সাঁকো শিলাই-এর হৃদয় ছুঁয়ে বৃহত্তর জীবনে কোথায় যেন ঘূর্ণির দোলায় জাগিয়ে তোলে। গ্রামবাংলার অবহেলায় পড়ে থাকা পর্ণমোচী শব্দগুলি কখন যেন কবিতা হয়ে ওঠে। নিজের জাত চেনাতে হয়তো এভাবেই স্বতন্ত্র ঘরাণাকে আশ্রয় করে বনলতা হয়ে উঠতে চান, আশ্রয় ভিক্ষা চান শব্দের বনস্পতির কাছে। কবিতা সেই নিরাকার বেদীভূমি, নির্ঝরের মতো খসে পড়ে অশ্রুবিন্দু। সেই ধারায় ভিজতে থাকে বেদীতে মাটিতে অনার্যদেবতা, মাটির ঘোড়া, বেলপাতায় মাখানো সিঁদুর।

হর্তা অন্তরালে বসে কোন মায়াবী জাদুতে সোনাটা বা মল্লারে ঘা দিতে থাকেন। হরিৎ হয়ে ওঠে মেঘলোক। চুম্বনের স্বাদ বিদ্যুতের সোনালী দাহে অঙ্গারের চিহ্ন রেখে যায়। তাই রেবা শিপ্রা, বেত্রবতী বা অবন্তী বিদিশা উজ্জয়িনী নয়, একেবারে শিলাই-এর পাড় ছুঁয়ে দামোদর বা দ্বারকেশ্বরের চুম্বনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে নেচে ওঠে লাল দিঘির ঢেউ। মেঘ যাত্রা করে মন্দিরনগরীর প্রান্তভূমির দিকে। দেবদেবীর থানে অনার্য দেবতার সঙ্গে মাটির ঘোড়াগুলি রোদ ও বৃষ্টিতে ভেজে। রবীন্দ্রনাথের রূপকল্পের অমলও সেই পাঁচমুড়ো পাহাড়ের বটতলায় বসে বিশ্বদর্শন সারে। মেঘের এই টানে —

"গ্রাম দেবতার নির্জন থানে আষাঢ় পূর্ণিমার প্রাক দুপুর। নাগকেশর গাছের নোয়ানো ডালে ভালোবাসার অনন্ত আদরে বাঁধা রঙীন সুতো। তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে ভাঙা বেদীর উপর। পুরোহিতের পায়ের ছাপ জড়িয়ে যাচ্ছে

দেবতার দিকে, ঠায় দাঁড়িয়ে ভিজছে মাটির হাতি ঘোড়াগুলিও।

বিরল এই দৃশ্যেই ওরা দুজন এসে দাঁড়িয়েছে। যুবকটি তাকিয়ে আছে দুরন্ত অশ্বের গ্রীবার দিকে। বেলপাতা আর তেলে ভেজা সিঁদুরের দাগ লেগে আছে লাগামের ওপর। মেয়েটির চোখ আটকে আছে সেখানেই।

তাদের ভিজে হাত তখন শরীরেও বৃষ্টি নামিয়েছে। 'আষাঢ়স্য দিবস' এর মেঘ ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অন্তরের সব নদী। ঈশ্বরের ইচ্ছে হলেই আজ শস্য শ্যামলা হয়ে উঠবে তার অতল ভেতর-ভূমি"

(আষাঢ়স্য দিবসে / অদৃশ্য সাঁকো)

ভিজে যাচ্ছে স্বর। প্রকৃতিও পুরুষের এই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখছে নির্বাক পৃথিবী। ঢেউ ছুঁয়ে যাচ্ছে ওষ্ঠ ও অধরের প্রান্তিক সৈকতভূমি। শস্য শ্যামলা হয়ে ওঠে অস্থির লালমাটির রুক্ষ হৃদয়।

কবি এইজন্যই হয়তো একটা সেতু না হোক, সাঁকো বাঁধতে চান। যেমন করে বাঁশের সাঁকো জুড়ে দেয় এপাড়-ওপাড়ের হৃদয়।—

"সেতু না হোক অন্তত একটা সাঁকো চাই।

পূর্বপুরুষের এ চাওয়ার কথা জানে সমস্ত গাঁ।
ওপারের রোদ্দুর ছুঁয়ে বাঁশির শব্দ, বইহারা
বালকের আনমনা সংগীত সবই মিশে যায়
এপারের স্রোতে। শক্ত বাহু দিয়ে জল ভাঙতে ভাঙতেই আতপ্ত দুপুর।
বৈচি কুসুমের সাথে দীর্ঘ আলাপচারিতা।
আনত বালিকাটির সুগভীর কৌতুহল আকাশসমান ঢেউ ভাঙে তার জলজ শরীরে।
চিরায়ত স্বভাবে মিলে যায় দুইপাড়ের অসংযত মেঘ
আর ঝড়ের পূর্বাভাস।

উপত্যকা জুড়ে গড়ে ওঠে অদৃশ্য সাঁকো।"

(অদৃশ্য সাঁকো / অদৃশ্য সাঁকো)

শব্দের এই পরিচলন পাঠকসত্তাকে এক গহীনে নিয়ে যায়। অতল শব্দরাজির মধ্যে শূন্যতা দেখতে দেখতে কবি একান্ত আলাপচারিতায় হয়ে উঠেন নির্জন দ্বীপের বাসিন্দা। বাল্যের ধূসর স্মৃতি আঁকড়ে সাঁকোর সন্ধানে কল্পনার বিলাস যাপন। গ্রামবাংলার স্মৃতিমাখা ফেলে আসা দিনগুলো নিভৃতে উজানভাঙে, খেয়া বায়, পরিয়ে যেতে চায় তেপান্তরের কল্পলোকের রাত্রির নির্জন জ্যোৎস্নায়।

মৃত্যুভাবনার মধ্যেও এক অতল শূন্যতা। 'মৃত্যুর খুস নেই', মৃত্যু শোক ও জন্মদিনের উল্লাস', 'পরলোক', 'মৃত্যুর পরের কয়েকদিন', 'মৃত্যুর নিয়ম' প্রভৃতি কবিতায় মৃত্যুর মাঝে সৌন্দর্যকে ছুঁতে চেয়েছেন কবি।—

"নগর পেরিয়ে কালিন্দি শ্মশানঘাটে রাত্রি নামে।
ছায়াদিঘির অন্ধকার জলে যে যে কান্নার কোলাহল মিশে যায়।
অদূরের ছোট ডিঙাটি এখনো ছুঁয়ে আছে
মুগ্ধ গোধূলির মায়া। আর পারাপার শেষে মাঝিরা

ঘরোয়া উনুনে জ্বেলেছে উদরের চঞ্চলতা।

আশপাশের শস্য খেতে একা-চাঁদের সাথে বইছুট রাখালের বাঁশি বেজে যায়।
....
সুদীর্ঘ কাব্যভূমিতে মৃত্যু জেগে থাকে। আর জাগে সমাধির ফুল।"

(মৃত্যুর ঘুম নেই / অদৃশ্য সাঁকো)

শুধু বিয়োগ বা ভাঙন নয়, এখানেও এক উত্তরণের পথ নির্মাণ করেন। চঞ্চলতার মাঝেও ধ্যানস্থ নিবিড়তা, নির্জনতা কোথায় সেন কবিকে বিঘ্নহর্তা করে তোলে।–

"প্রিয় বাসভূমি আর কোলাহল ফেলে অতল ঘুমে নির্বীকার নদীতীর।
পোড়া কলস ছুঁয়ে ছিন্ন মায়া। বিন্নি খই উড়ে গেছে হাওয়ায়,
এঁকে গেছে কেউ স্মৃতির নিঃশব্দ রঙীন মুখ।

হরিকথার কলরব রাত্রির অন্ধকারে মিশে যায়।
আধপোড়া কাঠ আর আধপোড়া স্বপ্নের নিঃসঙ্গতা নিয়ে
দাহভূমি জেগে থাকে অন্ধকারে।

কাকেদের হাহাকারে তবু সকাল আসে।
স্মরণ কালের ছায়ায় পুড়তে থাকে নান্দীসুখ ঘর।

জনপদে আজও কিসের উৎসব!
হয়তো জন্মদিন কারও।
দাহভূমিতে কে ভাঙে ছাইধুলোর ঘর?

সুখধ্বনি উঠুক তবে আজ। মহাকালের চলাচলে
মৃত্যু শোক ও জন্মের উল্লাস।"

(মৃত্যুশোক ও জন্মদিনের উল্লাস / অদৃশ্য সাঁকো)

ফুলের পাপড়ি ঝরে গেলেও আগামী ফুল অপেক্ষা করে থাকে প্রতিদিনের ভোরের নতুন সূর্যের আশায়। শুধু অন্ধকার নয়,— অন্ধকারে জোনাকির উড়াউড়িতে জেগে থাকে জ্যোৎস্নালোকিত নির্জনতার অন্ধকার। জোনাকি উৎসবে আলোকিত হতে থাকে শ্মশানভূমি।

তাই কবি বুদ্ধের কাছে ফিরে যেতে চান। নির্মাণের মধ্যেই নির্বানের বীজ পুঁতে দেন। কৃষক হয়ে উঠেন কবি। অক্ষরের বীজগুলি ধ্যান গভীরতায় ডুব দিতে থাকে অসংখ্য সুজাতার জন্য। —

"ধ্যানে বসেছেন বুদ্ধ।
সনাতন বটবৃক্ষের শাখায় পাখিরা গেয়ে উঠল।

পাশের খেতে ধানের বীজ পুঁতে পাহারা দিচ্ছিলেন সুজাতার পূর্বজরা।
পাখিরা আবারও গেয়ে উঠল।

কয়েকটা অমাবস্যা পেরিয়ে এলো পূর্ণচাঁদ।
বুদ্ধের ধ্যান ভাঙল। কৃষকের ঘরে এলো নতুন অন্ন।
সুজাতার হাতে অমৃত স্বাদ।
বুদ্ধ হাসলেন।
বুদ্ধ বাঁচলেন।
নৈরঞ্জনার জেলে ভাসলো নৌকো।

সনাতন বটবৃক্ষের সেই পাখিরা আবার গেয়ে উঠল"

(বুদ্ধ ও সনাতন বটবৃক্ষের সেই পাখিরা / অদৃশ্য সাঁকো)

রূপকের আড়ালে জীবন ও সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা, একাকীত্বের মাঝেও কবি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেন। ফুটে উঠে নির্জন অন্ধকারের নিবিড় আলাপের পাপড়িগুলি। কবিতা স্বর এত গভীর, যা গোধূলির ধূলির মতো ধূসর। অবহেলায় পড়ে গ্রাম বাংলা টুকরো টুকরো ছবি,- যেমন নদ-নদী, পথ-ঘাট, পুকুর জলা জঙ্গল উঠে আসে তার কবিতায়।

হয়তো এক নীরব অভিমান মর্মরিত বৃক্ষের পাতা ছুঁয়ে পর্ণমোচী হয়ে খসে পড়ে ভূমি চুম্বনে। কিন্তু চোখ অনির্বান। যার কাজল রেখায় আঁকা হতে থাকে নিভৃত অভিমানের গল্পকথা।—

"ঝরা পাতার অরণ্যে বসন্তবতীবৃক্ষ তার প্রান্তবেলা
লুকিয়ে রাখে নিঃশব্দ ছায়ার গভীরে।
গোধূলিগ্রামের নিসর্গনারীর অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়ার মতো
কৃষ্ণনিবিড় সেই রহস্য অবসান।

বাঁশি না বাজলেও অজস্র রঙের স্মৃতির আলাপে পিছুটান।
ক্ষয়ে যাওয়া দিনের রৌদ্র ও রঙ বিলাসী সংলাপে
আকাঙ্খা তার মরা ছায়াদের পাশে ফিরে ফিরে আসে।

নিজেকেই ফেলে রেখে যায় নিভৃত অভিমানে।"

(নিভৃত অভিমান / অদৃশ্য সাঁকো)

পেরিয়ে যায় ক্লান্ত বিষণ্ণ বিকেল। নিবিড় অন্ধকার। খোলা জানালার হিমশীতল বাতাস। আর মায়া ও স্মৃতির দেয়ালে জমা হতে থাকে অজস্র বর্ণের বিলাপ। নির্মিত হতে থাকে পথের পাঁচালি।

এভাবেই মাঝে মাঝে আত্মসন্ধানে বেরিয়ে পড়েন কবি। সারাটাদিন জুড়ে জমা হতে থাকে নদীর ছলাৎ ছল জল, আর বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি, আঁকা বাঁকা আলাপ, বালিকার কুড়ানো কুসুম, বয়ঃসন্ধির মুখ ও বসন্তবাগান। অক্ষরের পুনর্জন্ম হতে থাকে। ঋতুচক্রে কবি খুঁজে বেড়ান পুরানো বাঁশি, অদৃশ্য আকাঙ্খার পৃথিবী, যে চোখের নদী হয়ে অচেনা মরুভূমিতে শুকিয়ে যাচ্ছে। তাই কবি বলেন-

"ছায়াহীন বৃক্ষহীন বিবর্ণদ্বীপে হাঁটতে হাঁটতে তুমিও
শীর্ণ রূপকথার উপসংহার লিখে চলেছ
নিবিড় মগ্নতায়।"

(শুশ্রূষাঘর / অদৃশ্য সাঁকো)।

অস্থির পৃথিবীর ছায়া দোদুল্যমানতায় বড় হতে থাকে। অবিশ্বাস, হিংসা, ক্রুরতায় সর্বগ্রাসী এক সর্বনাশা ঢেউয়ের আঘাত মনের দু'পাড় ভাঙতে থাকে। যেখানে হৃদয়ের অজানা বিবরে বাস করে বিষধর কাল নাগ-নাগিনীরা।—

"অন্তর বেয়ে উঠে এলো একটা আস্ত সাপ,
নকশিকাঁথার রঙে ভরে দিল পৃথিবী।
বসন্তগোধূলির নিসর্গনারীর মতো তার উড়ো চুলে ডুবে গেল সব বাতি।
অন্ধকারের এই আলোয় যেই তাকে স্পর্শ করতে গেলাম
অমনি সে একটা কুচকুচে নীল রহস্য জড়িয়ে চলে গেল নির্বিকার।

তবে আবার সে ফিরে এলো
হঠাৎই তার অতৃপ্ত বৃত্তে পরিধি বাড়িয়ে সোজা ঢুকে পড়ল অতল বুকে।
ওলট পালোট করে দিল অলিন্দের সবটুকু আশ্রয়।

অদৃশ্য সর্বনাশের ছায়ায় এখন শুধুই ছোবলের শব্দ শুনতে পাই।"

(ছোবল / অদৃশ্য সাঁকো)

এভাবেই হয়তো অপেক্ষা করতে হয় সারাজীবন—

"কবিতায় কবিতায় পুঁতে রাখবো বলে
দিনরাত খুঁজে চলি অক্ষর-কমা-সেমিকোলন।

এখানে জল নেই, হাওয়া নেই, মাটির গভীরে রস নেই।
যতি সংকেতেও অস্থি-মজ্জাহীন অনর্থক আসা যাওয়া।
....
ঋতুর চাকায় এভাবেই দিন আসে, রাত যায়।
অজস্র কবিতার ভেতরে বসে থাকি একটি নির্ঝর বৃষ্টিদিনের অপেক্ষায়।

সেদিন কবিতার ওষ্ঠে- শিকড়ে ছড়িয়ে যাবে ব্যবহার্য জল।"

(অপেক্ষা / অদৃশ্য সাঁকো)

তাঁর কবিতায় বারে বারে মৃত্যুভাবনা ফিরে এলেও সেখানে রয়েছে মাথুর পর্ব, হরপ্পার কথা, নির্বাণ পর্ব, একা নৌকো নির্জন ঘাট, অহল্যাভূমি, বাঁশি বাগান বিনুপিসির গলি, অপর্ণার সংসার, হারানো নদী, বাবার হারানো মৃদঙ্গ, চাঁদরাত্রি অরণ্যভূমিও শেষে সাঁকোর কথা।

'পরকীয়া বর্ষা' কবিতায় দেখি —

"পরকীয়া বর্ষা আকাশ লুকিয়ে রাখে।
নৈঋত বায়ু ও অসংযত মেঘ সে দৃশ্য আঁকে,
সামনে তার ধূসর দেয়াল। আর অন্তরালে রোদের অন্তরালে রোদের আশ্রয়।

নিষেধের কালরাত্রি শেষে খেতের নরম আলে অম্বুবাচির ভিজে 'বতর'
নলসংক্রান্তির ঘুমহীন রাত পেরিয়ে

ব্রীহিভূমির গর্ভধারণ।

পরকীয়া শেষে জোছনা আর ফসল উৎসব।"

(পরকীয়া বর্ষা / অদৃশ্য সাঁকো)

যেখানে বর্ষার গানে অন্তরাতে ভিজলে ভালোবাসা নদী ছুঁয়ে যায়। বৃষ্টির নরমসুরে ভেসে যায় ক্ষুব্ধ ধুলোর দাপট, উঠোনের জোৎস্না, বাগানের শুকনো পাতা ও সাতটি অক্ষরের বিস্তৃত মাঠ। এভাবেই মেঘরাজা ছুঁয়ে যায় হৃদয়।

পূর্বেই বলেছি তুলসীদাস মাইতি কোলাহলের কবি নন্। তিনি নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব ও একান্ত যাপনের কবি। তাঁর কবিতায় –

"নীরব পাণ্ডুলিপির দেওয়াল তুলে
কোলাহলহীন কেটে যায়।

মুহূর্তগুলো কটাক্ষ করে।
অন্ধকার গভীর হলে অক্ষরগুলো এঁকে রাখে যেটুকু আলো
সেটুকুর জন্যই অন্ধ হইনি, চোখের পাতাও হয়নি স্থির।
তবুও উদাসীগান ভেসে আসে ভেজা জ্যোৎস্নার হাত ধরে।
মস্তিষ্ক বেয়ে নেমে আসে সেমিকোলনের দীর্ঘ ছায়া।
একা রাত্রির কবিতায় এভাবেই জমা হয় বিষাদ সংকেত।

দূরতর জানালায় কুয়াশায় জড়িয়েছে অলস ভোর।
অস্পষ্ট দেওয়ালে লিখে রাখি অ-সুখের সেই নিঃশব্দ কথা"

(একারাত্রির নিঃসঙ্গ কবিতা / অদৃশ্য সাঁকো)

হারাণো নদীর মাঝে বাবার মৃদঙ্গের কথা মনে পড়ে। এক বিষাদের মাঝে অপূর্ণতা ছোঁয়া পূর্ণতা। 'Saddertic Love' এর মতো বিষাদময় প্রেমের রেখচিত্র। বাবা ও মায়ের কথা বলতে বার বার স্মৃতিচারণায় ফেরেন। স্মৃতি যেন তাঁর কবিতায় প্রধান ভর হয়ে উঠে। বাবা সাত বছর নেই। তবুও তিনি রয়েছেন অক্ষরে, শব্দে, বর্ণভূমির সোঁদাগন্ধে। বাবার হারিয়ে যাওয়া মৃদঙ্গের কথা মনে পড়ে। মা-ই বয়ে নিয়ে চলেছেন বাবার নামিয়ে রাখা অযুতভার। তাই কবি আজও —

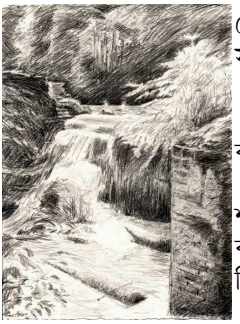

"পড়ন্ত জানালায় দাঁড়িয়ে আজ দুরন্ত স্রোত খুঁজি।
ধোঁয়াটে মেঘের ভেসে যাওয়ার সাথে সাথে হারিয়ে গেছে সব।"

(হারানো নদীটি / অদৃশ্য সাঁকো)

এভাবেই অক্ষরে অজস্র দেওয়াল তুলে কোথাও যেন বাঁধা পড়তে চান কবি।

স্বতন্ত্র ঘরাণার কবি তুলসীদাস মাইতি। কিছু কিছু শব্দবন্ধ বারে বারে ফিরে এসেছে। তা সত্ত্বেও তার কবিতায় তরঙ্গ গ্রীষ্মের আধমরা নদীর শীর্ষ স্রোতের তির তির চোখের মতো আলোকোজ্জ্বল। সেই ঢেউগুলিকেই

ধরতে চান কবি। এও এক আত্মবিলাস ও অন্তর্যাপন। নিবিড় সংলাপে একান্ত আত্মমগ্নতায় ছুঁতে চান পূর্বরাগ ও অনুরাগের স্বেদবিন্দুকে। রয়েছে জীবন্ত প্রকৃতিং কিন্তু উতলা নয়। উতল ঘূর্ণি নেই তাঁর কবিতায়। রয়েছে স্মৃতির ক্যানভাসে নতুন নতুন আটপৌরে শব্দ। গ্রাম্য বধূটির মতো ঘোমটা ঢেকে এঁকে দিতে চান অক্ষরের পদচিহ্ন। আমিকে খুঁজতে বেরিয়ে কখন যেন আমি তুমির দ্বান্দ্বিক পরিমণ্ডলে তিনি হারিয়ে যেতে থাকেন। যা ছুঁয়ে থাকে প্রান্তরের খাঁ খাঁ করা শূন্য মাঠ, আর অদৃশ্য সাঁকো।

উত্তর-আধুনিক যুগের ধ্রুপদী কবি-চিত্রশিল্পী ও সঙ্গীতসাধক ড.বাসুদেব মণ্ডল

চন্দ্রাবলী সোম

"চলো শঙ্খের মতো হেঁটে চলে যাই নদীর নিচে..." -

হ্যাঁ কবিতায় এ-রকম এক জীবন্ত মায়াময় শব্দ উচ্চারণ করেছেন অর্থাৎ কবিতার চরণ আবিষ্কার করেছেন কবি, প্রাবন্ধিক, আপাদমস্তক আন্তর্জাতিক এক শিল্পী ড.বাসুদেব মণ্ডল। একটা মানুষ একাধারে চিত্রকর, কবি, সংগীতশিল্পী ও গীতিকার। কিন্তু কী অবলীলায় তিনি সবকিছুর মধ্যে নিমগ্ন থেকে, দিনের প্রতিটা মুহূর্তে অবগাহন করেও প্রচারবিমুখ করে রাখেন নিজেকে, থাকেন অন্তর্মুখী! তবুও বিভিন্ন তথ্যের আলোকে তাঁর সম্পর্কে যেটুকু জেনেছি তার কিছু অংশ সকলের কাছে, বিশেষ করে পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই আজকের এই কলম ধরা বা প্রবন্ধ লেখা।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী অনেক গুণী-মহাজন, হ্যাঁ মহাজন তো বটেই, সাহিত্যের মহাজন। সাহিত্যের ভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে কেউ কাব্যে, কেউ গল্পে আবার কেউ উপন্যাসে তাঁর ভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন এবং সাহিত্যের জগতে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। আর আজও যারা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করছেন, বিশেষ করে উত্তর আধুনিক ধ্রুপদী কবি হিসেবে পরিচিত, তাঁদের মধ্যে অনন্য হলেন বাসুদেব মণ্ডল। খুব একটা ভুল হবে না বিশ্ব বরেণ্য কবি রবি ঠাকুরের সাথে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর তুলনা করা কিংবা ভুল হবে না সুলতানি যুগের বেশ কিছু চিত্রশিল্পীর চিত্রকলার সাথে তাঁর চিত্রকলার তুলনা করা। আবার ভুল হবে না কিছু বিদেশি কবির সাথে তুলনা করা। এই তুলনা করতে গিয়ে তিনটি প্রবেশ পথকে সোপান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর শিরায় শিরায়, মর্মে মর্মে যেন বেজে ওঠে শিল্পের তিনটে দিক- কবিতা, চিত্রকলা এবং সংগীত রচনা ও সুর সাধনা।

কবিতাবলয়, নন্দনতত্ত্ব ও বাসুদেব:

কবি যখন বলে ওঠেন,-

"...কবিতা লম্বা হয়ে যাচ্ছে
ফুলেই যাবে বলে...
আমি তোমার ফাগুন বাতাস
হতে চাইছি মেয়ে
শঙ্খ ভেঙে জল বানিয়ে
পায়ে নূপুর পরিয়ে দেবো
লালনের গান গেয়ে।"

- এই চরণগুলির মাধ্যমে কবি এক অনন্য নন্দনতত্ত্বে প্রবেশ করেছেন। গভীরে প্রবেশ করলে বোঝা যায় জমি এক অথচ আলাদা আলাদা ফসল অর্থাৎ বিষয় এক উপলব্ধি আলাদা। এখানেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে কবির সৃষ্টির দক্ষতার, একই কবিতায় বহুমাত্রিকতার প্রকাশ পাঠক সমাজকেও চিন্তাশক্তির মধ্যে প্রবেশ করতে শেখায়। আবার কবি যখন তার 'স্বপ্নরা' কবিতায় লিখছেন-

"মনে মনে চাঁদের ছাপ্পা মারছিলাম বুকে
রবীন্দ্রনাথকে প্রথম স্বপ্ন দেখেছিলাম
১৪ বছর বয়সে।
তারপর অন্ধকার বাঁশিটা বুকে নিয়ে
হরিপ্রসাদের আনন্দ-লণ্ঠনের তলায় শুয়ে
স্বপ্ন দেখলাম জীবনানন্দ,
বয়স তখন ১৪ বছর ৩ মাস।
আঠারোর মধ্যে পরাপিতামহ বিনয়
শক্তি সুনীল জয়
অনিকেত বিমলবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে
এখন আমি স্বপ্ন দেখছি আমাকে।"

-'স্বপ্নরা' কবিতার এই চরণগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় একজন কবি তার স্বপ্নের মাধ্যমে কীভাবে নিজের উত্তরণ ঘটিয়েছেন। উত্তরণের পর্যায় পেরোতে পেরোতে আজ তিনি নিজেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেন, তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। তবুও তিনি আরও আরও অসীমকে ছুঁতে চান এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়ার ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে থাকেন সর্বক্ষণ, শিল্পে। শিল্প সাধনায়।

আবার কখনো কবি তাঁর শিল্প সৃষ্টির প্রয়োজনে নিজের সাজানো ভালোবাসার বাগানকে আড়াল করেন। কখনো কখনো ছুটে যান কবিতার মায়াময় ছন্দ ভাঙার খেলা নিয়ে অন্য ভালোবাসার বাগানে, সেখানেও ভালোবাসার ঘর বাঁধতে থাকেন, কবিতার ছন্দে-ছন্দে মায়াময় শব্দের খেলায়। হয়তো সে ঘর খেলাঘরের মতো ভেঙ্গে যাবে একদিন কিন্তু তার রেশ থেকে যাবে কবির মনের গভীরে, তাই তিনি 'নিজেকে পোড়াই'কবিতায় লিখেছেন,

"কিছু ছবি পুড়িয়ে দিলাম আজ
...
কিছু শিল্প বাদ দিতে হয়,
কিছু গান।
কিছু শিল্পকে এভাবে পোড়াই,

নিজেকেও"। -এই ছবি পোড়ানো আক্ষরিক অর্থে যেমন আমরা ধরে নিতে পারি তেমনি এই ছবি ভালোবাসার কিংবা বিরহের ছবি হতে পারে, বেদনার ছবি হতে পারে, যাকে প্রয়োজনের খাতিরে একটা সময় পুড়িয়ে ফেলতে হয় ।আর সেই পোড়াতে গিয়ে কবি নিজেকেও পোড়ায় -একথা কবি অন্তর থেকেই স্বীকার করেছেন ।

আবার কখনো একটা মহিমবোধ কাজ করে তা মায়াময় ঘরের কবিতাগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় - যেমন

'তুমি জাগো সুবর্ণ' কবিতায় কবি লিখছেন ,

"ভিতরে আমার শস্যক্ষেত নড়ে উঠছে।
আর তুমি শান্ত হও ফল্গু স্রোত
আমার পলাশডাঙ্গা জাগিয়ে দিচ্ছ

যেমন ধীরে ধীরে জেগে ওঠে চর। " কবিতার এই চরণ গুলিতে আবারো প্রেমের কবি রোমান্টিক হিসেবে ধরা দিয়েছেন।এখানে কবি সুবর্ণকে প্রতীক হিসেবে রেখে বলতে চেয়েছেন তাঁর ভিতরের যে শস্য ক্ষেত সে সবুজ ডাঙায় জেগে উঠেছে তাঁর হৃদয়কে দোলা দিয়েছে। অন্যদিকে তিনি ফল্গুধারাকে শান্ত হতে বলেছেন, এই ধারা অন্তরে প্রবাহিত, এ দৃশ্যমান নয় । তাঁর পলাশকে জাগিয়ে দিচ্ছে বারে বারে। সবুজ শস্য ক্ষেত হেমন্তের পলাশ এসবের মাধ্যমে দিয়েই প্রাণহীন কবি আবার সুবর্ণের স্পর্শে এক পূর্ণ যুবক হয়ে উঠেছেন ,সে তাঁর 'শ্রী'কে অনুভব করছেন ।

'সুবর্ণ ও ধেয়ানের ফুল' কবিতায় বলছেন, "শোনো আমি তোমার গোপন পলাশ দেখে ফেলেছি

মধ্যরাতে নীল পোশাকের যত্নে ঢেকেছো রাত্রি কুসুম। এই কবিতায় তিনি সম্পূর্ণ রোমান্টিক কবি হয়ে উঠেছেন। যেখানে যেখানে বলা হচ্ছে মধ্য রাতের কথা আর নীল পোশাকের কথা। একই সাথে রাত্রি কুসুম। মধ্যরাতের এক ভালোবাসার প্রিয় নীলাভ পরিবেশ ,যেখানে প্রেম নিবেদন করা যায় ।আসলে তিনি বলতে চেয়েছেন, গভীর প্রেমে যখন কবি যাপন করছেন তখন মধ্যরাতে তার প্রিয়তমার গোপন পলাশ দেখে ফেলেছেন ।আর পলাশ তো গোপনে রাখতে হয় । কিন্তু সে দেখে ফেলেছে সেই দেখাতেও যেন এক পরমপ্রাপ্তি ,অসীম শান্তি অনুভব করে।

কবি শুধু প্রেমের কবিতা লিখেছেন তাই নয়; তিনি কবিতার গভীর শব্দে প্রতিবাদ তুলে ধরেছেন। যেমন তাঁর 'মেধাস্কোপ' কবিতাটি পড়লে আমরা বুঝতে পারি কবি এর মাধ্যমে আসলে বোঝাতে চেয়েছেন কবি হয়ে ওঠা বা যে কোনো শিল্পী হয়ে ওঠা সহজ নয়। তার জন্য সাধনার প্রয়োজন। কিন্তু আমরা বর্তমান সমাজে যেন একটা ফাঁদ পেতে রয়েছি কাউকে তুলে ধরার জন্য অথচ সে গুণহীন। তাই তিনি বলেছেন,-

"মেধাস্কোপ
আমরা এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছি,
আপনাদের আর কঠোর পরিশ্রম করা লাগবে না।
পরিশ্রম শব্দটা ভুলে যান।
অমেধাবীরা মেধাবী হয়ে যাবেন,

যন্ত্রটি আমাদের মঞ্চেই থাকবে।
যার কবি হতে ইচ্ছে করে,
শিল্পী, গল্পকার অথবা সমাজসেবী,সাংবাদিক,
মেশিনের এক দরজা দিয়ে ঢুকবেন আর
অন্য দরজা দিয়ে বেরোবেন মেধাবী হয়ে,
পুরস্কার হাতে নিয়ে।
হয়ে যাবেন কবি, চিত্রশিল্পী মহা-মহা কথাকার।

মেধাস্কোপ যন্ত্রটা আমরাই মঞ্চে রেখেছি মেধাবী হওয়ার জন্য।" এখানে সমাজের কিছু ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রুপ ও প্রতিবাদ দদুইই কাজ করেছে।

'সুবর্ণ' কবিতায় তিনি লিখছেন,-

"গোপনে বসে আছি মুগ্ধ ধারাপাতে"

সুবর্ণ নদীর এই চরণের মাধ্যমে কবিতা সম্পর্কে আমরা ধারনা লাভ করতে পারি- জীবনের কোন মুগ্ধ ধারাপাতকে সাথে করে গোপনে বসে আছেন তা আমরা জানি না। আবার তিনি বলছেন,- সুবর্ণ ব্যথা ও ছন্দে। নদীকে ঘিরে সুবর্ণ নদীকে একটা প্রতীক হিসেবে তিনি ধরেছেন। নদীর যেমন জোয়ার ভাটা আছে তেমনি যদি আমরা জীবনকে তুলে ধরি আমাদের জীবনেও জোয়ার ভাটা আছে, । তাই সেই জোয়ার ভাটার ব্যাথাময় ছন্দময় কথাই হয়তো কবি তুলে ধরতে চেয়েছেন। আবারও বলতে হয় একই জমিতে সত্য-চরণে এমন ভাবে তিনি রচনা করেন বা চাষ করেন যার ফলে বিভিন্ন ফসল পাওয়া যায়, আর এখানে কবির কবিত্বের কৃতিত্ব।

'সহজ একটা সত্য' -এই কবিতায় তিনি লিখছেন, "রঙের নিচে শুয়ে আছি বলে
তোমাকে আর সাদা দেখি না
তুমি যদি সাদা হয়ে যাও
জগতটাকে সাদা দেখবে সহজে।"

-এখানে পেলাম কবির বাউল মনের পরিচয়। আমরা তাঁকে দেখেছি তিনি রঙিন নেশায় মজে থাকেন, রঙে ডুবে থাকেন। আবার তিনি বলছেন রঙের নিচে আছি বলেই আর সাদা দেখি না, কিন্তু তুমি যদি সাদা হয়ে যাও জগতটাকে সাদা দেখবে সহজে। সত্যিই তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন এই কবিতার চরণের মধ্যে। তিনি একদিকে যেমন তাঁর প্রিয় মানুষকে বোঝাতে চেয়েছেন, তেমনি সমাজের মনন-জগতকে সাদা হওয়ার মেসেজ দিয়েছেন এই কবিতার মাধ্যমে।

কবি প্রতিটি কবিতার মধ্যে যেন প্রবেশ করেছেন পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে। তাই তাঁর প্রায় প্রতিটি কবিতার প্রতিটি অনুচ্ছেদের মধ্যে ধারাবাহিকতা অথচ নতুন নতুন অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। যেমন তাঁর 'শিল্পী ও ভাস্কর' কবিতায় আমরা দেখতে পাই,-

"সমগ্র আকাশ নিয়ে বসে আছেন ভাস্কর
এক তাল পাথর তো নয় রাশি রাশি প্রাণ সমাহার
প্রাণ খুঁজতে খুঁজতে ঢুকে যাচ্ছেন পাথরের মধ্যে
পাথরকে জীবন্ত করতে

একটাই প্রলম্বিত জীবন ।
ভাস্কর অনন্ত বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।
.....
কোনটুকু বাদ দেবো রেখে দিয়ে
গড়ে তুলি জীবন্ত প্রতিমা।
কথা বলবে মনে মনে গেয়ে যাবে
চারুপাঠ ধারা স্রোত জীবনের সীমা।
কোনটুকু রেখে দিলে
মহাকাল কয়ে যাবে কথা।
কোনটুকু বাদ দিলে সীমাহীন সমীহ প্রকাশ।"

-এই কবিতায় কবি কী অসম্ভব কথা বলেছেন, আকাশ সমগ্র। এই সমগ্র থেকে ভাস্কর তার শারীরিক সত্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন পাথরকে কীভাবে তিনি জীবন্ত প্রতিমা বানাবেন সেই আশায়। কবি বলছেন কতটুকু বাদ দিলে শিল্পীর ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ করা হবে বা সেই পাথরপ্রতিমাকে সমীহ করা হবে এবং প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে বা প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। একই সাথে তিনি বলতে চেয়েছেন কতটুকু গ্রহণ এবং বর্জন করলে মহাকালের কথা হয়ে থাকতে পারে শিল্পীর সৃষ্টি, সেই ভাবনা তাঁর মাথায় যেন নক্ষত্ররাজির মত জ্বল জ্বল করছে। এখানেই শিল্পী এবং একজন কবি একাকার হয়ে যান। ভাস্করের ছবি যখন কবিতায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে তখন তা মহাকালের কথা হয়ে থাকবে। পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ করতে করতে প্রবেশ করেছেন এক একটি কবিতার নতুন নতুন অনুচ্ছেদে এবং নতুন অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

সর্বোপরি, কবি বাংলা কবিতা বা বাংলা কাব্যে ছন্দময় জগতের এক নতুন রচনাশৈলী আবিষ্কার করেছেন, যা 'ঋদ্ধিছন্দ' নামে পরিচিত। আশা করা যায় আগামী দিনে বাংলা সাহিত্যে এই 'ঋদ্ধিছন্দ' বাংলা কবিতাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে বা এক প্রগতিশীল উত্তরণ ঘটাবে।

কবি যখন চিত্রকর :

আঙুলের স্পর্শে রং তুলির আঁকাবাঁকা সারি কখন যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের বাস্তব চিত্র হয়ে মানুষের মনে ধরা দেয় তা হয়তো শিল্পী নিজেও জানেন না। কীভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে জীবন্ত করে তোলেন তা শিল্পী বাসুদেবের চিত্রকলাগুলি না দেখলে বিশ্বাসযোগ্য হয় না। তার জন্য তাঁর ছবিগুলি চাক্ষুষ দেখা দরকার। প্রসঙ্গত তাঁর আঁকা চিত্র অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে প'ড়ে যায় সুলতানি ও মুঘল আমলের চিত্রকরদের কথা। ইতিহাসে সাক্ষী আছে যে-সকল মুঘল শিল্পী এবং চিত্রকরের শিল্প-কাহিনী, সেই শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন পারস্যের তাবরিজের মির সঈদ আলি, সিরাজের খোয়াজা আব্দুস সামাদ, যার ছদ্মনাম ছিল 'শিরিন কলম' অর্থাৎ 'মিষ্টি কলম', দশবন্ত এবং বসওয়ান। এই সময়ের শিল্পীদের ছবিতে যেন প্রাণহীন বস্তুও প্রাণ পায়, তা ঐতিহাসিক তথ্য থেকে প্রমাণিত। হ্যাঁ এই শিল্পীদের সাথে উত্তর আধুনিক যুগের অনন্য চিত্রকর বাসুদেবের তুলনা করা যেতে পারে, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বর্তমানে নিরপেক্ষ বিচারে আঁকার দক্ষতায় বাকি সব শিল্পীদের তিনি যে ছাড়িয়ে যেতে

পারেন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর এক একটা চিত্র যেন দণ্ডায়মান বাস্তবতা। আশেপাশে কোথাও পাহাড় কিংবা সাগর নেই কিন্তু চোখের সামনে যেন ভেসে উঠছে তাঁর চিত্রে পাহাড় আর সাগর। কোথাও চাঁদ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না অথচ সাগরের ঢেউয়ের উপর চাঁদের আলো যেন এক স্বর্গীয় দৃশ্য বলে মনে হয়। আবার কোথাও পরিবার নেই ছবির মধ্যে মধ্যবিত্ত পরিবারের চিত্র প্রতিভাত হচ্ছে। আবার কোথাও বা কোনো আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে চলেছে অনন্ত জিজ্ঞাসা, অসংখ্য কৌতুহল নিয়ে অগণিত জনসাধারণ। তাঁর চিত্রকলার মধ্যে 'ধ্রুপদ সিরিজ' এবং 'হলুদ সিরিজ' এর চিত্রকলা যদি কোনো মানুষ দেখেন তাঁর ছবির প্রতি একটা ভালোবাসা জন্মাবে এটা নিশ্চিত বলা যায়। শুধু তাই নয় ; তাকে ভাবতে শেখাবে, চিন্তা করতে শেখাবে সেই ছবিগুলি। আসলে প্রতিটা ছবি যেন বাস্তবতার মূর্ত প্রতীক। মুঘল আমলের বিশেষ করে আকবরের সময়ে বিভিন্ন বইতে যে ছবি আঁকা শুরু হয় একদিকে সূক্ষ্ম হস্তলিপি এবং ছবি দিয়ে বইয়ের পৃষ্ঠাকে সাজানো হতো। আকার এবং আয়তনে ছোট ছবিগুলোকে মিনিয়েচার বা অনুচিত্র বলা হত। যেখানে সোনার রং এবং অন্যান্য রঙের ব্যবহার হতো এবং পৃষ্ঠাগুলি যেন জ্বল জ্বল করে উঠত। ঠিক তেমনি চিত্রকর ড. বাসুদেব মণ্ডলের অনেক চিত্র মুঘল আমলের ছবিগুলিকে মনে করিয়ে দেয়।

আবার শিল্পী যখন তাঁর কবিতায় লেখেন,

"একটা বৃক্ষ কোটরে
যে শন শন আওয়াজ বয়ে যায়
তাকে আমি রঙে ধরতে পারি না ব'লে.....
সে জ্বালা কী করে বোঝাই! ..."

ভাবতে অবাক লাগে এখানে শিল্পীর কোন্ মহতী শিল্পচেতনা অনুভবে বিরাজ করে! রং তুলিতে অবগাহন করতে করতে গাছের পাতারা শন শন করে কী কথা বলে সেটা তুলে ধরতে চান ক্যানভাসে। কিন্তু কবি সেটা পারেন না। সেই বেদনাও তাঁকে কাঁদায়! এখানেই বোঝা যায় শিল্পী কোন্ অসীমকে ছুঁতে চান বা শিল্পের কোন্ উচ্চ মার্গে উত্তীর্ণ হতে চান। আসলে এ-ক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথকে মনে করতে পারি। তাঁর প্রেম পর্বের অনেক গান শুনলে মনে হয় পূজা পর্বের গান। ঠিক একইভাবে পূজা পর্বের অনেক গান শুনে মনে হয় সেটি বোধহয় প্রেম পর্বের গান। আসলে এই পূজা এবং প্রেম-পর্ব রবীন্দ্রনাথের কাছে বেশিরভাগ সময়ই পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। ঠিক তেমনি কবি ও চিত্রশিল্পী বাসুদেব মণ্ডলের কবিতা আর ছবি একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। কখন যে একজন কবি আপন মনে শব্দ দিয়ে ছবি এঁকে ফেলেন তা তিনি জেনেও যেন জানেন না। অথচ একাগ্রচিত্তে সেই কাজটিই করে চলেছেন। কীভাবে কবিতা আর ছবি এক প্রাণ হয়ে ওঠে তা তিনি তাঁর 'ছবির ভাষা কবিতার ভাষা' গ্রন্থটির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

সর্বোপরি শিল্পীর চিত্রকলা সম্পর্কে যে কথাটি না বললেই নয় তাহল, তিনি যেমন কবিতা লেখার সময় ছন্দ ভাঙার খেলা করেছেন আবার নতুন ছন্দ গড়ে তুলেছেন। প্রতিটি অনুচ্ছেদই নতুন নতুন ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ এর মাধ্যমে ঠিক তেমনি ভাবেই তার চিত্রকলার ক্ষেত্রেও রং তুলি নিয়ে পর্যবেক্ষণ- পরীক্ষণের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছেন। রং -তুলি নিয়ে

ছবি আঁকতে অনেকেই পারেন কিন্তু রং নিয়ে ভাঙতে বোধহয় সবাই পারেন না। একমাত্র তিনিই পারেন যিনি রঙকে ভালবাসতে জানেন। আর শিল্পী বাসুদেব সেই রং নিয়ে এক দর্শন সৃষ্টি করেছেন। তাঁর আঁকা ছবিগুলি দিয়ে যেন বেরিয়ে আসতে চায় এক একটি বাস্তবতা তথা মুহূর্ত প্রতীক। তাঁর আঁকা ছবি দেখলে যে কোনো কবির কলমে আসবে ভাষা, গড়ে উঠবে কবিতার ঘর। কেননা ছবিতাও কবিতা হয়ে ওঠে ঠিক তেমন কোনো কবির কবিতা একটি দৃশ্যপট হয়ে আমাদের দৃষ্টির আলোয় ধরা দেয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে শিল্পীর আঁকা 'ফিরে এসো চাকা' চিত্রকলা ।কবি বিনয় মজুমদারের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'ফিরে এসো চাকা'-র ভাবনার ওপর তাঁর রং তুলির যে চলন্ত কাজ তথা ঘূর্ণায়মান চাকার লক্ষ্য ভেদ করে অদৃশ্যমান যাঞ্জসেনীকে উদ্ধার করার গল্প ছবির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে তা আমাদের সত্যিই অবাক করে, তা ভাষায় অবর্ণনীয় । না দেখলে বোঝা যায় না শিল্পী ফিরে এসো চাকার ভাবনাকে নটি পর্যায়ে কীভাবে নতুন নতুন দৃশ্য সহযোগে তুলে ধরেছেন। ঠিক যেমন তার কবিতার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণ চলে, রং তুলি নিয়েও একইভাবে পর্যবেক্ষণ- পরীক্ষণ করে তিনি ছবির বাস্তব রূপ দেন ।হয়তো এই দৃশ্যমান আঁকার জন্যই দেশ একদিন গর্ববোধ করবে শিল্পী বাসুদেব মণ্ডলকে নিয়ে।

সঙ্গীত ও সুরসাধক বাসুদেব:

শুধু বাংলা কবিতা কিংবা রং-তুলিতে আঁকা ছবি নয় বা ক্যানভাসে আঁকা ছবি নয়; তিনি একই সাথে ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছেন একজন সংগীতশিল্পী এবং সুর সাধক। তার রচিত অনেক গানের মধ্যে ২০২৩এর ১৩ই জানুয়ারিতে লেখা এই গানটির রচনা ও সুর দান এক ভালোবাসার ঘর স্থাপন করে - "এসো হে মোহর এসো হে ..."গানটি শুনলে বোঝা যায় স্বয়ং গীতিকার হিসেবে এবং সুরকার হিসেবে তাঁর প্রতিভা তার মেঠো সুর মানুষের মনে ধাক্কা না দিয়ে পারে না।

আবার যখন তিনি কোনো এক শিবরাত্রির সন্ধ্যায় গেয়ে ওঠেন,-

"তোমার বুকের সিংহাসনে
বসি আমি আপন মনে
বাজাই দাদরা আর কাহারবা...।"

সত্যিই এই মৌলিক সুর শুনলে সারা জীবন বেজে উঠবে পৃথিবীর প্রতিটি ভালোবাসার মানুষের কানে কানে।- একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। কিংবা মাকে স্মরণ করে গীত রচনা করেন ও সুর সৃষ্টি করে গেয়ে ওঠেন,

"...তোমার চরণে রাখি মাথা, সেই চরণে লুকায় ব্যথা
তোমার জন্য যত ব্যথা ঠাই যেন পাই চরণে,
মা তোমার রাঙা চরণে
রেখো স্মরণে।।
কালী দুর্গা বুঝি নাকো
তুমি আমার হৃদয়ে থাকো... "

তিনি মাকে দুর্গা কালী কিংবা কোন নামধারী দেবতা বলে জানেন না । অথচ সেই 'মা' তাঁর হৃদয়ে থাকে। মায়ের প্রতি এই যে গভীর শ্রদ্ধা, ভালবাসা তা তিনি বুঝিয়েছেন তাঁর এই গানের চরণগুলির মাধ্যমে। যত ব্যথা তোমার চরণে

লুকায়। তুমি রেখো স্মরণে আর আমার হৃদয় থেকো -এই যে উচ্চারণ কবিকে গভীর এক উপলব্ধিতে নিয়ে যায় এবং এখানেও যে সুর বেঁধেছেন তা নিঃসন্দেহে মৌলিকত্বের দাবি রাখেন।

আবার শুধু গীতিকার কিংবা সুরকার হিসেবে কেন তার বাদ্যযন্ত্রের সুর বিশেষ করে তার ভায়োলিনের সুর, এস্রাজের সুর কিংবা মৃদঙ্গের (শ্রী খোল) সুর কানে গেলে মানুষকে থমকে দাঁড়িয়ে একবার পিছন ফিরে তাকাতে হবে সে সুর শোনার জন্য- এ কথা গর্বের সাথে বলা যেতে পারে। তিনি নিজেই লেখেন, "ছন্দহীন সময়ে তারের সাথে ছন্দবিহীন যাপন" একথাও বলেন, বহির্জগত যখন জ্বালা দেয় তখন বাদ্যযন্ত্র রং কবিতাই তাঁর উপাস্য হয়ে ওঠে,তাঁর সৃষ্টি সুর বাস্তবের সব দুঃখ- বেদনাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে এক স্বর্গীয় সুর -মূর্ছনায়; মন ছুঁয়ে যাওয়া আবেদন যে সুরে বাজে তাতে পরাজিত হয় যত যন্ত্রণা যত দুঃখ ! আর বাঁচার স্বপ্নরা বেঁচে থাকে। এস্রাজ যখন বান্ধব হয়ে ওঠে তখন তিনি আপন হৃদয়ের সাথে খেলা করে সুর সৃষ্টি করেন ঠিক যেমন বিনয়ী বাসুদেবের মনে আছে বিনয়। তাঁর ব্যথায় তাড়িত হয়ে তিনি যখন এস্রাজ বাজান তা যেন পৃথিবীর হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়, আনে ব্যথার উন্মাদনা, তখন তিনি শুধুই এস্রাজের তারের সাথে কথা বলেন আর সৃষ্টি হয় সুরের গর্ভে নতুন এক সুর ঠিক যেমন কবিতার গর্ভে নতুন এক কবিতার জন্ম হয়। এক অনাবিল মুগ্ধতা বোধ হয় সে সুরে ।আবার একই সুরে জেগে ওঠে গুরুদেবের শান্তিনিকেতন...

এ হেন মানুষটি নিজের মনে নিজের ক্ষেত্রে বিচরণ করেন নিমগ্ন হয়ে, অন্তর্মুখী হয়ে ।

অন্যান্য দিক:

এসবের পর রয়ে যায় তাঁর একাডেমিক কৃতিত্বের কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ছিলেন তিনি। যার পুরস্কার স্বরূপ অর্জন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত 'মডার্ন পোয়েট্রি ও ক্রিয়েটিভ রাইটিং 'এ তিনটি চ্যাম্পিয়ন স্বর্ণপদক। তাঁর কবিতা গ্রীক, ইতালি এবং ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে । অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে গ্রিক কবি ও সাহিত্যিক দেশপিনা আফগুস্তিনাকি, গ্রীক ভাষাবিদ ও পণ্ডিত উজ্জ্বল ঘোষ, ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ করেছেন কবি ও সাহিত্যিক লুইগি ভিসসিগ্ গলিয়া, বাংলাদেশের বিশিষ্ট অনুবাদক ও উপন্যাসিক সোহরাব সুমন ।আর শিল্পী বাসুদেবের ছবিকে যিনি বিচারকের দৃষ্টিতে যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান থেকে যশস্বী শিল্পী ও চিত্রগ্রাহক নম্রতা খাদকা কাঠি (Namrata Kafka kathi)। তিনি 'বীণাপাণি' সম্মান 'অনন্য শিল্পী' সম্মান এবং কবি 'করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়' পুরস্কার পেয়েছেন ।অর্জন করেছেন 'কথাকলি' সম্মান। অখিল ভারতীয় সংগীত ও সাংস্কৃতিক সংসদের পক্ষ থেকে কৃতি সম্মাননা পেয়েছেন। আবার চিত্রকূট আর্ট গ্যালারিতে গ্রহণ করেছেন শিল্পী সম্মাননা ।শিল্পী তাঁর অনন্য শিল্পকর্মের জন্য বেঙ্গল আর্ট ফ্যাক্টরির পক্ষ থেকে গগনেন্দ্র প্রদর্শনশালায় ও ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্সে অতিথি শিল্পী হিসেবে তিনবার সম্মানিত হয়েছেন । এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'সাহিত্য একাডেমী' থেকে একাধিকবার আমন্ত্রণ পেয়েছেন। তিনি অ্যাসোসিয়েট এডিটোরিয়াল মেম্বার অফ

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল ইন্টিগ্রেটেড রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (U.G.C Recognized and peer-reviewed, ISSN 2321-5062)। এছাড়া তিনটি ISSN যুক্ত পত্রিকা ও একটি ISO যুক্ত পত্রিকাসহ বেশ কিছু লিটল ম্যাগাজিন পত্রিকার মূল কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও আর্ট ডিরেক্টর হিসেবে যুক্ত রয়েছেন।

তাছাড়া বেশ কিছু দৈনিক পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে বহুবার তাঁর শিল্পকর্ম নিয়ে কলম ধরেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আনন্দবাজার পত্রিকা, গণশক্তি, আজকাল, এবেলা- ওবেলা, সুখবর, কবি সম্মেলন, রিভিউ- প্রিভিউ, আরম্ভ ম্যাগাজিন, দৌড়, শিল্পনীড়, বাল্মিকী, আত্মশক্তি, পুঁইমাচা, পত্রপুট, চিন্ময়ী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বনমালী নন্দী অনন্য বাসুদেব ও রামধনু রং নামে একটি গবেষণা গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। সেখানে দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট লেখকরা তাদের মূল্যবান লেখায় বাসুদেবকে আবিষ্কার করেছেন, গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ লিখেছেন। অর্থাৎ তাঁর শিল্পকর্মকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে কলম ধরেছেন দেশ- বিদেশের বিশিষ্ট গুণীজনেরা। এ প্রসঙ্গে প্রাজ্ঞ গবেষক ড. সন্দীপ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'বাসুদেব মন্ডল: তার অনশ্বর নন্দন বলয়', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. তরুণ মুখোপাধ্যায়ের 'বাসুদেব মন্ডল-এর কবিতা শব্দে আঁকা ছবি' বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক, গবেষক ঢাকা বাংলা একাডেমির গবেষণা পরিষদের উপ-পরিচালক ড. তপন বাগচির 'জয়তু কবি বাসুদেব মণ্ডল', ঢাকার (বাংলাদেশ)সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির বিশিষ্ট অধ্যাপক ড.সন্দীপক মল্লিকের 'চৈতন্য মুগ্ধতার আভরণ : বাসুদেব মণ্ডলের কবিতা' সাম্প্রতিক সময়ের বিশিষ্ট লেখক ও চলচ্চিত্র সমালোচক শ্রী তন্ময় দত্তগুপ্তের 'আমার মুক্তি রঙের আলোয় : বাসুদেব মণ্ডলের চিত্রকলা কবিতা', কবি ও প্রাবন্ধিক অনিমা মিত্রের 'কত সুরে সুরে তুমি বেজে যাও কবি : বাসুদেবের কবিতার প্রেম মনস্তত্ত্ব' প্রবন্ধগুলি উল্লেখের দাবি রাখে।

কবি, চিত্রকর, গীতিকার এবং সুরকার হিসেবে বাসুদেব মণ্ডল একদিন মানুষের মনের মাটিতে স্থান করে নেবে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। তিনি সহজ, সরল অথচ এক সৃজনশীল মানুষ। তার সম্পর্কে যে কথাটা বলে শেষ করব তা হল তিনি একদমই শহরমুখী নন, তিনি মফঃস্বলের সাধারণ মানুষের পাশে থাকবেন বলেই তার পেশাগত জীবনকে বেছে নিয়েছেন মফঃস্বলের মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজকে। আজ প্রায় আঠারো বছর ধরে তিনি অধ্যাপনা করছেন। শুধু তাই নয়; তিনি ভারত সেবাশ্রম সহ কয়েকটি সেবামূলক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং ব্যক্তিগতভাবেও তিনি মানুষের সেবা করেন নিয়মিত। কবি যখন রবীন্দ্রনাথের বাইশে শ্রাবণের পটভূমিতে রং -তুলিতে তা তুলে ধরেন সে যেন এক অপরূপ মূর্ত প্রতীক - বিকেলের রোদ পড়ে যাওয়া মেঘলা আকাশের দিকে তাকালে আর কবির আঁকা ছবির দিকে তাকালে বোঝা যায় না কোনটি আসল আর কোনটি নকল। রং,তুলি আর কবিতার ছন্দ মিলেমিশে কখন যে কবির মনে এক বর্ণময়-মায়াময় কবিতার সংসার গড়ে উঠেছে তা কবি নিজেও জানেন না। আবার একই ভাবে তা জীবন্ত চিত্র হয়ে মানুষের দৃষ্টিতে আলোর ছটা ছড়িয়ে দিয়েছে তাও কবির জানা নেই। তিনি শুধু আপন মনে শিল্প-সৃষ্টি করে যান।

সর্বোপরি কবির বিচরণ কবিতা-রঙ-তুলি, কবি যেন সময়ের পেছনে ছুটেন না; সময়ই যেন কবির পেছনে ছুটে যায়। তিনি যে শুধু নিজের দেশেই সমাদৃত তা নয়, তিনি বিদেশেও সমভাবে সমাদৃত। এক কথায় আন্তর্জাতিক স্তরেও শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি পরিচিত মুখ বাসুদেব মণ্ডল। তাই এই মানুষটির জন্য আন্তরিক শুভকামনা, ভালো থাকার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করি এই বলে যে , আগামীর দিনগুলিতে তিনি বাংলা সাহিত্যে, চিত্রকলা সহ জীবনের নন্দনতত্ত্বে সমাজের জন্য রেখে যান আরও আরও অনেক সৃষ্টিকর্ম। তাঁর মাথার ওপর ঝরে পড়ুক সকলের আশীর্বাদ। তাঁর বহুবিধ সৃষ্টি কর্মের জন্য শাঁখ বাজানো যায়, হুলুর ধ্বনি দেওয়া যায়। কবি, চিত্রকর ও সঙ্গীত সাধক সুরকার এবং গীতিকার সুস্থ থেকে সৃজনশীল শিল্পে আরও দীর্ঘ পথ এগিয়ে চলুন। আগামীর নতুন ভোরে যখন নতুন সূর্য উঠবে তখন বাসুদেব মণ্ডলের মঙ্গল কামনায় মানুষ গেয়ে উঠবেন,

"কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা ।।
আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা ..."।

জঙ্গলের বাউল মধুমিতা বেতাল

মৌপর্ণা মুখোপাধ্যায়

জঙ্গল মহলের উদাসীন বাউল মধুমিতা বেতাল। শাল মহুলের ঘ্রাণ মেখে, জীবনের একতারাতে টান দিয়ে নৈঃশব্দের বুক চিরে পথ খুঁজেন কবি। অনিন্দ সুন্দর জঙ্গলমহলের নির্যাসকে ছেনে নিয়ে শব্দের বর্ণমালায় ভরিয়ে তোলেন সাজি। তার 'বৈরাগীর কন্যভাস' এ মেঠোপথ, পুকুরঘাট, কুসুমতল কখন যেন নিঃশব্দে চলাফেরা করে। আবার কোনো ফাঁকে, "চাঁদ এসে বসে গেল/খুব কাছে, নিঃশ্বাসে, নিঃশব্দে", সেখানে "চোখে ছিল পরিজাতের সাম্রাজ্য/মুখে কবিতার অমল গন্ধ।" বৈরাগীরও শরীর আছে, আদিমতার উত্তরণের মাঝখানে কোথাও রাধা যেন হ্লাদিনী হয়ে বলে এসো, "এবার শরীরে সরোবর আঁকি"। আবার মেয়েবেলার গন্ধ দিগন্ত ছাড়িয়ে, "গোধূলী মাখা সমুদ্রের বুকে তুলি ফেলে", সেখানে কবি বলেন, "আঁচলে বাতাস ছেঁকে অনেক ধরেছি বিকেল।"

রাজনৈতিক পটভূমি কবির হৃদয়ে যেন গাঁইতি শাবল চালায়। সচেতন অন্তর্দৃষ্টির ক্যানভাস এ ধরা পড়ে তার শান বাঁধানো গল্প। উঠে আসে প্রতিবাদ। যেখানে কবি এক অন্তর্লীন মায়াবুননের মাধ্যমে কোথাও যেন আড়চোখে দেখেন নদীর শুকনো বালুর চর। তবুও তো ইচ্ছে করে সমুদ্রের মত উত্থাল পাতাল হতে। যেখানে, "কয়েকটা পাখিও উড়ে যাবে সূর্য ছুঁতে।" ভিজে যাবে উঠোন, গোধূলী রঙে নেমে আসবে ঝিরিঝিরি কান্না। বুকচাপা যন্ত্রনাতেও কবি বলেন, "ওপাড়ের আলো ভেঙে যদি / গড়িয়ে পড়া রোশনাই / এ দেহ ছুঁয়ে ম্লান হতে চায়" তখন তৈরি হয় কুন্ডলিকা আগুন, পৌষালো বৃষ্টি, হিমঝরা রাত্রি, গড়িয়ে পড়া মহুয়াবেলা আর পলাশ ছোঁওয়া মাধুকরী। প্রেম, হতাশা, যন্ত্রণা, সমাজ, অর্থনীতি এবং তার

দ্বন্দ্বকে ছাপিয়েও কবির কথায় উঠে আসে মিথ, রূপকথা, স্বপ্নের পঞ্চতন্ত্র আর যুগান্তকারী প্রেমকথা। তবুও তো হৃদয়ের মাঝখানে তুষের আগুন জ্বলে যেখানে পাড়হীন ঝিলে আটকে যায় কফিনবন্দি যন্ত্রণা।

মধুমিতা বেতালের কবিতায় রূপক, বাকপ্রতিমা এবং বুনন অসম্ভব রকমের ঐশ্বর্যকে বহন করে। যেখানে মাধুর্যের মাধুকরী পানপাত্র হাতে বলে আরোও ঢালো, প্রেম সুরায় তৃপ্ত হোক প্রকৃতি পুরুষ। তাই 'বৈরাগীর ক্যানভাস' কোথাও যেন শরীরের গন্ধ ছুঁয়ে ছুঁয়েও। অমৃতলোকের যাত্রী। 'বৈরাগীর ক্যানভাস' এক নিরুচ্চারিত 'তুঁহু মম শ্যাম সমান।' নদীর পাড় ছুঁয়ে যাওয়া গল্পকথা, যেখানে ঝিরিঝিরি শব্দ বাতাসের কানে কানে বলে, এ আকাশ আমার, চাঁদ আমার, আমি বেঁধেছি নৈঃশব্দকে। আর অন্তরলোকের গহীন শব্দকে। শব্দের মায়াজালে গেঁথেছি হৃদয়ের ঝর্ণাকে।

খাবারে সুস্থ থাকা

নারায়ণ মাহাত

পেয়ারা (Presidium Guava / Ficus Eraica) :

পারেবত, বৈরত, আরেকবতক, মধুফল, অমৃতফল ও পারেবতক - এই ছয়টি নাম পর্যায়ক শব্দ। Guava এর ইংরেজি নাম। কুড়মালিতে একে বলে আঞ্জির। এটি একটি ফলদার গাছ IP পেয়ারা গাছের ফল, ফুল, পাতা, ছাল ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এটি মূলত বায়ু দোষ নাশক খাবার। এই ফলের প্রয়োগ মাত্রা- এক তোলা থেকে দুই তোলা-বার থেকে চব্বিশ গ্রাম পরিমান। এটি ব্যবহার করার উপযুক্ত সময় সকালবেলা জল খাবারের পর অথবা দুপরের পর। অতিসার রোগে বমন, শিশুর অতিসার, ক্ষত, দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত ঝরা দাঁতের ব্যথা, তৃষ্ণা জ্বর, আমাশা, মূর্ছা, ভ্রম ক্লান্তি, বহুমুত্র, মল বদ্ধতা গর্ভকালীন সংক্রমণ, মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত ইত্যাদি রোগ অসুখে পেয়ারা উপকার সাধন করে।

বাতাবিলেবু (Citrus Decumana) :

মধুর ও মধুকর্কটি হল বাতাবিলেবুর নাম পর্যায়। এটি এক প্রকার বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। এর ফলই খাবার ও পানীয় হিসাবে কাজ করে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলা ভাল পরিপক্ক। বাতাবি লেবুর রস পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা দরকার। বিশেষ ক্ষেত্রে এর শিকড়ের ব্যবহার প্রচলিত। এই লেবু প্রধানত বায়ু নাশক ভেষজ গুণের অধিকারী। এর প্রায়োগিক মাত্রা- আধ থেকে এক তোলা -ছয় থেকে বার মিলি লিটার/গ্রাম। বাতাবি লেবু ক্ষুধামান্দ্য, শ্বাস, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, হিক্কা, কোষ্ঠবদ্ধতা, শূল, যকৃত-প্লিহা রোগ নিরাময় করতে পারে। সকাল

ও দুপুর বেলার আহারের পর এটা ব্যবহার করার উপযুক্ত সময়। পানীয়/সরবৎ আকারেও এটি বেশ কাজের। এর চাটনি ব্যবহার করলেও পানীয়ের মতোই কাজ করে।

কমলালেবু (Citrus Aurantium) :

নারঙ্গ, নাগরঙ্গ, ত্বকসুগন্ধ, মুখপ্রিয়। এগুলো কমলালেবুর এক একটি নাম পর্যায়। কমলা লেবুকে ইংরেজিতে Orange বলে। এটি একটি বৃক্ষ জাতীয় ফলদার ভেষজ উদ্ভিদ। এর পাকা ফল খাবার হিসাবে ব্যবহার করতে হয়। কমলালেবু ত্রিদোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) নাশক ভেষজের অন্যতম। সাধারণভাবে এর প্রায়োগিক মাত্রা-দু থেকে তিন তোলা-চব্বিশ থেকে ছত্রিশ গ্রাম পরিমান। দৈহিক দৌর্বল্য, শান্তি, ক্রিমি, শূল, আমদোষ, ক্ষুধামান্দ্য, অরুচি, তৃষ্ণা, যকৃতদোষ, অপুষ্টি ইত্যাদি রোগ নাশক ভেষজ (খাবার ও পানীয়) হিসাবে বেশ নামজাদা। নামকরা। এটি সকাল ও দুপুরের আহারের পর ব্যবহার করার উপযুক্ত সময়।

পাতিলেবু (Citrus Limetta):

নিম্নরক্তচাপ স্বাভাবিক রাখে। নিয়মিত পাতিলেবু সেবন করলে কোষ্ঠকাঠিন্য, সাধারণ সর্দি, পেটের ঘা, রক্তার্শ দূর হয়। লাল (র) চায়ের সঙ্গে পাতি লেবুর রস মিশিয়ে ব্যবহার করলে গলরোগে উপকার পাওয়া যায়। লেবু পাতা দিয়ে লাল চায়েও গল রোগে প্রায় একইরকম ফল পাওয়া যায়। এই চা সর্দি-কাশিতেও উপযোগী। লেবুর খোসার প্রয়োগে (বাহ্যিক) ঘা সারে। ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে, কেশ রোগ এবং চর্ম রোগ সারাতে লেবুর রস বেশ কাজ করে। পুরাতন কফ-কাশিতে পাতি লেবুর রস, ঘি ও গোল মরিচের মিশ্রণ প্রয়োগ পরম্পরা স্বাস্থ্য ধারায় এক উল্লেখযোগ্য এবং বহুল প্রচলিত বিধান। মিশ্রণটি (শতকরা উনপঞ্চাশ, উনপঞ্চাশ ও দুই ভাগ) হাল্কা আঁচে ফুটিয়ে লেহন ও প্রলেপন দু-ভাবেই ব্যবহার করতে হয়।

জাম (Eugenia Jambolana) :

জম্বু, সুরভিপত্রা, নীলফলা, শ্যামলা, মহাস্কন্ধা, রাজফলা, শুকপ্রিয়া - এগুলো জামের এক একটি নাম। Black Plum এর ইংরেজী নামান্তর। এটি বৃক্ষ শ্রেণীজাত একটি ভেষজ উদ্ভিদ, যার ফল, ফুল, বীজ, ছাল, পাতা ওষুধ হিসাবে কাজে লাগে। খাবারে ভাল থাকার কাজে ফল হিসাবে এটির প্রয়োগের কথাই এখানে বলব। এর সুপক্ক ফল দুই থেকে তিন তোলা-বার থেকে চব্বিশ গ্রাম ব্যবহার করতে হয়। ব্যবহার করার উপযুক্ত সময়, সকাল বেলার জল খাবারের পরে অথবা দুপুর বেলার খাবার খাওয়ার পর। এটি রক্ত শর্করা রোগে ভাল থাকার একটি দারুণ উপায়। অসময়ে,-যখন ফল পাওয়া যায় না, তখন পাকা জাম এর বীজ চুর্ণ ব্যবহার করলেও এ রোগে ভাল থাকা যায়, নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। দুই থেকে তিন গ্রাম মাত্রায় ওই বীজ গুঁড়ো ব্যবহার করতে হয়, সকাল বেলা খালি পেটে। রক্ত শর্করা ছাড়াও আমাশা, পাতলা পায়খানা, বিষাক্ত পচা-কাটা ঘা, শয্যামূত্র বমন সদ্যব্রণ, প্রদাহ, বায়ুবিকার সারানোর কাজেও জাম উল্লেখযোগ্য উপযোগ সাধন করে। প্রদাহ নিবারণের ক্ষেত্রে জাম সেবন ও প্রলেপন উভয় বিধি প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

কাঁঠাল (Artocarpus Integrifolia/Hetrophllus) :

কন্টকিফল, অতিবৃহৎ ফল, -এগুলো কাঁঠালের নাম পর্যায়। ইংরেজিতে The

Jack Tree। এটি একটি বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। এটি বায়ু ও পিত্ত নাশক গুণ সম্পন্ন খাবার। এর সাধারণ প্রয়োগ মাত্রা = এক থেকে চার তোলা = বার থেকে আটচল্লিশ গ্রাম পরিমান। অপুষ্টি, কৃশতা, ক্ষত ও ব্রণ, মূত্র কৃচ্ছতা, ক্লান্তি, প্রদাহ, শুক্রাল্পতা ইত্যাদি রোগ নিরাময় করতে পারে এই ফল। কাঁচা বা পাকা কাঁঠাল উভয়ই খাবার হিসাবে বেশ কাজের। তবে, এটি গুরুপাক খাবার। পাকা কাঁঠাল বীজ খাবার হিসাবে শ্রেয় বিবেচনা করা হয়। পাঁচ মিশালি সব্জিতেও এ বীজ ব্যবহার করা যায়। কাঁঠাল বীজের গুঁড়ো আটার সঙ্গে রুটি বানিয়েও ব্যবহার করা যায়। এই বীজ গুঁড়ো খিচুড়ি তৈরীতে ব্যবহারে অপুষ্টি দূর করা যায়।

পেঁপে (Carica Papaya) :

"খাবারে সুস্থ থাকুন" এই পর্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল। পারিশ, পপিতা এর নামান্তর। এর পারস্পরিক কুড়মালি নাম পিফা। একটি একটি ফলের গাছ। পথ্য হিসাবে এর বহুল প্রচলন। এটি দ্বিদোষ (বায়ু ও পিত্ত) খাবার। এর ব্যবহারিক পরিমান এক থেকে দুই তোলা অর্থাৎ বার থেকে চব্বিশ গ্রাম। খাবার হিসাবে এর থেকে বেশী পরিমান খেলে কোনও সমস্যা নেই। অজীর্ণ, ক্ষুধা মান্দ্য, অরুচি, রক্তপিত্ত, অর্শ, জ্বর, ইত্যাদি নিরাময় করতে খাবার হিসাবে এটি বেশ উল্লেখযোগ্য একটি উপায়। দুপুরবেলার খাবারের সঙ্গে একটি খাওয়া দরকার। পেঁপে নিম পাতার ছেঁচকি অরুচি নাশ করার এক সহজ উপায়। এটি দুপুরবেলার আহারের প্রথমার্ধে ব্যবহার করতে হয়। সর্ষে দিয়ে পেঁপের ঝালও (গোলমরিচ সহযোগে কাজে বেশ কাজ করে। দুপুরের খাবার খাওয়ার পর এক ফালি কাঁচা পেঁপে সামান্য সৈন্ধব নুন মিশিয়ে খেলে দারুণ কাজ করে। কাঁচা ও পাকা উভয় পেঁপেই রক্ত পিত্ত নাশ করে। পেঁপে সিদ্ধ ও তরকারিও এক্ষেত্রে এক উপযোগী খাবার। অর্শরোগ নিরাময়ে এটি এক বিশেষ খাবার। পেঁপের আঠার সঙ্গে হলুদ গুঁড়োর প্রলেপ ব্যবহার করলে অর্শের বলি সারাতে সাহায্য করে। অপুষ্টি নিবারণ করতে পেঁপে এক সেরা খাবার। অতুলনীয় এর পুষ্টিগুণ। এ ছাড়াও পেঁপে বহু গুণের আধার। এর একটি অনন্য সুন্দর নাম "অমৃতভাণ্ড"। ১৫ আগস্ট ১৯৯৭ তারিখে আমার লেখা "অমৃতভান্ড পেঁপে" শিরোনামে একটি কবিতা ২২শ বর্ষ সংখ্যা: পৌষ ডিসেম্বর, ০৪ জানুয়ারী ২০০৫ তারিখে "তুলসী চন্দন" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটি এখানে প্রিয় বন্ধু-পাঠকদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম,-প্রাসঙ্গিকতার খাতিরে:-

পারীশের আর এক নাম পপিতা ফল
আয়ুর্বেদে পারীশ বলে অভিযোগ
সংস্কৃতে পপিতাফল
ওড়িয়াতে অমৃতভাণ্ড
বাংলাতে পেঁপে বল।
কাঁচা-পাকা সব পেঁপেতে
বল-বীর্য টলমল
রুচি যোগায় হজম বাড়ায়
পেটের রোগে ওষুধ বল।
প্লিহা রোগ আর গুল্ম রোগে

অতি সহজ উপশম
পেঁপের আঠার ফোঁটা
সঙ্গে পাকা কলা বল।
ব্রনো আঁচিল জিভের ঘায়ে
পেঁপের আঠা লাগালে
অন্যথা হবে না ভাই
পাবে অতি ভাল ফল।
কাঁচা পেঁপে তিক্ত-কসায়
পাকা পেঁপে মধুর হয়
খাদ্যগুণে পরিপূর্ণ
তাইতো তরকারিতে বল।

নারকেল (Cocos Nucifera) :

নারিকেল, লাঙ্গলি, কুর্চশীর্ষক, তুঙ্গ, স্কন্ধফল, তৃণ রাজ, সদাফল, শীলতরু, মঙ্গলা, শিরাফল, পয়োধরা, কৌশিকফল, ফল কেশর, বরফল ইত্যাদি এর নামপর্যায়। Coconut Tree এর ইংরেজি নামান্তর। নাইড়কল এর কুড়মালি নাম। এটি সউচ্চ বৃক্ষ শ্রেণীর ভেষজ উদ্ভিদ। খাবার হিসাবে এর ফুল, ফল, মাতি ও তেল ব্যবহার করা হয়। এর ব্যবহারিক সাধারণ মাত্রা - এক থেকে দুই তোলা-বার থেকে চব্বিশ গ্রাম/মিলি লিটার পরিমান। বয়স ভেদে এই ফলের খাদ্য গুণের প্রকাশ ঘটে। তবে, সাধারণভাবে নারকেল বায়ু ও পিত্ত এই দুই দোষ নাশক গুণের অধিকারী। কচি অবস্থায় অর্থাৎ ডাবের জল স্নিগ্ধ, শীতল, তৃপ্তিকর। এই জল পিনস (নাসারোগ), তৃষ্ণা, প্রদাহ, অম্লপিত্ত ইত্যাদি রোগে হিতসাধনকারী। অগ্নিবল ও শুক্রবর্ধক এবং পিত্ত নাশক ও বস্তি শোধক খাবার হিসাবে এটি অতি উত্তম হিসাবে বিবেচিত। বসন্ত রোগক্রান্ত দাগ দূর করার জন্য কচি ডাবের জলের ব্যবহার প্রচলিত। কাঁচা নারকেল পিত্তজ্বর ও পিত্তজনিত রোগ নাশ করে। মূত্রদোষ নিবারনেও এটি একটি নামী খাবার। পাকা নারিকেলের জল অরুচি নাশ করে, খিদে বাড়ায়, মল বদ্ধতা দূরে করে। নারকেল দুধও একইরকম গুণ সম্পন্ন। কিন্তু ফোপলের গুণ কচি ডাবের সমতুল। নারকেল দুধ প্রয়োগে রোদে পোড়া বিকৃত বর্ণ প্রকৃতিস্থিত হয়। অপুষ্টি রোধে নারকেল গাছের ফুলের রস পাতলা পায়খানা, রক্ত পিত্ত, প্রমেহ, রক্তাতিসার ইত্যাদি অসুখ বিসুখ খুব উপকারী। নারকেল পেশাই করার পর যে অবশিষ্ট শস্য থাকে, তা শ্বেত প্রদর রোগে উপকারী। নারকেল তেল ক্ষীণ সমূহের পুষ্টিকারক। এই তেল নষ্টশুক্র, সাধারণ প্রমেহ, শ্বাস, কাস, টিবি, স্মরণ শক্তিহীনতা, ও ক্ষয় রোগে প্রশস্ত। মূত্রাঘাত চিকিৎসায় এটি একটি অনন্য উপাদান। এই তেল মাথার তালুতে ব্যবহার করলে মাথা ঠান্ডা রাখে, শিররোগ (আধকপালি) সারে এবং কেশের উপকার সাধন করে। নারকেল তেলের সঙ্গে শতকরা পাঁচ ভাগ কর্পুর মিশিয়ে খোস, পাঁচড়া, চুলকানি প্রভৃতি চর্মরোগে প্রয়োগ করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। নারকেলক্ষিরি অর্থাৎ নারকেল, দুধ-ঘি-চিনি দিয়ে তৈরী মিষ্টান্ন (হাল্কা আঁচে পাক করা) অপুষ্টি নিবারণে খুব সম্ভবত সর্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু গুরুপাক। শরীর স্নিগ্ধ শীতল রাখতে এটি বিশেষ উপযোগী। শুক্র অল্পতা ও রক্তপিত্ত নাশেও এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। গুণীজনেরা একে অমৃত কেলি নামে অভিহিত করেন।

উচ্ছে ও করলা (Momordia Charantia & Momordia Muricata) :

কটিবেল্ল ও করবেল্ল এদের সংস্কৃত নামান্তর। Bitter Gourd/Chamomile এদের ইরেজি নাম। এ দুটোই লতা জাতীয় উদ্ভিদ। খাবার হিসাবে এর ফল ব্যবহার করা হয়। উচ্ছে ও করলা এক অসাধারণ খাবার, যার তুলনা পাওয়ার ভার। এই দুটোর মধ্যে তুলনা করলে, অবশ্যই উচ্ছে শ্রেয়। এর ব্যবহারিক মাত্রা = তিন তোলা = ছত্রিশ গ্রাম। এটি ব্যবহার করার উপযুক্ত সময় দুপুর বেলা, আহারের প্রথমার্ধে। অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, (ক্ষুধামান্দ্য), এলার্জি, ক্রিমি, স্ত্রী রোগ (ঋতু দোষ, জরায়ু পথের গলযোগ), পিত্ত, কফজ জ্বর, প্লিহাদোষ, বসন্তরোগ, রক্তপিত্ত, কামলা/ন্যাবা, প্রমেহ, অতিসার, অনিদ্রা, চর্মরোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে খাবার হিসাবে এর ব্যবহার খুবই ভাল ফল দেয়।

ঢেঁড়শ (Abelmoschus Esculennis) :

ডিণ্ডিশ, রোমশফল, মুনিনির্মিত এই কটি এর নাম পর্যায়। এটি একটি গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। Lady's finger এর ইংরেজি নাম। কুড়মালি নাম পরম্পরায় এর নাম ভেড়ি। এর কচি ফল ও বীজ এবং ক্ষেত্র বিশেষে এরে মূলও ওষুধ হিসাবে কাজে লাগে। এটি দ্বিদোষ (পিত্ত ও কফ) নাশক খাবার, সব্জি হিসাবে এরে প্রায়োগিক মাত্রা = দু থেকে চার তোলা = চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ গ্রাম পরিমান। অরুচি, মল-মুত্রাদি বিবদ্ধতা, পাথুরি, শীতলি (শীতপিত্ত) অপুষ্টি, শুক্রল্পতা, আমাশা নাশক খাবার হিসাবে উপকারী।

ওল (Amorphophalus Campanulatus) :

সুরণ, কন্দ, কন্দল, অর্শঘ্ন, প্রভৃতি ওলের এক একটি নাম পর্যায়। এটি কন্দ জাতীয় একটি খাবার। খাবার হিসাবে এর কন্দই ব্যবহার করতে হয়। বায়ু ও কফ দোষ নাশক খাবার হিসাবে ওলের বেশ নাম ডাক। এর ব্যবহারিক মাত্রা = দুই থেকে চার তোলা, অর্থাৎ চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ গ্রাম পরিমান। অর্শ, চর্ম-রোগ (হাজা, পাকুই), গ্রহণি, গেঁটেবাত, দাঁতের মাড়িক্ষত, ব্যথা, বিছা-ভীমরুল-বোলতার কামড়, শোথ দাস্তদুষ্টি, ফোড়া, শ্লীপদ ক্রিমি, শুল, আমাশা ইত্যাদি রোগ-অসুখ সারানোর কাজে খাবার হিসাবে ওল বেশ কাজের।

কচু (Colocasis Esculenta) :

এটি নবপত্রিকার অন্যতম। কচু কন্দ জাতীয় উদ্ভিদ। এর কন্দ, পাতা, ডাটা খাবার হিসাবে ব্যবহার করা যায়, যার ব্যবহারিক মাত্রা = দুই থেকে চার তোলা = চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ গ্রাম। গরমদোষ, মল-মূত্ররোগ (মলবদ্ধতা, মূত্রল্পতা, পেচ্ছাব জ্বালা) দৈহিক দৌর্বল্য, স্তনদগ্ধ অল্পতা, ফোড়া, অর্শ, আঘাতলাগা ব্যাথা, কানে পুজ, শোথ প্রভৃতি রোগে কচু খাবার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

ক্রমশ...